উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশন। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১ জানুয়ারি, ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

পঁচিশ টাকা

UPANISHAD O RABINDRANATH
By Hiranmoy Bandopadhaya.

ভূমিকা

উপনিষদের দর্শন ও রবীন্দ্রনাথের দর্শন আমাকে আজীবন আকর্ষণ করেছে। এই দুই দর্শনকে যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করেছি। তাদের গভীরে প্রবেশ করে তাদের সহিত নিবিড় পরিচয় ঘটেছে এবং ফলে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণাটি মনে গড়ে উঠেছে তাকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছি। প্রথমটির নাম দেওয়া হয়েছিল—'উপনিষদের দর্শন', দ্বিতীয়টির—'রবীন্দ্রদর্শন'।

এই দুটি দর্শনের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য এত অধিক পরিলক্ষিত হয়েছে যে পরবর্তীকালে মনে হয়েছে যে তাদের একটি তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনীয়তাবোধই আমাকে বর্তমান গ্রন্থ রচনায় প্রণোদিত করেছে। এই দ্বিতীয় স্তরের আলোচনাই যেন প্রাচীন উপনিষদের দর্শন এবং রবীন্দ্রনাথের দর্শনের আলোচনাকে পরিপূর্ণ করে। সুতরাং এই তিনটি গ্রন্থকে পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত বলে ধরতে হবে। তাদের এই যুগ্ম-দর্শনের আলোচনার ত্রয়ীরূপ বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীর সঙ্গে আশৈশব পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়ে, তা সযত্নে পাঠ করে, তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। উপনিষদের বাণীর মানুষের মনকে ঊর্ধ্বমুখী করবার অপরিসীম শক্তির বিষয় অবহিত হয়ে পাশ্চাত্য জগতে তার প্রচারকের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তবু একথা বলা যায় না যে উপনিষদের চিন্তার দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। একথা ঠিক যে তাঁর ধমনীতে বৈদিক ঋষির রক্তধারা প্রবাহিত ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও তিনি পেয়েছিলেন। তবু মনে হয়, অতিরিক্তভাবে তাঁর নিজস্ব একটি মতিগতি ছিল। এই দুটি শক্তি পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তাকে রূপ দিয়েছিল। ফলে দেখি একটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা কোথাও উপনিষদের চিন্তার অনুসরণ করেছে, কোথাও দূরে সরে গেছে। যেখানে অনুসরণ করেছে সেখানে যেন উপনিষদের ঋষিরই বাণী আরও বর্ণাঢ্য ভাষায় এই নূতন ঋষির মুখে শুনছি মনে হয়। যেখানে তা দূরে সরে গেছে সেখানে আমরা নূতন সুরে নূতন কথা শুনতে পাচ্ছি।

বর্তমান গ্রন্থে উভয় চিন্তার তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে সাদৃশ্য ও পার্থক্যের পরিপূর্ণ চিত্রটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। ফলে আমরা আবিষ্কার করে বসি যে রবীন্দ্রনাথের দর্শন উপনিষদের বাণীরই নূতন রূপ।

আমরা যেন তখন তাঁর মধ্যে প্রাচীন যুগের ঋষি-কবির নবতম আবির্ভাব আবিষ্কার করে বসি।

এই গ্রন্থটি প্রকাশনের ভার 'নবপত্র প্রকাশন' সংস্থার কর্ণধার শ্রীপ্রসূন বসু গ্রহণ করে আমাকে বিশেষভাবে ঋণী করেছেন। আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রচার, বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্যকে সহজলভ্য করে তিনি একটি অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমার বন্ধু শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী এ-বিষয় আমাদের সংযোগ স্থাপন করে সহায়তা করেছেন। তাঁর ঋণও কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করি।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম স্নেহভাজন

শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ মল্লিককে

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক কথা

এক

প্রাচীন উপনিষদ নির্বাচন

বৈদিক যুগের শেষভাগে বেদকে আশ্রয় করে প্রাচীন উপনিষদগুলি ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছিল। বেদের সংহিতা অংশে তার জন্ম, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অংশে তার পরিবর্ধন। বেদের যজ্ঞকে কেন্দ্র করে যে আনুষ্ঠানিক পর্ব গড়ে উঠেছে, তার থেকে উপনিষদকে পৃথক করবার জন্য তাকে কর্মকাণ্ড বলে সূচিত করা হয়েছে এবং উপনিষদকে জ্ঞান-কাণ্ড বলা হয়েছে। বেদের মধ্যেই যেন দুটি ধারা পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল—একটি বৈদিক দেব-দেবীর স্তুতি নিবেদনে ব্যাপৃত, অন্যটি বিশ্বরহস্যকে ভেদ করবার আকুতি হতে সঞ্জাত তীব্র জ্ঞানতৃষ্ণা। এই জ্ঞানতৃষ্ণাই পরবর্তীকালে আরণ্যকের যুগে প্রাধান্য পেয়েছিল এবং বিশুদ্ধ দার্শনিক জ্ঞানের অন্বেষণে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল। তারই পরিণতি হলো উপনিষদ। তা যে-তত্ত্ব প্রচার করে তাকে বলা হতো ব্রহ্মবাদ এবং তার সম্পর্কিত বিদ্যাকে বলা হতো ব্রহ্মবিদ্যা।

এই উপনিষদের বৈদিকযুগে অভাবনীয় প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ছিল। উপনিষদেই গল্প আছে যে রাজর্ষি জনক এই ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক বিখ্যাত ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উপনিষদের মৌলিক বচনগুলি অভ্রান্ত সত্য বলে গৃহীত হতো। তাই দেখি ষড়্‌দর্শনের যুগে তাদের একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে

এবং আপ্তবচন হিসাবে বিভিন্ন দার্শনিক তথ্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আমাদের দেশে একটি রীতি প্রচলিত ছিল যে কোনও গ্রন্থ অত্যধিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তিবিশেষ তার নিজস্ব মতকে সহজে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে সেই নামে তাকে প্রচার করত। আরও এক উপায় ছিল প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকে নিজের প্রচারিত তত্ত্বের অনুকূলে ব্যাখ্যা করে একই উদ্দেশ্য সাধন করা। দ্বিতীয় রীতির সুন্দর উদাহরণ মেলে ব্রহ্মসূত্র ও গীতার সম্পর্কে। উভয় গ্রন্থেরই ভিন্ন-ভিন্নভাবে বিশেষ দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রের যেমন অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা আছে, তেমন বৈষ্ণব মতের অনুমোদিত ব্যাখ্যাও আছে। গীতার ব্যাখ্যার বৈচিত্র্য আরও বেশি। উপনিষদের ক্ষেত্রে প্রথম রীতিটি বেশি রকম অবলম্বিত হয়েছিল। ফলে দেখা যায়, যেমন প্রাচীন ব্রহ্মবাদের ব্যাখ্যায় নিবেদিত উপনিষদ আছে, তেমন যোগদর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত সন্ন্যাসবাদও উপনিষদ নামে প্রচারিত হয়েছে। আবার পুরাণের যুগের ভক্তিতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত নানা উপনিষদ আছে এইসব দেখেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ নামে প্রচারিত যে বহু গ্রন্থ আছে সেগুলি পাঠ করে বলেছিলেন যে, অবস্থাটি এমন বিভ্রান্তিকর যে এ যেন 'কণ্টকারণ্য'।

এই পরিস্থিতি উপনিষদের আলোচনায় একটি প্রাথমিক সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ প্রাচীন উপনিষদগুলিকে অবলম্বন করে যে ব্রহ্মবাদ বিকাশলাভ করেছিল তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার তুলনামূলক আলোচনাই বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয়।

সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য হয়ে পড়ে এই প্রাচীন উপনিষদগুলিকে পৃথক করে চিহ্নিত করে নেওয়া; কারণ তাদের উপর ভিত্তি করেই ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে তার পরিচায়ক তথ্য আমাদের সংগ্রহ করে নিতে হবে। ইতিমধ্যে যেটুকু আলোচনা হয়েছে তা হতেই এ-কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে উপনিষদগুলি তিনটি শ্রেণীতে পড়ে:

১। বৈদিক যুগের প্রাচীন ব্রহ্মবাদী উপনিষদ,

২। ষড়দর্শনের যুগের যোগদর্শন-প্রভাবান্বিত যোগ ও সন্ন্যাস-বাদী উপনিষদ এবং

৩। পৌরাণিক যুগের ভক্তিবাদী উপনিষদ।

যত সময় অতিবাহিত হয়েছে উপনিষদনামধারী গ্রন্থের সংখ্যা তত বেড়ে গেছে। ডয়সেন অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে শংকরাচার্য তাঁর বিভিন্ন ভাষ্যে যতগুলি উপনিষদ হতে আপ্তবচন উদ্‌ধৃত করেছেন তাদের সংখ্যা চোদ্দ।[১] সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো যে উপনিষদগুলির ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন তার সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। মুক্তিক উপনিষদে একশো আটখানি উপনিষদের উল্লেখ আছে। বোম্বাই-এর নির্ণয়সাগর প্রেস হতে যে উপনিষদ সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে তার নবতম সংস্করণে একশো কুড়িখানি উপনিষদ স্থান পেয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য হলো এদের ভিতর থেকে সেই উপনিষদগুলি নির্বাচন করে নেওয়া যেগুলিকে ব্রহ্মবাদী উপনিষদ হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

সৌভাগ্যক্রমে এই নির্বাচনকার্যে সাহায্য করতে পারে এ-রকম দুটি অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায়। প্রথম কথা, এই প্রাচীন উপনিষদ-গুলি বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং যেগুলি বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে অবস্থান করছে তাদের আমরা বিনা দ্বিধায় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারি। দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার রূপ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। বেদের মূল অংশে অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে চিন্তার যে রূপ ছিল আরণ্যকের যুগে তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই আরণ্যকের যুগেই ব্রহ্মবাদ বিকাশলাভ করে। তারপর ষড়দর্শনের যুগে তা ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে এবং সর্বশেষে পুরাণের যুগে তার রূপ আবার পরিবর্তিত হয়।

১. Deussen, *The System of Vedanta.*

সুতরাং আরণ্যকের যুগে দার্শনিক চিন্তার যে প্রকৃতি ছিল তার সঙ্গে যে-উপনিষদের চিন্তার সাদৃশ্য পাওয়া যাবে, তাকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। প্রথম রীতিতে উপনিষদগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া সহজ। কিন্তু দ্বিতীয় রীতির প্রয়োগ করতে হলে আমাদের প্রথমেই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার রূপ পরিবর্তনের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হয়ে নিতে হয়।

মোটামুটি দেখা যায়, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা চারটি অবস্থার মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করেছে :

১। প্রাকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপ ;

২। একটিমাত্র প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে বিশ্বের মৌলিক শক্তি রূপে গ্রহণ ;

৩। জ্ঞানমার্গে মুক্তির অন্বেষণ ; এবং

৪। ভক্তিমার্গে ঈশ্বরের সহিত মিলন।

প্রথমটি পাই বেদের সংহিতা অংশে, দ্বিতীয়টি পাই উপনিষদের অংশে, তৃতীয়টি পাই ছয়টি হিন্দুদর্শনে এবং চতুর্থটি পাই বিভিন্ন হিন্দুপুরাণে।

বেদের সংহিতা অংশে আমরা দেখি প্রকৃতির মধ্যে যেখানে কোনও শক্তির ক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে বা বিশেষ সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে তার ওপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে অগ্নি, বরুণ, মরুৎ, উষা প্রভৃতি দেবতা কল্পিত হয়েছেন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে এইসব দেবতার স্তুতিগান করে নানা প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে। প্রার্থনাগুলি আর্ত ও অর্থার্থী মনোভাব প্রণোদিত। তাদের উপাদান করেই বেদের সংহিতা অংশ গড়ে উঠেছে।

কিন্তু বেদ তো শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, দার্শনিক গ্রন্থও বটে। একদিকে যেমন যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ধর্ম গড়ে উঠেছে, অপর দিকে তেমনি পাশাপাশি ঋষির জিজ্ঞাসু মনোভাবও প্রবল হয়ে উঠেছে। কাজেই নানা সূক্তের মধ্যে বিভিন্ন দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত

হয়েছে। যেমন, এই সৃষ্টি কোথা হতে এল? দেবতা এক না বহু? এইসব প্রশ্নের মীমাংসা বিভিন্ন সূক্তে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নাসদীয় সূক্ত (ঋগ্‌বেদ। ১০।১২৯) এবং আত্মাসূক্ত (যাকে দেবীসূক্তও বলা হয়) (ঋগ্‌বেদ। ১০।১২৫) উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দার্শনিক চিন্তার মধ্য দিয়ে ধীরে-ধীরে বহু-দেবতা-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের পরিকল্পনা হতে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে বিশ্ব একটি মাত্র নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাকে কোথাও পুরুষ বলা হয়েছে, কোথাও আত্মা বলা হয়েছে, কোথাও বা সৎ বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের একটি সূক্ত হতে একটি বচন উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে :

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।[২]

যে চিন্তা সংহিতা অংশে বীজ আকারে ছিল, তাই প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে বিকাশলাভ করে বনস্পতিতে পরিণত হয়েছে। সংহিতার পুরুষ উপনিষদের ব্রহ্মে রূপান্তরিত হয়েছেন। সেখানে ঋষির জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি বিশ্বসত্তার পরিচয় পেতেই বেশি উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। সেখানে যে-প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে তা বলে বিশ্বস্রষ্টা ঋষিকে এমন ধীশক্তি দান করুন যাতে তাঁর বরেণ্য প্রকাশকে ধারণা করা যায়; 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'। তাঁদের সবার বড় গর্ব বিশ্বসত্তাকে, 'বেদাহমেতম্'। এইভাবে জিজ্ঞাসা ও চিন্তার ফলে যে দর্শন গড়ে উঠেছে, তাতে বিশ্বসত্তা পরিকল্পিত হয়েছেন এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে। সকল মানুষ, সকল জীব, সকল বস্তুকে জড়িয়ে নিয়ে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সবকিছু ব্যাপ্ত করে আছেন বলেই তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ব্রহ্মের অর্থ হলো যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাৎপর্য হলো তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বে পরিণত হয়েছেন।

২. ঋগ্‌বেদ। ১।১৬৪।৪৬

ভারতীয় দর্শনে পরবর্তী যে-যুগটি এসেছিল তা জিজ্ঞাসু অবস্থারই পরিবর্তিত রূপ। সেটি হলো ষড়্‌দর্শনের যুগ। আগের মতো এখানেও জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল : তবে তার প্রেরণা এসেছে ভিন্ন পথে। উপনিষদের যুগে সে-প্রেরণা এসেছিল বিশুদ্ধ কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য। এখন এসেছে একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনে। এই যুগে কর্মফল ভোগ এবং তার জন্য জন্মান্তরের বন্ধনে বিশ্বাস বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে। সঙ্গে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে এই জন্মবন্ধন সুখকর নয়। কাজেই পরজন্ম হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার উপায় হিসাবে জ্ঞানমার্গকেই অবলম্বন করা হয়েছে। তার ফলে বিভিন্ন দর্শন গড়ে উঠেছে। এই কথা যেমন হিন্দুর ষড়্‌দর্শন সম্বন্ধে খাটে, তেমন বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সম্বন্ধেও খাটে। সেখানেও মুক্তি বা নির্বাণ হলো পরমার্থ এবং তার উপায় হলো জ্ঞানমার্গ।

প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি ভারতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার অনেক পরে। তা একেশ্বরবাদকে অবলম্বন করে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন, কিন্তু বিশ্বের অনেকগুলি মৌলিক তত্ত্বের মধ্যে তিনি একটি মাত্র তত্ত্ব। ন্যায়সূত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বর পূর্ণমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন নি। তারপর একদিন দেখি ঈশ্বরকে বিশ্বতত্ত্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে, তাঁর ওপর সকল মৌলিক শক্তি আরোপ করে, তাঁকে ব্যক্তিসত্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং বিষ্ণু বা শিব বা শক্তিরূপে কল্পিত হয়ে তাঁর উপাসনা প্রবর্তিত হয়েছে। এই যুগে ঈশ্বরে ভক্তিই একমাত্র উৎকৃষ্ট সাধনমার্গ বলে প্রচারিত হয়েছিল।

সুতরাং ভারতীয় দর্শনে আমরা চারিটি চিন্তার স্তর পাই : বেদের সংহিতা অংশে বহুদেবতাবাদ, বেদের উপনিষদের অংশে ব্রহ্মবাদ, ষড়্‌দর্শনের যুগে জ্ঞানমার্গে মুক্তিবাদ এবং সর্বশেষে পুরাণের যুগে

ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে ভিত্তি করে ভক্তিবাদ। বিভিন্ন উপনিষদগুলি শেষের তিনটি শ্রেণীতে পড়ে। তাদের থেকে আমাদের প্রাচীন উপনিষদগুলিকে পৃথক করে নিতে হবে। যে উপনিষদগুলির ভাবধারা দ্বিতীয় স্তরের চিন্তার সঙ্গে মিলে যাবে তাদের এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারি।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় মাত্র বারখানি উপনিষদ। তাদের মধ্যে সাতখানি উপনিষদ বেদগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তারা হলো: ঈশ, ঐতরেয়, কৌষীতকি, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও কেন। এদের কোনটি বেদের সংহিতা অংশের সঙ্গে যুক্ত আছে, কোনটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে, কোনটিও আরণ্যকের সঙ্গে। এখন বাকি থাকে পাঁচটি উপনিষদ। এরা হলো কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য ও শ্বেতাশ্বতর। তাদের বিষয় একই কথা বলা যায় যে বেদগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়া গেলেও একটি ঐতিহ্য আছে যে তারা বিশেষ বেদের সহিত যুক্ত। তবে তাদের এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করবার সপক্ষে বড় যুক্তি হলো তারা মূলত ব্রহ্মবাদই প্রচার করে। আমরা এই উপনিষদগুলির মধ্যে যে-দার্শনিক চিন্তা বিকাশলাভ করেছে তার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার তুলনা সীমাবদ্ধ রাখবার প্রস্তাব করি।

দুই

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ

এখন আমাদের সময় হয়েছে এই নির্বাচিত উপনিষদগুলিকে অবলম্বন করে যে-দার্শনিক তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছে তার সহিত পরিচিত হওয়া। এই তত্ত্বকে আমরা ব্রহ্মবাদ বলতে পারি; কারণ উপনিষদেই এই পারিভাষিক শব্দটি প্রবর্তিত হয়েছে।

উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মবাদের প্রকৃতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এরিস্টটল কথিত যে চারটি কারণের উল্লেখ আছে তার দৃষ্টিভঙ্গির

অনুসরণে। এ-কারণগুলি বিজ্ঞান নির্দেশিত কারণ হতে স্বতন্ত্র। সেখানে ঘটনা পরম্পরাকে পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত করে জানবার চেষ্টা হয়েছে। দুটি ঘটনার মধ্যে যদি শর্তবিহীন, অব্যবহিত এবং সর্বকালীন সংযোগ থাকে তাহলে, প্রথমটিকে দ্বিতীয়ের কারণ বলা হয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো একটি অবস্থার উৎপাদনে যে-শক্তি ক্রিয়া করে তাকে বোঝবার চেষ্টা। এরিস্টটল পরিকল্পিত কারণের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক। একটি বস্তুর উৎপাদনে যত সম্ভাব্যশক্তি ক্রিয়াশীল হয় তাদের সকলকেই আবিষ্কার করার চেষ্টা সেখানে হয়েছে।

একটি উদাহরণ প্রয়োগ করলে বিষয়টি বোঝবার সুবিধা হবে। এরিস্টটল-এর বিশ্লেষণ অনুসারে কারণ চার-প্রকার : উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ, রূপ কারণ এবং উদ্দেশ্য কারণ।[৩] আমাদের দেশের দর্শনে প্রথম দুটি কারণের প্রয়োগ আছে, শেষের উল্লেখ নাই। এখন মানুষের সৃষ্ট একটি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের কথা ধরা যাক। একটি মৃৎপাত্র সম্পর্কে এই সবকটি কারণের প্রয়োগ মিলবে। মৃৎপাত্রের উপাদান কারণ হলো মাটি; তার নিমিত্ত কারণ হলো কুম্ভকার, কারণ সে তার হাতের আঙুলের নিপুণ স্পর্শে চাকায়-ঘোরা-অবস্থায় মৃৎপিণ্ডকে রূপ দেয় ; যে রূপ তাকে দেওয়া হয় সেটি রূপ কারণ এবং সর্বশেষে উদ্দেশ্য কারণ হলো যে-উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করা হয় তাই।

বিশ্ব হলো সৃষ্টি এবং ব্রহ্ম হলেন স্রষ্টা। এদের সম্বন্ধ উপনিষদের পরিকল্পনায় এমন নিবিড় যে ব্রহ্মের উপর একসঙ্গে এই সবগুলি কারণত্ব আরোপ করা যায়, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে উভয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার তাৎপর্য হলো বিশ্বের মধ্যে বিশ্বশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল। সেই শক্তিই বিশ্বের আশ্রয় এবং সেই শক্তিই বিশ্বকে

৩. Material Cause, Efficient Cause, Formal Cause and Final Cause.

সমগ্রভাবে একত্ব মণ্ডিত করেছে। বিশ্বশক্তি বিশ্বের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে, এই হলো উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মূল সুর। ব্রহ্ম সব-কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন, সব-কিছু ধারণ করে আছেন এবং সব-কিছুর অন্তরে অধিষ্ঠান করছেন উপনিষদের নানা বাণীতে এই কথাই বার-বার উল্লিখিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই কথার সারমর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে বোঝান হয়েছে এই বলে যে 'এই সবকিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, পুষ্টি এবং বিলয়'।[৪]

এখানে আমরা একে-একে ব্রহ্মের উপর এরিস্টটল পরিকল্পিত চারটি কারণ কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তা বোঝাতে চেষ্টা করব। প্রথম ধরা যাক ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব। ব্রহ্মই যে বিশ্বের উপাদান কারণ, এই কথাটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তাই যেন ব্রহ্মের সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধের নিগূঢ়ত্ব প্রমাণ করে। এই কথাটি বোঝাতে একটি উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে। মানুষের নির্মিত বস্তুর সম্পর্কে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—একটি তার বিশেষ রূপ এবং অপরটি তার উপাদান। যেমন মৃন্ময় পাত্রের উপাদান মৃত্তিকা এবং পাত্ররূপে প্রকাশ তার রূপ। এখানে মূলতত্ত্ব হলো উপাদান এবং গৌণতত্ত্ব হলো তার নানা বিশেষরূপে প্রকাশ। উপাদানের বিকার হতেই বিশেষ রূপের বা গৌণতত্ত্বের প্রকাশ এবং তাকে পৃথক করতে তাকে নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৫] সেইরূপ বিশ্বের মূল তত্ত্ব হলেন ব্রহ্ম, তাঁর উপাদান বিভিন্নরূপে প্রকট হয়ে নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে বহুরূপে প্রকাশ হয়েছে।

এই বচন থেকে মনে হতে পারে ব্রহ্মের রূপ কারণত্বের উপর এখানে তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। যেন ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে উপাদান যখন এক, তখন তার পৃথক পৃথক রূপের মূল্য নাই। কিন্তু উপনিষদে এমন কোনও বচন নাই যেখানে বিশ্ব-সত্তার বহুরূপে

৪. সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি। ছান্দোগ্য। ৩।১৪।১

৫. বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ ছান্দোগ্য। ৬।১।৪

প্রকাশকে গৌণ প্রকাশ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। বরং বহুরূপে প্রকাশকে ব্রহ্মের নিজস্ব প্রকাশরূপেই বর্ণিত করা হয়েছে। কঠ উপনিষদে আছে যে একই ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান আছেন।[৬] বহুকে ব্যাপ্ত করেই তাঁর একত্ব। একই সত্তা বহুরূপে প্রকট হয়েছেন। কথাটি পরিস্ফুট করবার জন্য একটি উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে একই অগ্নি বিভিন্নস্থানে বিভিন্নরূপে প্রকাশ হলেও অগ্নি বলেই তাকে আমরা চিনি। সেইরকম একই আত্মা বিভিন্নরূপে প্রকাশ হয়েও মূলত সেই একই সত্তা রয়ে গেছেন। একই শক্তির বিশ্বে বহুরূপে প্রকাশ ঘটেছে।[৭]

নিমিত্ত কারণের লক্ষণ হলো তা সৃষ্টির নিয়ামক শক্তি। ব্রহ্ম যে বিশ্বের অভ্যন্তরে থেকেও বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন এ-বিষয়ে উপনিষদে সুস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়। এখানেই মানুষের নিমিত্ত কারণত্বের সঙ্গে বিশ্বশক্তির নিমিত্ত কারণত্বের পার্থক্য। যখন মানুষ নিমিত্ত কারণ হিসাবে কাজ করে, তখন সে যাকে নির্মাণ করল তার বাইরে রয়ে যায়, তাকে নিয়ন্ত্রিত করে বাইরে থেকে। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে নিয়ন্ত্রক শক্তি এমনভাবে কাজ করে না; কারণ সে-শক্তি প্রকৃতির বাহিরে অবস্থিত নয়। অণুর মধ্যে যে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন সংহত হয়ে থাকে তার নিয়ামক শক্তি তাদের অভ্যন্তরেই স্থিত। যে-প্রাণশক্তি দেহের নিয়ন্ত্রণ করে তাও তার অভ্যন্তরেই স্থিত। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিশ্বে দুইভাবে কাজ করেন। প্রথমত তাঁর প্রশাসনে সমগ্র বিশ্ব বিধৃত এবং পরিচালিত। সূর্য-চন্দ্র, দ্যাবা-পৃথিবী, নিমেষ-মুহূর্ত, অহোরাত্রি ইত্যাদি তাঁরই

৬. একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ॥
কঠ। ২।২।১২

৭. অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ কঠ। ২।২।৯

প্রশাসনে বিধৃত হয়ে আছে।[৮] দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে তিনি বিভিন্ন জীবের অন্তরে বর্তমান থেকে তাদের অজানিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। সকল জীব তাঁর শরীর স্বরূপ এবং তাদের অন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রিত করেন বলেই তিনি অন্তর্যামী। দেহ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তাঁর নিয়ামক শক্তি নিত্য এবং তিনি অমৃতস্বরূপ।[৯]

বাকি রইল ব্রহ্মের উদ্দেশ্য কারণত্ব। উপনিষদের ঋষিগণ বিশ্বের সামগ্রিকভাবে একটি উদ্দেশ্য কারণও আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মতে এই উদ্দেশ্য কারণ হলো রসের আস্বাদন। এই 'রস' অর্থে কি বোঝায় তারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম রসস্বরূপ, কারণ তিনি রস অনুভব করে আনন্দ পান।[১০] সুতরাং যা আনন্দ দেয় তাই রস। এই আনন্দ হলো শিল্পীর বা শিল্প-রসিকের আনন্দ। এখানে যখন ব্রহ্ম সব জড়িয়ে, সব নিয়ে আছেন তখন শিল্পী, শিল্পরসিক এবং শিল্পকর্ম একই সত্তারূপে পরিকল্পিত। তাই বিশ্বসত্তাও রসস্বরূপ হয়ে পড়েন।

এখন আনন্দ জিনিসটি কি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। তা সুখ নয়, তা হতে আরও ব্যাপক। তা সুখ-দুঃখকে জড়িয়ে নিয়ে পরিস্ফুট হয়, যেমন নাটকের অভিনয়ে। এর ঠিক সমার্থবোধক ইংরাজি প্রতিশব্দ নাই। যে পারিভাষিক কথাটি সব থেকে তার কাছাকাছি যায় তা হলো 'শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি।'[১১] শিল্পরসিক ক্লাইভ বেল এই কথাটির প্রবর্তন করেন। এই আনন্দ কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে

৮. এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত… ॥

বৃহদারণ্যক। ৩।৮।৯

৯. যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতাণি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইতি ॥ বৃহদারণ্যক। ৩।৭।১৫

১০. রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরীয়। ২।৭

১১. Aesthetic Emotion.

যুক্ত নয়; তা অহৈতুক। উপনিষদ বলতে চেয়েছে বিশ্বসত্তা শিল্পরসিক; তাই তিনি শিল্পীর ভূমিকা গ্রহণ করে আনন্দ পান। সমগ্র বিশ্ব তাঁরই শিল্প। তাই তো বলা হয়েছে 'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি'। এই চিন্তা যুক্তিসম্মত; কারণ বিশ্বশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োজন থাকতে পারে না, তা থাকে বদ্ধজীব মানুষের। এখন উপনিষদে কিভাবে বিশ্বশক্তির উদ্দেশ্য কারণত্বকে প্রতিপাদন করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

রস উপলব্ধি করতে প্রয়োজন দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির সত্তার: কারণ বিশুদ্ধ একত্বের মধ্যে রসের উপলব্ধির অবকাশ নাই। তারজন্য প্রয়োজন দ্বৈতবোধের। একদিকে চাই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের জগৎ, অন্যদিকে চাই তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য মন। দুয়ের জানাজানি, দুয়ের পরিচয়, দুয়ের প্রীতি এদের অবলম্বন করেই তো রসের ধারা প্রবাহিত হয়। সেইজন্য সৃষ্টি-পূর্ব অবস্থার যে এক এবং দ্বিতীয়বিহীন রূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছিলেন তিনি তাঁর একাকিত্ব উপভোগ করলেন না। তাই রসেই উপলব্ধির জন্য তিনি বহু ও বিচিত্ররূপে প্রকট হলেন। একাকী থেকে আনন্দ পেলেন না বলে তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন।[১২]

ব্রহ্মের অহৈতুকী তৃপ্তির জন্যই এমন ঘটল। তা না হলে তাঁর আনন্দরূপটি প্রকাশ হয় না যে। তাই তো দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে বিশ্বে দ্বৈতসঙ্গীতের ধারা ছড়িয়ে পড়ল। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে, ভোক্তা ও ভোগ্যের ভিত্তিতে বিশ্বসত্তার আপন মাধুরী আপন চক্ষে ধরা পড়ল। তখন মানুষের মনের সামনে বিশ্বের আনন্দরূপটি ফুটে উঠল। তাই উপনিষদের ঋষি ঘোষণা করলেন: বাতাসে মধু, প্রবাহিনীতে মধু।[১৩] তিনি বললেন এই পৃথিবী সকল প্রাণীর নিকট মধুস্বরূপ

১২. আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ স বৈ ন রেমে...
স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ॥ বৃহদারণ্যক। ১।৪।১-৩

১৩. মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ॥ বৃহদারণ্যক। ৬।৩।৬

এবং এই পৃথিবীর কাছে সকল প্রাণী মধুস্বরূপ।[১৪] ব্রহ্মের বিশ্বরূপে যে মূর্তপ্রকাশ তাকে তিনি অভিবাদন জানালেন আনন্দরূপ এবং অমৃত বলে।[১৫]

সুতরাং উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশ্ব একটি অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গীরূপে পরিকল্পিত: তা বিশুদ্ধভাবে এক নয়, সকলকে জড়িয়ে নিয়ে এক। তাতে বহু ও পৃথক পদার্থের বিচিত্র সমাবেশ আছে; কিন্তু তারা একই ব্যাপক সত্তার মধ্যে বিধৃত। সেই সত্তা বিশ্বের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে (তাই তা অন্তর্যামী) এবং দ্বৈতভাবে চিহ্নিত হয়ে বিচিত্ররূপে প্রকট হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ভিত্তিতে তার রূপ-রস শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়ে। বিশ্বশক্তি যেন আনন্দ-আস্বাদনের জন্য এই বৈচিত্র্যে ভরা বিশ্বরূপ মহাকাব্য রচনা করেছেন।

তিন

উপনিষদের শ্রেয়বাদ

উপরে বলা হয়েছে, উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি জিজ্ঞাসুর, ভক্তের নয়। সেই কারণে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের বা একেশ্বরবাদের পরিকল্পনা তার চিন্তায় বিকাশলাভ করে নি। কাজেই ঈশ্বর কর্তৃক দণ্ডিত হবার ভয়ে পাপ হতে বিরত থাকা বা ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসাবে অন্যকে ভাল-বাসবার বা সেবা করবার ধারণা সেখানে জন্মলাভ করে নি। তা সত্ত্বেও দেখি উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বা সর্বেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে একটি উচ্চ আদর্শের নীতিতত্ত্ব বিকাশলাভ করেছিল। তার অবলম্বন ছিল দুটি প্রেরণা। প্রথমটি হলো ব্রহ্মবাদ হতে সম্ভূত বিশ্বের সকল প্রাণীর

১৪. ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্ব অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধ্ব॥ বৃহদারণ্যক। ২।৫।১

১৫. তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। মুণ্ডক। ২।২।৭

সহিত অখণ্ডতাবোধের যোগসূত্রে। তা সকলের প্রতি প্রীতিবর্ধন করে স্বার্থ ও পরার্থের সংঘাতের প্রতিকার খুঁজেছে। দ্বিতীয় হলো উপনিষদের একটি নিজস্ব তত্ত্ব যাকে বলা যেতে পারে শ্রেয়বাদ। তা দেহের ও মনের যে-দ্বন্দ্ব আছে বা ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের যে দ্বন্দ্ব আছে তার সমাধান খুঁজেছে সামগ্রিক কল্যাণবোধের মধ্যে। বর্তমান আলোচনায় এ-দুটি বিষয় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাই এদের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমে ধরা যাক প্রীতির ভিত্তিতে স্বার্থ ও পরার্থের সংঘর্ষের সমাধান। এর বৈশিষ্ট্য হলো এখানে উপনিষদ হৃদয়বৃত্তিকে বর্জন করে নি। তাকে নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করেছে। আমরা দেখব এই সংঘর্ষের সমাধান খোঁজা হয়েছে একটি বিচিত্র পথে। এই বিষয় বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি উভয়কেই ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। মূল ভূমিকা দেওয়া হয়েছে হৃদয়বৃত্তিকে আর তাকে প্রেরণা দেবার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিকে।

উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্ধন চেয়েছে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রসারের সাহায্যেই স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ পাই স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসার বিস্তারে। এই ভালবাসাকে বিস্তার করেই স্বার্থ পরিশোধিত হতে পারে। সেটা সম্ভবও বটে, কারণ সকল মানুষের মধ্যেই স্বার্থ এবং পরার্থবোধ উভয়ই অল্পবিস্তর ক্রিয়াশীল। এমনকি একান্ত স্বার্থপর মানুষও সন্তানের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। পরিবারের মানুষকে, প্রিয়জনকে মানুষ ভালবাসে বলে তার সহিত স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে চলে। এখানে প্রীতিবোধই স্বার্থকে শোধন করতে সাহায্য করে।

উপনিষদে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এই প্রীতিবোধ কেন হয় এবং তার একটি উত্তরও দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ বলে, এই প্রীতিবোধ সঞ্জাত হয় প্রীতির বিষয়ের গুণে নয়, তার কারণ বিশ্বের সকল জীবকে

ব্যাপ্ত করে একই মহাসত্তা বিরাজমান আছেন বলে। একই আত্মা বা ব্রহ্মের সকলেই অঙ্গীভূত বলে আমরা পরস্পরের প্রতি প্রীতির আকর্ষণ অনুভব করি। পতির কারণে যে পতি প্রিয় হয়, তা নয়; জায়ার কারণে যে জায়া প্রিয় হয়, তা নয়; পুত্রের কারণে যে পুত্র প্রিয় হয়, তা নয়। আত্মা সকলকে ব্যাপ্ত করে আছে বলেই সকলে প্রিয় হয়।[১৬] এই অর্থে সকলেই সকলের আত্মীয়, সকল মানুষ একই পরিবারের সন্তানের মতো। এইভাবে অখণ্ডবোধ হতে যখন ঘনিষ্ঠতাবোধ পরিস্ফুট হবে তখন সকলের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠবে। তখন পরস্পরের স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে চলা সহজ হবে।

ঈশ উপনিষদে এই তত্ত্বটি অবলম্বন করে সকল মানুষকে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যুক্তি হলো, বিশ্বে যা-কিছু আছে সবই তো একই মহাসত্তার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সুতরাং উপদেশ দেওয়া হয়েছে ত্যাগের সহিত ভোগ করা উচিত, পরস্পর ভাগ করে ভোগ করা উচিত; কারও সম্পদ অপহরণ করা উচিত নয়। আপন লোকের জিনিস কি অপহরণ করা যায় না কি?[১৭]

এখন শ্রেয়তত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। নীতির মূল সমস্যা দুটি বিষয়ের বিরোধ নিয়ে। একটি বিরোধ দেহের সঙ্গে মনের দাবীর। দেহ চায় ইন্দ্রিয়সুখ, বিষয়ভোগ; মন চায় অন্য ধরনের তৃপ্তি। দেহ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, মন হয় সন্ন্যাসের প্রতি। অপর পক্ষে মানুষ সামাজিক জীব। তার প্রতিটি ইচ্ছাধীন কর্ম যেমন তার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, তেমন অন্যের স্বার্থ বা সামগ্রিক কল্যাণের সঙ্গে জড়িত। এইভাবে স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্ব এসে পড়ে।

১৬. ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক। ৪৫।৬

১৭. ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিংচ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যাসিদ্ধনম্‌॥ ঈ।১

মনে হয়, এই দুটি বিরোধকেই একটিমাত্র ব্যাপক বিরোধের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। উপনিষদ তাই করেছে। দেহ যা চায় তা হলো ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ। আবার ইন্দ্রিয়সুখ অর্থেই ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রিয়সুখ; সুতরাং তা ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কাজেই ব্যক্তি-স্বার্থের আকর্ষণ ও ইন্দ্রিয়সুখের আকর্ষণ—এই দুই আকর্ষণের প্রকৃতি একই হয়ে দাঁড়ায়। এই আকর্ষণকে উপনিষদ প্রেয়ের আকর্ষণ বলেছে। যা ইন্দ্রিয়সুখকর তাই হলো শ্রেয়; তার সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে স্বার্থপর করে। অপর পক্ষে মনের দেহের প্রতি একটা বিরোধভাবও আছে। ইন্দ্রিয়সুখে আকর্ষণ মনকে কাজ করবার অবসর দেয় না। তাই তা ইন্দ্রিয় সংযমের পক্ষপাতী। তাই মন ইন্দ্রিয়-নিরোধের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সমষ্টিগত কল্যাণকর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। সুতবাং সন্ন্যাসবাদের সহিত পরার্থবাদের একটি প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। এইভাবে শ্রেয়বাদের সহিত সন্ন্যাসবাদের একটা দ্বন্দ্ব এসে পড়ে।

সুতরাং দেখা যায় বিরোধ দুই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। প্রথম, দেহেব সঙ্গে মনের বিরোধ এবং দ্বিতীয়, স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের বিরোধ। উপনিষদ বলে আমরা যদি সামগ্রিক কল্যাণ বা শ্রেয়ের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি দেখি তা হলে, বিষয়টি আরও সরল রূপ নেয়। মূল প্রশ্ন হলো, ব্যক্তির সুখ বা তৃপ্তি নয়, গোষ্ঠীর সুখ বা তৃপ্তি নয়, ব্যক্তির কল্যাণ ও গোষ্ঠীর কল্যাণ। দেহ ও মনের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে উভয়ের কল্যাণ পরস্পর জড়িত। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে ভোগ ও ত্যাগের সমাধান নির্ভর করে সমগ্র ব্যক্তির কল্যাণের উপর। অনুরূপভাবে ব্যক্তি সমাজ হতে পৃথক নয়, তার অঙ্গীভূত। ঠিক বলতে কি তাদের মধ্যে মূলত বিরোধ নাই। ব্যক্তির কল্যাণ ও সমগ্রের কল্যাণ বর্ধিত করে। সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধের সমাধান সম্ভব। উপনিষদে এই সামগ্রিক কল্যাণকেই শ্রেয় বলা হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উপনিষদ বলে জীবনে ত্যাগেরও প্রয়োজন আছে ভোগেরও প্রয়োজন আছে; উভয়ের সামঞ্জস্যের মধ্যেই জীবন সার্থকতা মণ্ডিত হয়। তাই উপনিষদে ইন্দ্রিয়সংযমের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উপর নয়। ভূমিকে উর্বর করতে হলে প্রথমে চাই তাকে ভালভাবে কর্ষণ করা। সেই কর্ষণই হলো জীবনে ত্যাগের দিক; কিন্তু কর্ষণ করে জমি ফেলে রেখে দেবারও কোন অর্থ হয় না। তাতে বীজ বপন করে শস্য উৎপাদন করলেই সেই কর্ষণ সার্থক হয়।

উপনিষদে আত্মদমনের জন্যই শিক্ষা-অবস্থায় ব্রহ্মচর্যপালনের ব্যবস্থা ছিল। তা সন্ন্যাসের প্রস্তুতি নয়, গৃহস্থজীবনের প্রস্তুতি। এ বিষয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় সমাবর্তনের দিনে আচার্য অন্তেবাসীকে উপদেশ দিচ্ছেন শিক্ষা-সমাপ্তির পর সংসার আশ্রমে প্রবেশ করে বংশধারা অব্যাহত রাখবার ব্যবস্থা করতে।[১৮] এখানে বংশধারাকে অব্যাহত রাখার উপদেশটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনে ত্যাগেরও স্থান আছে, ভোগেরও স্থান আছে। শুধু ভোগ বা শুধু সন্ন্যাস সামগ্রিক কল্যাণ বা শ্রেয়ের পরিপন্থী। তাই উপনিষদ শ্রেয়ের পথই অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছে।

চার

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনিষদের উপর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ছিলেন ঐকান্তিকভাবে একেশ্বরবাদী ভক্ত। তাই উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ বা শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। তবু উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর শিথিল হয় নি।

১৮. আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ ॥ তৈত্তিরীয়। ১।২

তাই দেখি ব্রাহ্মধর্মের যে-উপাসনারীতি তিনি প্রবর্তন করেন, তার মধ্যে উপনিষদের কতকগুলি বচন স্থান পেয়েছে। তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাল্যে পারিবারিক প্রার্থনাসভায় উপনিষদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু সে-পরিচয় ছিল একান্তই বাহ্যিক এবং সেই কারণে তাঁর উত্তর-জীবনের চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। তিনিই বলেছেন:

'বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সবকিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়ত।'[১৯]

পরবর্তীকালে যখন তিনি তরুণ বয়স অতিক্রম করে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসেছেন তখন দেখি তিনি উপনিষদের এবং প্রাচীন তপোবনভিত্তিক অধ্যাত্মসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তপোবনের ঋষি এবং উপনিষদে বিধৃত তাঁদের বচন—উভয়ই যে তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে। এই সাধনার প্রতি তিনি কতখানি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন নিচের কাব্যাংশে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়:

হে সকল ঈশ্বরের পরম-ঈশ্বর
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি-ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরই।[২০]

এরপরে দেখি উপনিষদে নিহিত তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনকে আরও প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে; এবং ফলে তিনি যে তার মধ্যে গভীর-

১৯. মানুষের ধর্ম, সংযোজন—১
২০. নৈবেদ্য, ৫৭

ভাবে প্রবেশ করেছেন তার প্রমাণও আমরা পাই। এমনই তো হয়ে থাকে। প্রথমে শ্রদ্ধা আসে তারপর যার প্রতি শ্রদ্ধা আসে তাকে ভালভাবে জানতে ইচ্ছা করে। এর সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় 'শান্তি-নিকেতনে'র ভাষণমালার মধ্যে। এই ভাষণগুলি প্রদত্ত হয় বাংলা ১৩১৫ হতে ১৩২১ সালের মধ্যে। তাতে নিজস্ব কথা যেমন আছে, তেমন উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করে তার সমর্থনও চাওয়া হয়েছে। যাকে শ্রদ্ধা করি তার কাছ হতেই আমরা সমর্থন খুঁজি। এমনও ভাষণ আছে যা উপনিষদের ব্যাখ্যার রূপ ধারণ করেছে। এই প্রসঙ্গে 'বিশ্ববোধ' শীর্ষক ভাষণটির বিষয়বস্তু লক্ষণীয়। এই সময়ের মধ্যেই, নোবেল পুরস্কার পাবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি আমেরিকায় নানা স্থানে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পান। সেখানে তাঁর বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল উপনিষদের বাণীর ব্যাখ্যা। বলা বাহুল্য, এই ভাষণগুলি ইংরাজিতে প্রদত্ত হয় এবং পরে 'সাধনা' নামে প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে 'দি রিয়ালাইজেশন অব দি ইনফিনিট'[২১] শীর্ষক ভাষণটি বিশেষ করে দ্রষ্টব্য।

সুতরাং এটি অবধারিত সত্য যে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীর সহিত আশৈশব পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়ে, তা সযত্নে পাঠ করে, তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। উপনিষদের বাণীর মানুষের মনকে ঊর্ধ্বমুখী করবার শক্তির বিষয় অবহিত হয়ে, তার প্রচারকের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তবু এ-কথা বলা হয়ত শক্ত হবে যে তাঁর চিন্তা উপনিষদের চিন্তাদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ঠিক বলতে, তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন কি-না এবং হয়ে থাকলে কতখানি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন সেই প্রশ্নের মীমাংসাই বর্তমান আলোচনার অনুসন্ধানের বিষয়। তার প্রস্তুতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার সহিত আমাদের সংক্ষেপে পরিচিত হয়ে নিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক তথা আধ্যাত্মিক চিন্তা সামগ্রিকভাবে

২১. The Realisation of the Infinite.

আলোচনা করলে দেখা যায় তা গতিশীল ছিল। অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থায় তার প্রকৃতির পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। মোটামুটি তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা পরিণতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। প্রথম জীবনে দেখি, তিনি এক সর্বব্যাপী সত্তার বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। পরবর্তী অবস্থায় দেখি, তিনি এক ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে তাঁর অন্তরের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন এবং মধুর রসের ভিত্তিতে তাঁর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন ও সেই অন্তরে অবস্থিত দেবতার ইচ্ছা অনুসারে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করাই নিজের কর্তব্য বলে মনে করেছেন। এঁকেই তিনি 'জীবনদেবতা' বলেছেন। শেষ অবস্থায় তিনি এই দুটি তত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজস্ব মানবিকতা তত্ত্বের মধ্যে। অখণ্ডতা-বোধ হতে বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতি এবং প্রীতি হেতু বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগ করে আনন্দ এই হলো সেই তত্ত্বের মর্মকথা। জ্ঞান হতে প্রীতি, প্রীতি হতে সেবা, সেবা হতে আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক অসাধারণ কবি। তাঁর কাব্যের উৎস ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা হতে সঞ্জাত তীব্র অনুভূতি নয়; তার মূল প্রেরণা হলো তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তা। অধ্যাত্ম-চিন্তা তাঁর হৃদয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করত তাই তাঁর কবিতায় ভাষা পেত। তাই দেখি তাঁর কাব্যে বারবার পালা বদল হয়েছে, অথচ তার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। সুতরাং তাঁর অধ্যাত্মজীবন ও কাব্যজীবন হাত ধরাধরি করে চলেছে এবং কাব্যের মধ্যেই তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তার ইতিহাস অজানিতে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এ-বিষয় তিনি নিজেও অবহিত ছিলেন। তাই দেখি তিনি বলেছেন যে তাঁর কাব্যজীবন ও অধ্যাত্ম-জীবন তাঁর অজানিতে একই পথ অনুসরণ করেছে।[২২]

২২. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetic life. Somehow they were wedded to each other and though their betrothal had a long period of ceremony, it was kept secret to me; *Religion of Man*, *The Vision*.

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবন শুরু হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় সংযোগের মধ্য দিয়ে। ভোরের সূর্যকিরণে বাতাসে আন্দোলিত নারকেলগাছের পাতা, মধ্যাহ্নকালের নিবিড় নিস্তব্ধতা, বর্ষায় ঘননীল মেঘের সমাবেশের মাধুর্য তাঁর হৃদয়কে আন্দোলিত করত। মেঘ দেখলে তাঁর হৃদয় নাচত, বর্ষামুখর রাতে এবং ফাল্গুন সমীরণে তাঁর মন শিহরিত হতো, ভোরের সূর্যকিরণের আকর্ষণ তাঁকে বাল্যকালে ঘুমের নিবিড় আলিঙ্গন হতে টেনে বার করে আনত।

প্রকৃতির মধ্যে নানা পরিবেশে এই মাধুর্যের বিকাশের ভিতর তিনি এক প্রচ্ছন্ন সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতেন এবং তাঁকে জানবার জন্য মনে একটি তীব্র আকূতি জাগত। নীল আকাশে কে শাদা মেঘের ভেলা ভাসাল তা জানতে তাঁর মন উৎসুক হতো। নীল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলে তাঁর হৃদয় শুধু ময়ূরের মতো নেচে উঠত না, আকাশের পানে বাহু তুলে সেই অজ্ঞাত প্রচ্ছন্ন সত্তাকে পেতে চাইত। মন দিয়ে চিন্তা করে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, তাঁর মনে হয়েছে সেই মহাসত্তা নিজে অলক্ষ্য থেকে মহাকাশে মহাবিশ্বকে এবং পৃথিবীর বক্ষে প্রাণের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেন। গ্রহ-নক্ষত্রগুলি যেন তাঁর আলোক ধেনু এবং পৃথিবীর বক্ষে লালিত তরুলতা আদি আলোয়-চরা ধেনু। আর তিনি যেন অদৃশ্য রাখালরূপে তাদের নিয়ন্ত্রিত করেন; তাঁর বাঁশী শোনা যায়, তাঁকে দেখা যায় না:

> এই যে তোমার আলোক ধেনু
> সূর্য তারা দলে দলে,
> কোথায় বসে বাজাও বেণু,
> চরাও মহা গগন তলে।[২৩]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই মহাসত্তার শুধু পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি; তাঁকে প্রীতির সম্বন্ধে পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি যেমন প্রবল ছিল, হৃদয়বৃত্তিও তেমন শক্তিমতী ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির

২৩. গীতালি, আলোক ধেনু।

সাহায্যে তিনি বিশ্বসত্তাকে এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন সত্তারূপে জেনেছিলেন। এখন হৃদয়বৃত্তির আকর্ষণে তিনি তাঁকে প্রীতির সম্বন্ধে পেতে চাইলেন। এই আকুতির ফলেই তিনি অধ্যাত্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর জীবনদেবতাকে আবিষ্কার করলেন।

এই জীবনদেবতা তত্ত্বটি তিনি এক দিব্য অনুভূতির সাহায্যে আবিষ্কার করেছিলেন। তার কথা তিনি দুই স্থানে উল্লেখ করেছেন; তাঁর 'রিলিজিয়ান অব ম্যান' গ্রন্থে এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের (সংযোজন অংশে)। একদিন দুপুরে তহশীলের কাজ সেরে তিনি স্নান করতে যাবার পথে সাহাজাদপুরের কুঠিবাড়ির দোতলার খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর উপলব্ধি হলো একটি শক্তি তাঁর সমগ্র জীবনকে এক অখণ্ড ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করে আছেন। তিনি যেন নাটকের স্রষ্টার মতো অভিনেতারূপী কবির জীবনকে, সার্থকতার পথে প্রীতির সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন। তাঁর ধারণা জীবনদেবতা নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বসত্তার ব্যক্তিরূপে প্রকাশ।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ একটি অসঙ্গতির মধ্যে এসে পড়েছিলেন। মন দিয়ে বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে যাঁর পরিচয় পেলেন, তিনি এক প্রচ্ছন্ন সত্তা। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ তত্ত্বের সঙ্গে তার মিল আছে। অথচ হৃদয় দিয়ে তাঁকে পেলেন হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি-সত্তারূপে। তিনি এই অসঙ্গতির মীমাংসা করেছেন এক অভিনব পথে। তিনি বলেছেন, বিশ্বসত্তার একই সঙ্গে দুই বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ হতে পারে। এক পর্যায়ে তিনি সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন নিয়ামক শক্তি। তাকে তিনি বিশ্বসত্তার 'কাজের প্রকাশ বলেছেন'। এখানে বিশ্বসত্তা 'বিশ্বদেবতা'। এর অতিরিক্তভাবে তাঁর একটি প্রকাশ আছে, যেখানে তিনি ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে, তার হৃদয়ে স্থান নিয়ে তার জীবনকে গড়ে তুলতে চান। এই প্রেমের সম্বন্ধে কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। যে তাঁর প্রীতির আহ্বানে সাড়া দেয়,

তার হৃদয়েই তিনি অধিষ্ঠান নেন। একে তিনি 'আনন্দের প্রকাশ' বলেছেন। এখানে বিশ্বসত্তা 'জীবনদেবতা'।[২৪]

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেন এই তত্ত্বটির প্রতীকের সাহায্যে একটি কবিতার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন। একই মহাশক্তির দুই পর্যায়ে যুগপৎ প্রকাশ যে সম্ভব তা একটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত হতে তিনি সেখানে স্থাপন করেছেন। সূর্য বিরাট, গগন না হলে তার প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ কল্পনা করা যায় না; অথচ ক্ষুদ্র শিশির-বিন্দুর বক্ষেও নিজেকে প্রতিফলিত করবার ক্ষমতা রাখে। সূর্য বিপুল কিরণে যেখানে ভুবন আলোকিত করে, সেখানে পাই তার নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ, আবার যখন বিশেষ শিশিরবিন্দুর মধ্যে সে নিজেকে প্রতিফলিত করে, তখন পাই তার ব্যক্তিরূপে বিশেষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের উপযুক্ত প্রকাশ।[২৫] প্রথমটি কাজের প্রকাশের সঙ্গে তুলনীয় এবং দ্বিতীয়টি আনন্দেব প্রকাশের সঙ্গে তুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের যেমন বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি প্রবল ছিল, তেমন সেবাবৃত্তিও প্রবল ছিল। এই সেবা বা কর্মবৃত্তির আকর্ষণই তাঁকে জীবনদেবতা হতে সরিয়ে নিয়ে মানবিকতার কাছে টেনে নিয়ে এসেছে। সাধন জীবনের শেষ অধ্যায়ে জীবনদেবতা তত্ত্ব হতে মানবিকতা তত্ত্বে উত্তরণের প্রেরণা বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগের আকর্ষণ হতেই এসেছিল। বুদ্ধিবৃত্তিব পথে তিনি জীবনদেবতা তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এইভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া গেলেও তাঁকে দেখা যায় না, তাঁকে ধরা যায় না; সুতরাং তাঁকে সেবা করবার সুযোগ পাওয়া যায় না। সুতরাং মানুষ রূপেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেবা করতে চেয়েছিলেন।

এই কারণে তিনি বিশ্বসত্তার এমন একটি প্রকাশ চেয়েছিলেন

২৪. এই প্রসঙ্গে "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের 'সৌন্দর্য', 'আত্মবোধ' ও 'বিশেষ' শীর্ষক ভাষণগুলি দ্রষ্টব্য।

২৫. উৎসর্গ, প্রসাদ।

যেখানে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি এবং সেবাবৃত্তির প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারে। তিনি ঈশ্বরকে যুগপৎ মন, হৃদয় ও কর্ম দিয়ে পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণায় সেটা সম্ভব, ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানুষের নিকট ঘনিষ্ঠতম সেই প্রকাশের সঙ্গে এই তিন বৃত্তির সংযোগ স্থাপন করলে। তাঁর প্রতিপাদ্যটি সহজবোধ্য করবার জন্য তিনি একটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন। বিষয়টি তাঁর নিজের মুখেই শোনা যেতে পারে :

"মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর সবাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর ও অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সবাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহাকে কর্ম করি।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা তত্ত্ব বলে বিশ্ব হতে পলাতক হয়ে সন্ন্যাসগ্রহণ মুক্তির পথ নয় : মুক্তির পথ বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে আত্মার বিকাশ সাধনের মধ্যে। এই তত্ত্বটি 'শান্তিনিকেতনে'র ভাষণমালায় বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছে। এতে মানুষেব তিনটি মৌলিক বৃত্তিই প্রয়োগের সুযোগ পায় এবং ফলে ঈশ্বর সাধনা সর্বতোমুখী হয়। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথে বিশ্বের অখণ্ডতাবোধ পরিস্ফুট হয়। তার ফলে বিশ্বের সহিত যে একাত্মতাবোধ জাগে তা অন্যের প্রতি প্রীতি সঞ্চার করে, হৃদয়বৃত্তিকে পরার্থে উন্মুখ করে। এই প্রীতি সঞ্চারের ফলে কর্মবৃত্তি আর স্বার্থবোধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না; প্রীতিপ্রণোদিত হয়ে সর্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগ করা সহজ হয়ে পড়ে। তখন পরের জন্য কর্ম করা আর দায় বোধ হয় না, তাতে আনন্দ আসে; যেমন মায়ের সন্তানের সেবা করে আনন্দ আসে।

২৬. ধর্ম

প্রীতির প্রভাবে পরার্থ স্বার্থের সহিত একীভূত হয়ে যায়। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেন জ্ঞান-প্রেম-কর্ম-আনন্দের সাধনা।

পাঁচ

প্রস্তাবিত আলোচনারীতি

এখন বর্তমান প্রসঙ্গে কোন্ আলোচনারীতি প্রয়োগ করা হবে সে বিষয় কিছু বলে নেওয়া যেতে পারে। আমাদেব আলোচ্য বিষয় হলো উপনিষদের ভাবধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা। উভয় চিন্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি উপরের আলোচনায় সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে তাদের পরস্পরের তুলনামূলক আলোচনাব পথ প্রস্তুত হয়ে গেছে। সেটা সব থেকে সহজসাধ্য হবে, যদি উপনিষদের মূল চিন্তাগুলি পৃথকভাবে স্থাপন করে, প্রত্যেকটির সহিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তার তুলনা করি। তাতে আলোচনার একটি স্বচ্ছ রূপ পাবার সম্ভাবনা বেশি। তারপর আমরা এই গ্রন্থে যে মূল প্রশ্ন উত্থাপন করেছি তার উত্তর দেবার সময় আসবে। মূল প্রশ্ন হলো রবীন্দ্রনাথেব অধ্যাত্ম চিন্তার সহিত ঔপনিষদ চিন্তার সাদৃশ্য কতখানি এবং দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদ চিন্তাদ্বারা কতখানি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সেই আলোচনাটি সবার শেষে হওয়াই বিধেয়।

এখন বর্তমান প্রসঙ্গে যে তত্ত্বগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাব পৃথকভাবে আলোচনা করবার প্রস্তাব করি, তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে, এই প্রাথমিক আলোচনা শেষ করতে পারি। সেই বিষয়গুলি হলো এই :

১। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ : তা বলে বিশ্ব এক প্রচ্ছন্ন মহাসত্তা-দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং নিয়ন্ত্রিত এবং বিশ্ব হতে তা অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এই সর্বেশ্বরবাদ একরকম সমর্থিত।

তবে একেশ্বরবাদের প্রভাব হতেও তিনি মুক্ত নন। ফলে জীবনদেবতা তত্ত্বের উদ্ভব।

২। উপনিষদের দ্বৈতভাব তত্ত্ব: উপনিষদের মূল চিন্তাধারা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ সমর্থন করে না। তা বলে আনন্দ আস্বাদনের জন্য যিনি ছিলেন একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তা, তিনি নিজের ওপর দ্বৈতভাব আরোপ করে এই বিচিত্র বিশ্বে রূপান্তরিত হয়েছেন। দ্বৈতভাবের মধ্যেই বিশ্বসত্তার আনন্দরূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তার পূর্ণ সমর্থন করেন। তিনিও বলেন যিনি 'পরম-এক' তিনি 'আনন্দে উৎসুক' হয়ে 'আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ'।

৩। আনন্দতত্ত্ব: উপনিষদের আনন্দবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্তমান আলোচনার প্রথম অংশে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখব, রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত আনন্দতত্ত্বের সহিত তার আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য আছে।

৪। মৃত্যু সমস্যা: উপনিষদে এই সমস্যাটি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। আনন্দতত্ত্বেরই অংশ হিসাবে তা আলোচিত। তা বলে আনন্দই ব্রহ্ম। সেই আনন্দেরই আকর্ষণে জীবের জন্ম এবং মৃত্যু। তারা প্রাণ প্রবাহের ছন্দ। কাজেই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে মৃত্যুর দাহিকাশক্তি থাকে না, তা আনন্দ বা অমৃতের উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। তাই বলা হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে মৃত্যুর কষ্ট আছে, কিন্তু অখণ্ডভাবে দেখলে শোকের অবকাশ থাকে না। সম্ভূতি ও বিনাশকে যুক্ত করে দেখলে অমৃত লাভ করা যায়।[২৭]

২৭. বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ঈশ। ৬৪

রবীন্দ্রনাথ বারবার মৃত্যুশোক পেয়েছেন এবং মৃত্যুর প্রকৃতি নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন এবং উত্তরও দিয়েছেন। সে-উত্তরের চিন্তা যেমন পরিণতির পথে এগিয়েছে তেমন তার রূপপরিবর্তন ঘটেছে। আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তাটি উপনিষদের চিন্তার কাছে ঘেঁষে এসেছে।

৫। শ্রেয়তত্ত্ব: উপনিষদের শ্রেয়তত্ত্ব অনন্যসাধারণ। পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের চিন্তা হতে তা ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছে। তার সহিত তুলনীয় কোনও তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় যেন পাওয়া যায় না মনে হয়। তবে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতত্ত্ব উল্লেখনীয়। তাও অভিনব এবং তার সহিত শ্রেয়তত্ত্বের হয়ত কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবে সেটি অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

৬। মানবিকতা: উপনিষদের মানবিকতার প্রেরণা অখণ্ডবোধ। তার ভিত্তিতেই স্বার্থবোধকে প্রীতির উদ্রেকের সাহায্যে পরিশোধিত করবার প্রেরণা সেখানে আছে। তার মানবিকতাতত্ত্ব ও শ্রেয়তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাতত্ত্বের ঔপনিষদ তত্ত্বের সহিত গভীর সাদৃশ্য আছে। উপনিষদের চিন্তায় পাই জ্ঞান হতে সর্বজনীন প্রীতি এবং প্রীতি হতে পরার্থপরতা। রবীন্দ্রনাথও বলেন অখণ্ডজ্ঞান হতে আসে প্রীতি এবং প্রীতি হতে কল্যাণকর্মে প্রেরণা। অতিরিক্তভাবে তিনি এই বিশ্বজনীন কর্মে আনন্দ আস্বাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি একটি অতিরিক্ত কথা বলেছেন। তিনি যেন স্বার্থকে উন্মূলিত করে পরার্থপরতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। উপনিষদ তা চায় নি। এ-বিষয় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মবাদ

এক

উপনিষদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি

উপনিষদের ব্রহ্মবাদের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পূর্বের অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে তাই যথেষ্ট। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। তবে বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মবাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি বিষয় আমাদের অবহিত হতে হবে। প্রথম কথা, তা বলে ব্রহ্মই বিশ্বরূপে প্রকাশ হয়েছেন এবং দ্বিতীয় কথা তা বলে তিনি বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন।

বিশ্বই যে ব্রহ্মের প্রকাশ তাব সমর্থনে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বাণী আছে যা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তা বলে: তিনিই নিচে, তিনিই উপরে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে—এই সব-কিছুই তিনি।[১]

আর ব্রহ্ম যে নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করেন তা সুন্দর প্রকট হয়েছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের আর একটি বচনে। তা বলে, যিনি একক এবং নির্বিশেষ থেকেও কামনাহীন অবস্থায় বহুপ্রকার শক্তির সাহায্যে প্রথমে বহু বিশেষ বস্তুর সৃষ্টি করেন এবং শেষে সেই বহু দিয়ে গঠিত বিশ্বকে নিজের মধ্যে

১ স এবাধস্তাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৭॥২৫॥১

প্রত্যাহৃত করেন, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করুন।[২]

এই প্রসঙ্গে উপনিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সহিত আমাদের পরিচিত হয়ে নেওয়া দরকার। তা হলো তার বিশুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গির একান্তই অভাব। অবশ্য গীতা জিজ্ঞাসুকেও ভক্তের অন্তর্ভুক্ত করে। গীতা এই ব্যাপক অর্থে চার প্রকার ভক্তের কথা উল্লেখ করেছে: আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভক্ত।[৩] আর্ত ও অর্থার্থী হলো সাধারণ ভক্ত যারা ঈশ্বরকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে স্মরণ করে। জ্ঞানী ভক্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে ওঠেন। তিনি বিনাহেতুতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-আবিষ্ট হন। তিনিই প্রকৃত ভক্ত। জিজ্ঞাসু ঠিক ভক্ত নন। কারণ তিনি বিশ্বরহস্য ভেদ করতে চান। ভক্তের হৃদয়বৃত্তি প্রবল। জিজ্ঞাসুর বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল। তিনি বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে বিশ্বকে বুঝতে চান। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এই শ্রেণীতে পড়েন। উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের অনুরূপ।

এইজন্যই বেদের মধ্যে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভাগ টানা হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বেদে কর্মকাণ্ডই প্রাধান্য লাভ করেছে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশের সম্পর্ক সাধারণত যজ্ঞের সঙ্গে। যজ্ঞের উদ্দেশ্য বিশেষ-বিশেষ দেবতার গুণকীর্তন করে, তাঁর উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে প্রার্থনা নিবেদন। এই প্রার্থনা—বিপদ হতে ত্রাণের জন্য বা ধন-সম্পদের জন্য। অর্থাৎ হোতা আর্ত ও অর্থার্থীর মনোভাব নিয়ে প্রার্থনা জানান। গীতা এই দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করেছে, কারণ তা ভোগ ঐশ্বর্যে আসক্তি সূচিত করে এবং তাইজন্য 'তাকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' বলেছে।[৪] পরিবর্তে অহৈতুক ভক্তিকেই তাতে

২. য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ॥
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৪॥১

৩. গীতা ॥৭॥১৬—১৭

৪. গীতা ॥ ২ ॥ ৪২—৪৪

গ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ কিন্তু তার ধারে-কাছে যায় নি। তবে উপনিষদ ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির নিন্দা করেছে; কারণ, তার ধারণায় ভোগ-সম্পদ দিয়ে মানুষের তৃপ্তি হয় না। 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'। তাই উপনিষদ তৃপ্তি খুঁজেছে জ্ঞানের পথে। তাই উপনিষদকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়।

বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে কর্মকাণ্ড হতে পৃথক করবার জন্য উপনিষদে প্রথমটিকে পরাবিদ্যা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিকে অপরাবিদ্যা বলা হয়েছে। এই পারিভাষিক শব্দ-দুটির সংজ্ঞা সোজাসুজি উপনিষদে দেওয়া নেই। কিন্তু তা কি বোঝায় তা উপনিষদের উক্তি হতেই বুঝে নেওয়া যায়। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই নিয়ে অপরাবিদ্যা। আরও বলা হয়েছে, পরাবিদ্যা হলো তাই যার দ্বারা সেই অক্ষরকে জানা যায়।[৫] এখানে অপরাবিদ্যার তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং পরাবিদ্যার একটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চার বেদ এবং ছয় বেদাঙ্গ, অর্থাৎ সেকালে যে-বিদ্যাগুলি ব্যবহারিক প্রয়োজনে কাজে লাগত সেইগুলি। অপরপক্ষে বলা হয়েছে পরাবিদ্যা হলো অক্ষর সম্বন্ধে জ্ঞান। অক্ষর অর্থে বুঝি ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্ম তিনি সব কিছু জড়িয়ে বিদ্যমান। তাঁর মধ্যে ধ্বংস আছে, সৃষ্টি আছে, মৃত্যু আছে, জন্ম আছে, কিন্তু সব জড়িয়ে নিয়ে বিশ্ব আছে। অংশের বিনাশ আছে, সমগ্রের বিনাশ নাই; তাই তিনি অক্ষর। অক্ষর সম্বন্ধে জ্ঞান কাজে লাগে না, কেবল কৌতূহল-বৃত্তি চরিতার্থ করে। তার আকর্ষণ অহৈতুক। তাইজন্যই তা অপরাবিদ্যা।

জ্ঞানের মধ্যে এই বিভাগ টানা হতেই বোঝা যাবে যে উপনিষদের ঋষির ব্যবহারিক কাজে লাগে না এমন জ্ঞানের প্রতি পক্ষপাত বেশি ছিল। প্রাচীন উপনিষদের যুগে এই পরাবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ এমন

৫. অথাপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ মুণ্ডক॥ ১॥ ১॥ ৫

ব্যাপক ছিল যে বর্তমান যুগে তার কল্পনা করা যায় না। ঠিক বলতে কি কৌতূহল-বৃত্তি-প্রণোদিত হয়ে বিশ্বরহস্যকে ভেদ করবার আকাঙ্ক্ষা সেকালের সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই দেখি সেকালের মানুষের প্রার্থনা ছিল অর্থার্থী মনোভাবের ঊর্ধ্বে। সেকালের মনীষী প্রার্থনা জানাতেন, পরমশক্তি তাঁকে এমন ধীশক্তির সহিত যুক্ত করুন যাতে স্রষ্টাকে তিনি সেই ধীশক্তি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন।[৬] তাই সেকালের মানুষের সব থেকে গর্বের বিষয় ছিল অর্থ নয়, প্রতিপত্তি নয়, ক্ষমতা নয়, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হতে পারা। তাঁরা গর্বভরে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'সেই মহান পুরুষকে জেনেছি'।[৭] নচিকেতার উপাখ্যানে দেখি বালক বিপুল সম্পদের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে পরাবিদ্যার প্রতি আগ্রহশীল হয়েছেন। মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানে দেখি মৈত্রেয়ী স্বামীর সম্পদের থেকে স্বামীর ব্রহ্মবিদ্যার অংশভাগী হতে চেয়েছেন। রাজা জনক দেখি পরাবিদ্যার আকর্ষণে বিদেহ রাজ্য দান করে যাজ্ঞবল্ক্যের দাসত্ব কামনা করেছেন।

ঠিক বলতে কি বেদের মধ্যে কর্ম ও জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণের দ্বন্দ্ব প্রথম হতেই বর্তমান ছিল এবং ধীরে-ধীরে বেদের ঋষি অর্থার্থী মনোভাব হতে সরে এসে জিজ্ঞাসু মনোভাবকে একদিন সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নিয়েছেন। এ-বিষয় এখানে কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। বেদে যেন জিজ্ঞাসু মনোভাব এবং অর্থার্থী মনোভাব একসঙ্গে কাজ করেছে। অর্থার্থী মনোভাব নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কাকে প্রার্থনা জানাবেন? বুদ্ধিশক্তি উত্তর দিয়েছে, প্রকৃতির বক্ষে যেখানে শক্তির বিকাশ

৬. তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৬ ॥ ৩ ॥ ৬

৭. বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৩ ॥ ৮

সেখানেই দেবতার অধিষ্ঠান; অতএব তাঁদের কাছেই প্রার্থনা নিবেদন কর। এইভাবে কত দেবতা এসেছেন। পরে জিজ্ঞাসু মনোভাব নিয়ে চিন্তা করে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে দেবতা তো বহু নয় একই। তিনি ছাড়া আর কাকে হবি দ্বারা তৃপ্ত করব?[৮]

দুই

কর্মকাণ্ড হতে জ্ঞানকাণ্ডে উত্তরণ

কিন্তু কর্মকাণ্ড হতে বিশুদ্ধ জ্ঞানকাণ্ডে উত্তরণ একদিনে ঘটে নি। তা ঘটতে শত-শত বৎসর সম্ভবত লেগে থাকবে। এই উত্তরণ সংঘটিত হয়েছিল কয়েকটি অবস্থার মধ্য দিয়ে। বর্তমান প্রসঙ্গে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি আমাদের জানার প্রয়োজন আছে।

আমরা দেখি এই অর্থার্থী মনোভাব হতে জিজ্ঞাসু মনোভাবের উত্তরণের সঙ্গে-সঙ্গে বেদের সংহিতা অংশে দেবতার প্রকৃতি সম্বন্ধেও ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। তা বহু দেবতাবাদ হতে একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছে; কিন্তু শেষে এক নৈর্ব্যক্তিক সর্বেশ্বরবাদে এসে পরিণতি লাভ করেছে। এই উত্তরণের ইতিহাস নিচে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

অভিযান শুরু হয়েছে সাধারণ মানুষের মনোবৃত্তি দিয়েই। সাধারণ মানুষ চায় সুখে বাস করতে। তার জন্য প্রয়োজন বিপদ হতে মুক্তি এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধি। এখন এর জন্য প্রার্থনা নিবেদন হবে এমন শক্তির কাছে যা বিপদ হতে ত্রাণ করতে পারে এবং সম্পদ দিতে পারে। সেই শক্তিই তো দেবতা। তাঁকে বেদের ঋষি খুঁজেছেন প্রধানত প্রকৃতির মধ্যে। যেখানেই প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ দেখেছেন

৮. য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ঋগ্‌বেদ ॥ ১০ ॥ ২১ ॥ ২

সেখানেই তার ওপর তাঁরা দেবত্ব আরোপ করেছেন এবং তার উদ্দেশ্যে সূক্ত রচনা করেছেন। তাতে একদিকে যেমন বিশেষ দেবতার প্রশস্তি দেওয়া আছে তেমন প্রার্থনাও নিবেদিত হয়েছে। এইভাবে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সবিতা, পর্জন্য, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা কল্পিত হয়েছেন। এঁরা সকলেই শক্তির প্রকাশ। কিন্তু দেবত্ব আরোপ শুধু এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। যা সুন্দর তার ওপরও দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। যেমন উষা। তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে অগ্নির কন্যা ও সূর্যের পত্নীরূপে।[৯] কুকুরকেও দেবত্বে উন্নীত করা হয়েছে; কারণ তা গৃহস্থের সম্পত্তি রক্ষা করে তাঁর উপকার করে।[১০] এমনকি বর্ম, ধনু ও জ্যাকেও দেবতা কল্পনা করে তাদের জন্য প্রশস্তি রচিত হয়েছে। কারণ তারা দেহরক্ষার সহায়ক।[১১]

যাক সে-কথা। ইন্দ্রাদি দেবগণ নিয়েই আমাদের বিশেষ আলোচনা। কারণ তাঁরা কতকগুলি মৌলিক শক্তির আধার। অর্থার্থী মনোভাব হতেই এতগুলি দেবতার প্রথম চিন্তায় সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ধর্মচিন্তার প্রথম অবস্থায় বহুদেবতাদের উৎপত্তি হয়েছে।

চিন্তা সেখানে থেমে যায় নি, আরও এগিয়েছে। ফলে এঁদের উপর এক অতিদেবতাকে স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তখন কোন দেবতাকে এই আসনে স্থাপন করা যায় তা নিয়ে চিন্তা হয়েছে এবং সেই চিন্তার ভিত্তিতে দুটি দেবতাকে এই বৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন ইন্দ্র ও বরুণ। ইন্দ্র হলেন প্রভূত বলশালী। যে বৃত্র নদীসমূহের জলধারাকে স্তম্ভিত করে রাখে তাকে তিনি অপসৃত করে নদীগুলিকে প্রবাহিত করেন। তাঁর বিপুল বলের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা উদ্রেক হয়েছে। তাই বলা হয়েছে: "দ্যাবা-পৃথিবী যাঁর বিপুল বল অনুধাবন করে, বরুণ ও সূর্য যাঁর নিয়মে চলে, নদীসমূহ যাঁর নিয়মে

৯. ঋগ্‌বেদ ॥১॥৭১॥৫ ও ৩॥৬১॥৪ ১০. ঋগ্‌বেদ ॥৭॥৫৫
১১. ঋগ্‌বেদ ॥৭॥৭৫

প্রবাহিত হয় সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদের সহায় হবার জন্য আহ্বান করি।"[১২]

অপরদিকে বরুণের প্রজ্ঞা, বরুণের কল্যাণকর্মে আগ্রহ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তিনি একাধারে শক্তিমান ও কল্যাণব্রতী। তাঁর দেহের গুণ অপেক্ষা মনের গুণ বেশি। তাই বলা হয়েছে: "এই বরুণ মহিমাবান্, মহাকর্মা, প্রাজ্ঞ, তেজোযুক্ত এবং জরা রহিত, ইনি বিস্তীর্ণা দ্যাবা-পৃথিবীকে বিভাসিত করেন।"[১৩]

কিন্তু অতিদেবতার পদে তো দুজনকে বসান যায় না। তাহলে একটি অসঙ্গতি এসে পড়ে। তাই শেষে উভয়ের গুণের তুলনামূলক বিচার করে বরুণকেই শেষে সেই পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। তুলনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "হে ইন্দ্র ও বরুণ, আপনাদের একজন যুদ্ধে বৃত্রগণকে হনন করেন, অপর একজন ব্রত রক্ষা করেন।"[১৪] সুতরাং দৈহিক শক্তি হতে প্রজ্ঞা ও কল্যাণকর্মে আগ্রহ মহত্তর গুণ বলে বিবেচিত হয়েছে। ফলে তিনি 'স্তুতিযোগ্য রাজা' বলে এবং 'সমস্ত সৎ পদার্থের' রাজা বলে বর্ণিত হয়েছেন।[১৫]

কিন্তু তাতেও চিন্তা থেমে যায় নি: আরও অগ্রসর হয়েছে। বহু-দেবতার উপর এক অতিদেবতা স্থাপন তো সৃষ্টির সরল ব্যাখ্যা নয়: সুতরাং একটি ঐকিক সূত্রের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়েছে। এই পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পাই বিশ্ব দেবতাগণের পরিকল্পনা। অনেক সূক্তে দেখা যায় যেখানে সকল দেবতাকে সমষ্টিগতভাবে প্রশস্তি জানান হয়েছে। এই সামগ্রিক পরিকল্পনা হতেই ঋষির মনে উপলব্ধি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে দেবতা একই, বহু নয়, তাঁরই ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রকাশ আছে। সুতরাং সূর্য, অগ্নি, উষা—এরা বিভিন্ন নয়, একই মহাশক্তি এই সবকিছু হয়েছেন। 'একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্'। প্রাসঙ্গিক রচনাটি এই:

'এক অগ্নি বহু প্রকারে সমিদ্ধ হয়েছেন, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বে

১২. ঋগ্বেদ ॥১॥১০১॥৩ ১৩. ঋগ্বেদ ॥৬॥৬৮॥৯

১৪. ঋগ্বেদ ॥৭॥৮৩॥৯ ১৫. ঋগ্বেদ ॥৭॥৮৭॥৬

প্রভূত হয়েছেন, এক ঊষা এই সমস্তকেই প্রকাশ করছেন। এই একই সর্বপ্রকার হয়েছেন।'[১৬]

এইভাবে বেদের সংহিতার যুগেই ঋষির মন ধীরে-ধীরে কর্ম হতে জ্ঞানের পথে সরে এসেছে। অর্থার্থী মনোভাব হতে জিজ্ঞাসু মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। অর্থার্থী মনোভাব যখন প্রবল ছিল তখন বহুদেবতার উদ্ভব হয়েছিল। জিজ্ঞাসু মনোভাব যেমন প্রবল হয়েছে তেমন প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তির পরস্পরের সঙ্গতি লক্ষ্য করে ঋষি বহুদেবতাবাদ হতে একদেবতাবাদে আকৃষ্ট হলেন। চিন্তা পরিণতি লাভ করলেই এটা সম্ভব হয়। তাই দেখি ঋগ্‌বেদের শেষ অংশে দশম মণ্ডলে এই চিন্তা একটি মূল অংশ অধিকাব করে বসেছে। এইখানেই উপনিষদের ব্রহ্মবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এইপ্রসঙ্গে দশম মণ্ডলের কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সূক্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত মনে হয়। প্রথমে নাসদীয় সূক্ত (১০।১২৯) ধরা যাক। তা যে-তত্ত্ব বহন কবে তাকে ভিত্তি করেই দর্শন গড়ে তোলা যায়। এতে কোনও দেবতার স্তুতি স্থান পায় নি; সৃষ্টি কি করে হলো—'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুত আবভূব' এই প্রশ্নই সোচ্চার হয়েছে।

তারপব আমরা প্রজাপতি সূক্তের (১০।১১১) কথা উল্লেখ করতে পারি। এখানে যে-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তা হলো কোন দেবতাকে উপাসনা করতে হবে, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।' এখানে নানা দেবতা হতে মন সরে এসে একটি দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে প্রজাপতি। বলা হয়েছে তিনি আত্মদা, বলদা; বলা হয়েছে বিশ্ব তাঁর উপাসনা করে।

তারপর আসে আত্মা সূক্ত (১০।১২৫)। তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তার একটি বচন এই: "আমিই দ্যুলোক-ভূলোক নির্মাণ করতে বায়ুর ন্যায় ধাবমান হই।"[১৭] তিনি শুধু স্রষ্টা নন, তিনি

১৬. ঋগ্‌বেদ ॥৬॥৫২॥২ ১৭. ঋগ্‌বেদ ॥১০॥১২৫॥৮

অদৃশ্য, তিনি প্রচ্ছন্ন শক্তি, প্রচ্ছন্নভাবে সর্বত্র তিনি ক্রিয়াশীল। তাই ধাবমান বায়ুর সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে: "আমি দ্যুলোক, ভূলোক আবিষ্ট হয়ে আছি।"[১৮] স্পষ্টতই তাঁকে এখানে সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন সত্তা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে।

সর্বশেষে আসে বিখ্যাত পুরুষ সূক্ত (১০।৯০)। এখানে সমগ্র বিশ্বকে এক বিরাট পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্'—এইসব কিছুই পুরুষ—যা হয়েছে তা এবং যা ভবিষ্যতে হবে তাও। এ-যেন উপনিষদের বচনেরই পূর্বকালীন উচ্চারণ। সৃষ্টিরূপী বিশ্ব এবং পুরুষরূপী স্রষ্টা এখানে একীভূত হয়ে গেছেন। সুতরাং দেবতা এখানে নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় পরিণত হয়েছেন। এইভাবে বেদের সংহিতা অংশের মধ্যেই আমরা উপনিষদের দ্বারে এসে পৌঁছে গেছি।

সুতরাং বেদের সংহিতা অংশে একটি সুন্দর দার্শনিক উপলব্ধির ধীরে-ধীরে বিকাশ লক্ষ্য করতে পারি। তা কয়েকটি অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়ে পরিণত রূপটি লাভ করেছে। প্রথমে ব্যক্তিরূপী বহু-দেবতার পরিকল্পনা। তারপর ব্যক্তিরূপী অতিদেবতার পরিকল্পনা। তারপর বিশ্বদেবতার পরিকল্পনা। এখান হতেই যেন বিশ্বশক্তির ব্যক্তি-রূপটি ধীরে-ধীরে ম্লান হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। আত্মাসূক্তে তার ব্যক্তিরূপ প্রায় তিরোহিত হয়ে তিনি প্রচ্ছন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছেন। পুরুষসূক্তে তিনি একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন সত্তা হয়ে গেছেন। এই পুরুষই উপনিষদে ব্রহ্ম নাম গ্রহণ করেছেন।

তিন

ব্রহ্মবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ

এখন আমরা উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার তুলনা করতে পারি। আমরা দেখব সাধনজীবনের প্রথম

১৮. ঋগ্বেদ ॥১০।১২৫।৬

অধ্যায়ে তিনি উপনিষদের ব্রহ্মবাদের প্রতিই অলক্ষ্যে আকৃষ্ট হয়েছেন। পারিবারিক পরিবেশ এ-বিষয় তাঁকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করতে পারে নি, যদিও অন্যদিকে সেই পারিবারিক পরিবেশ পৌরাণিক ধর্মের সংস্পর্শ হতে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিয়েছিল। নিজের মতিগতির পথে চলতে-চলতেই তিনি বৈদিক পূর্বপুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উপলব্ধির পথে এ-বিষয় তাঁর চিন্তার আশ্চর্য-ভাবে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সহিত ঐকান্তিক সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু তাঁর মানসিক চিন্তা ছিল গতিশীল। তাই দেখি আবার নিজের মতিগতির পথে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ হতে দূরে সরে এসেছেন। তার কারণ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি যেমন প্রবল ছিল, তেমন হৃদয়বৃত্তিও প্রবল ছিল; সম্ভবত প্রবলতর ছিল। জিজ্ঞাসু-মনোভাব-প্রণোদিত হয়ে উপনিষদ যে নৈর্ব্যক্তিক মহাসত্তাকে আবিষ্কার করেছিল, তাকে তিনি গ্রহণ করেও সমগ্র হৃদয়-মন দিয়ে নিতে পারেন নি। তিনি শুধু জানা নয়, তাঁকে পেতে চেয়েছিলেন। অথচ সর্বেশ্বরবাদকেও একেবারে ফেলতে পারেন নি। তারই ফলে নিজের মতিগতির পথে তিনি তাঁর নিজস্ব মৌলিক তত্ত্ব, জীবনদেবতা পরিকল্পনায় উপনীত হয়েছিলেন। জীবনদেবতা বিশ্বসত্তার ব্যক্তিরূপী সংস্করণ; সুতরাং তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়। এইভাবে তিনি উপনিষদের ব্রহ্ম-বাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের একটি সহাবস্থিতির পরিবেশ রচনা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাধনজীবনের এই দুটি পৃথক অধ্যায়ের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের তুলনামূলক আলোচনা গড়ে উঠতে পারে।

তাঁর অধ্যাত্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমে তিনি উপনিষদের ব্রহ্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে। সেটা সম্ভব করেছিল দুটি অবস্থা: প্রথম, পারিবারিক পরিবেশ এবং দ্বিতীয়, তাঁর নিজস্ব মতিগতি। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐকান্তিকভাবে একেশ্বরবাদী ভক্ত ছিলেন,

অথচ পৌরাণিক হিন্দুধর্মে যে-বিগ্রহপূজার রীতি আছে তাকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি! এরজন্যই রামমোহনের অনুসরণে তাঁর নিজস্ব ব্রাহ্মধর্ম পরিকল্পনা। তার দুটি বৈশিষ্ট্য। তা পিতৃরূপী, একক, ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরকে বিশ্ব হতে পৃথক করে রাখে। দ্বিতীয়ত তা বিগ্রহপূজা এবং অবতারবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে মহর্ষির পরিণত জীবনের মত হলো ব্রাহ্মধর্মকে তিনটি প্রভাব হতে মুক্ত রাখতে হবে। প্রথমত উপনিষদের অদ্বৈত তত্ত্বে যেখানে মানুষকেও ঈশ্বরের অঙ্গীভূত বলে কল্পনা করা হয়, তা গ্রহণ করা হবে না। অবশ্য মহর্ষির উপনিষদের বাণীগুলির উপর শ্রদ্ধা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত বিগ্রহপূজাকে বর্জন করা হবে, কারণ তা নিরাকার ঈশ্বরকে জড়বস্তুতে রূপান্তরিত করে। তৃতীয়ত হিন্দুধর্মের বা খ্রীস্টধর্মের অবতারবাদকেও প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কারণ ঈশ্বরের শরীরী প্রকাশ নেই।

মহর্ষি একান্তভাবে ঈশ্বরপরায়ণ ভক্ত ছিলেন। প্রত্যহ উপাসনার ব্যবস্থা ছিল। এই পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন। ফলে একদিকে তাঁর ওপর এই দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারলাভ ঘটেছিল। তিনি পৌরাণিক আনুষ্ঠানিক ধর্মরীতির প্রভাব হতে মুক্ত ছিলেন। এ-কথা তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। এইপ্রসঙ্গে তাঁর নীচে উদ্ধৃত মন্তব্যটি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

"উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালে প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করে নি।"[১৯]

অপরপক্ষে মহর্ষি প্রচারিত একেশ্বরবাদ-ভিত্তিক উপাসনারীতিও তাঁর মনে দাগ টানতে পারে নি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন : "আমাদের

১৯. আত্মপরিচয়, ৫

পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তার কোনও সংশ্রব ছিল না। আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।"[২০]

অথচ আমরা জানি তিনি কিছুকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কাজ করেছিলেন এবং অনেকগুলি সুন্দর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর উপরে উদ্ধৃত উক্তির সঙ্গে তাঁর আচরণের একটি অসঙ্গতি এসে পড়ে। এ-বিষয় তার কারণ বুঝিয়ে তিনি অন্য প্রসঙ্গে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পারিবারিক সংস্কারের এবং পরিবেশের প্রভাবে তিনি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তা ঘটেছিল তাঁর মতিগতির বিরুদ্ধে এবং পরিশেষে যাকে তিনি সত্য বলে বুঝেছিলেন তাকেই গ্রহণ করেছিলেন। উক্তিটির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো:

"তার উপাসনায় আমি যোগ দিতাম, তবে প্রধানত ধর্মসঙ্গীত রচনা করে. বহু উপাসকের ভাবধারা হতে সংগৃহীত নৈষ্ঠিক ভক্তের মনের ছাপ তাতে থাকত। (প্রকৃতপক্ষে) তা ছিল ঐতিহ্যের একটি অস্পষ্ট যৌগিক ভাব।... দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর আমার মনে ধারণা হলো যে আমি সত্যের জীবন্ত মুখ একটি মুখোস দিয়ে ঢেকে রেখেছি এবং তখন আমাদের সমাজের সঙ্গে আমার সংযোগ ছিন্ন করলাম।"[২১]

এ-হতে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটা মতিগতি ছিল এবং তারই দেওয়া নিশানায় একলা-চলা পথিক হতে তিনি ভালবাসতেন। সাধনজীবনে এই পথে যেতে তাঁর বৈদিক পূর্বপুরুষের মতো তিনি প্রকৃতির প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আরও আশ্চর্যের কথা তিনি এই পথে অগ্রসর হয়ে তাঁদেরই মতো একটি অহৈতুক আনন্দের অভিযাত্রী মহাসত্তাব প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কাব কবেছিলেন। ফলে ব্রহ্মবাদের অনুরূপ একটি ভাবনা তাঁর কবিতা, সঙ্গীত ও রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছিল।

আরও এক আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি যে অলক্ষ্যে বেদের জ্ঞানকাণ্ডে

২০. জীবনস্মৃতি, ভগ্নহৃদয়
২১. *Religion of Man*, Chap. VII, The Man of My Heart.

যে-চিন্তা বিকাশলাভ করেছিল তার অনুসরণ করেছেন, এ-বিষয়েও তিনি অবহিত হয়েছিলেন। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর দুটি উক্তির অনুবাদ এখানে স্থাপন করা যেতে পারে। প্রথম উক্তিটি এই :

"আমার সাধনজীবনের প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতাবোধ ফুটে উঠেছিল···যে প্রকৃতি তার বাস্তব সম্পদ ব্যক্তি মনের কাছে উজাড় করে দিয়ে আমাদের মানবিক প্রকৃতির উপর নিত্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।"[২২]

এইপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন : "সেই অতীতের দিনগুলির প্রতি যখন ফিরে তাকাই, আমার মনে হয়, অজানিতে আমি আমার বৈদিক পূর্বপুরুষের পথ অনুসরণ করেছি এবং আমার দেশের গগনে যে একটি মহাসুন্দরের আভাস আছে তার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।"[২৩]

এইভাবে তাঁর বৈদিক পূর্বপুরুষের দর্শিত পথ অনুগমন করে তিনি তাঁদেরই মতো এক সর্বব্যাপী লীলাভিসারী প্রচ্ছন্ন সত্তার উপস্থিতির ইঙ্গিত পাচ্ছেন এবং তাকে জানবার জন্য আকুল হচ্ছেন। কোনও দিন বনের পথে যেতে-যেতে তাঁর মনে হয়েছে বাতাসে যে-গন্ধ ভাসে তা যেন কার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতির আভাস দেয় :

সেদিন চলে যেতে যেতে চমক লাগে !
মনে হল বনের কোণে হাওয়াতে
কার গন্ধ জাগে।[২৪]

মনোরম শরতের দিনে আলো-ছায়ার খেলায় নীল আকাশে সঞ্চরমান শাদা মেঘ তাঁকে সেই প্রচ্ছন্ন সত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে :

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।[২৫]

২২. *Religion of Man*, Chap. I, Man's Universe.
২৩. *Religion of Man*, Chap. VI. The Vision.
২৪. গীতিমাল্য, ৫ ২৫. গীতাঞ্জলি, ৮

বর্ষার দিনে জুঁইফুল দেখে মনে হয়েছে কে যেন মালা গেঁথেছেন, বর্ষার আঁধারে মনে হয়েছে কে যেন শয়ান আছেন :

আজ বাদল হাওয়ায় কোথারে জুঁই গন্ধে মেতেছে।
লুপ্ত তারার মালা কে আজ লুকিয়ে গেঁথেছে।
আজি নীরব অভিসারে
কে চলেছে আকাশ পারে
কে আজি এই অন্ধকারে শয়ন পেতেছে।[২৬]

তারপর দেখি দ্বিতীয় অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ এক প্রচ্ছন্ন শক্তিতে সর্বব্যাপী এবং সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তারূপে কল্পনা করেছেন। প্রথম অবস্থাটি ঋগ্‌বেদের সংহিতা অংশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপ করার সহিত তুলনীয়। আর এই দ্বিতীয় অবস্থাটি যেন বেদ ও উপনিষদে বিকশিত যে-উপলব্ধি বলে এক সর্বব্যাপী মহাসত্তা প্রচ্ছন্নভাবে সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তার সহিত তুলনীয়। এই প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী নিয়ামক সত্তার ছবিটি সুন্দর ধরা পড়েছে নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশে। এখানে গগনে অবস্থিত গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবীর বক্ষে আশ্রিত উদ্ভিদ-জীব—এদের ধেনুর সহিত তুলনা করা হয়েছে এবং বিশ্বসত্তাকে অদৃশ্য রাখাল বালকের সহিত তুলনা করা হয়েছে। যেমন তাকে দেখা যায় না, অথচ তার বাঁশি শোনা যায়, তেমন এই সত্তাকে দেখা যায় না, তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। প্রাসঙ্গিক কাব্যাংশটি এই :

এই তো তোমার আলোক ধেনু
সূর্যতারা দলে দলে।
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহাগগনতলে।

২৬. খেয়া, বর্ষাসন্ধ্যা

তৃণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয় চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে।[২৭]

এরপর দেখি রবীন্দ্রনাথ এই চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছেন যে বিশ্ব এক মহাশক্তির রচিত শিল্প, কিন্তু সে শিল্পীকে দেখা যায় না, তাঁকে এড়ানোও যায় না। ঋষির বাণী উদ্ধৃত করেই তিনি তাঁর এই উপলব্ধির কথা ঘোষণা করেছেন। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

"অন্তি সন্তং ন জহাতি
অন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং
ন মমার না জীর্যতে।'

কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু দেখো সেই দেবতার কাবা, সে কাব্য মরে না, জীর্ণ হয় না।[২৮]

এইভাবে দেখি রবীন্দ্রনাথ নিজের মতিগতির পথে তাঁর বৈদিক পূর্বপুরুষের পথ অনুসরণ করে তাঁরা যেখানে পৌঁচেছিলেন সেখানেই উপস্থিত হয়েছেন। সাধনজীবনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে উপনিষদের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। কত ঘনিষ্ঠভাবে হয়েছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর একটি কাব্যাংশ হতে। তাতে যেন দেখি উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মর্মকথা তার মধ্যে বিধৃত আছে। ব্রহ্মবাদ বলে একই মহাসত্তা আনন্দ আস্বাদনের জন্য আপনার উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই বহুধারা বিখণ্ডিত দৃশ্যমান বিশ্বে রূপান্তরিত হলেন। তারই প্রতিধ্বনি পাই রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যাংশে :

২৭. গীতিমাল্য, ১০৩ ২৮. আত্মপরিচয়, ৬

যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলন ঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ, গন্ধ, গীত করিছে রচনা।[২৯]

চার

জীবনদেবতা তত্ত্ব ও ব্রহ্মবাদ

তাঁর মতিগতি যেমন রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, তেমন তাঁর মতিগতিই তাঁকে ব্রহ্মবাদ হতে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। তার কারণ, উপনিষদের ঋষির মনের গঠনপ্রকৃতির সহিত তাঁর মনের গঠনপ্রকৃতির ভিন্নতা। উপনিষদের ঋষির বুদ্ধিবৃত্তি একান্ত প্রবল ছিল। তাই তিনি জ্ঞানের পথে বিশ্বসত্তার পরিচয়লাভের প্রয়াসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যেমন বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল ছিল, তেমন হৃদয়বৃত্তিও প্রবল ছিল। তাঁর অনুভূতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল বলেই তিনি এত বড় কবি হয়েছিলেন। তাই তিনি শুধু বিশ্ব-সত্তার পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেন নি, তাঁর সহিত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসুক হয়েছিলেন। শুধু জানতে নয়, তাঁকে প্রীতির সম্পর্কে পেতেও চেয়েছিলেন। তাঁর এই পাবার আকূতিই তাঁকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যে-প্রচ্ছন্ন সত্তার উপস্থিতি তিনি প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে তিনি আকুল আবেগ নিয়ে পেতে চেয়েছিলেন তার সুন্দর পরিচয় মেলে নীচের এই কাব্যাংশে। আকাশের ঘননীল মেঘের সমারোহ দেখে তিনি অনুভব করেছিলেন তাতে সাড়া দিয়ে তাঁর হৃদয় ময়ূরের মতো নাচছে এবং এক অজানাকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা তাঁকে পাগল করেছে :

২৯. স্মরণ, ২২

শতবরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণে আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে।[৩০]

তাই আমরা দেখি তিনি উপনিষদের জিজ্ঞাসু মনোভাব সর্বান্তঃকরণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। উপনিষদে ভক্তির অবকাশ ছিল না, কারণ সেখানে বিশ্বশক্তি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা রূপে পরিকল্পিত। অথচ তিনি ভক্তির পথেও তাঁকে পেতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে এক ভাষণে এই মন্তব্য করেছেন:

"আমাদের সাধনার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল। আমরা ব্রহ্মসাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলাম তখন জ্ঞানকে একান্ত করে তুলেছিলাম।"[৩১]

এই অসন্তোষের ফলেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ব্রহ্মবাদ হতে সরে এসে একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অবকাশ নেই। একেশ্বরবাদের ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট; কাজেই তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অবকাশ আছে। এই কারণেই মনে হয় তিনি আবার পারিবারিক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ব্রাহ্মসমাজের পরিকল্পনায় ঈশ্বর পিতৃরূপী; তিনি শাসন করেন, কিন্তু স্নেহপরায়ণ।' এই আদর্শের অনুসরণে যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত একটি বাণীকে ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনায় একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হলো: পিতা নোঽসি।[৩২]

৩০. ক্ষণিকা, নববর্ষ
৩১. শান্তিনিকেতন, সামঞ্জস্য
৩২. শুক্ল যজুর্বেদ ।৩৭।২০

রবীন্দ্রনাথ এই বাণীটির প্রতি কতখানি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তা বেশ বোঝা যায় তাঁর 'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক ভাষণমালায়। তা হতে তাঁর কিছু প্রাসঙ্গিক উক্তি এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "আমরা তাঁকে (ঈশ্বরকে) পিতা রূপেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি।" তারপর বলেছেন, "সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্ছে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ।"[৩৩]

পিতারূপে সাধনার প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি আরও কিছু কথা বলেছেন যা আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেছেন, এই সম্বন্ধের মধ্যে দুটি উপাদান আছে। একদিকে পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ একটি নিবিড় ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ। অপরদিকে ঘনিষ্ঠ হলেও তিনি ভক্ত হতে অনেক বড়। পুত্রত্বের ভিতর দিয়ে যেমন একত্বের যোগসূত্র আছে, বৃহত্তর শক্তি হিসাবে একটি ভেদেরও সম্বন্ধ আছে। একত্বের সম্বন্ধ আনে প্রীতি আর বিরাটত্বের ধারণা আনে নতি এবং আত্ম-নিবেদনের মনোভাব। সুতরাং এই সম্বন্ধের মধ্যে একটি মিশ্রভাব জড়িত; প্রীতির সঙ্গে প্রণতি এখানে মিশে গেছে। এই বিষয় এখন তাঁর নিজের কথা শোনা যাক:

'ওঁ পিতা নোঽসি'—এই মন্ত্রে দুটি ভাবের সামঞ্জস্য আছে। একদিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে, পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছে। আর একদিকে পিতা হচ্ছেন বড়ো, পুত্র ছোট।

"একদিকে অভেদের গৌরব, আর একদিকে ভেদের প্রণতি। পিতার সঙ্গে অভেদ নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি; কিন্তু স্পর্ধা করতে পারিনে। আমার যেখানে সীমা আছে সেখানে আমার মাথা নত করতে হবে।"[৩৪]

৩৩. শান্তিনিকেতন, নমস্তেঽস্তু

৩৪. শান্তিনিকেতন, ভয় ও আনন্দ

মনে হয় তাঁর মনের এই অবস্থায় তিনি পারিবারিক ধর্মকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'শান্তিনিকেতনে'র অন্তর্ভুক্ত 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে। সেখানে তাঁর প্রতিপাদ্য হলো এই যে আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যে 'একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল'। একদিকে ঔপনিষদিক ব্রহ্মসাধনায় জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়ে, 'জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলাম'। অপরদিকে পৌরাণিক যুগে যখন ভক্তির পথ গ্রহণ করেছিলাম তখন ভক্তিভাবের উপর বেশি জোর দিয়ে নিজেকে উচ্ছ্বসিত করে 'একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত সৃষ্টি কবেছিলাম'। তাঁর ধারণায় ব্রাহ্মধর্ম এই অসামঞ্জস্য দূব করতে পেরেছিল। একদিকে তা যেমন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নি, আপরদিকে 'ভক্তিকে ভাবোচ্ছ্বাসে বিকৃত হতে দেয় নি।'

কিন্তু তাঁর মতিগতি তাঁকে ব্রাহ্মধর্ম হতে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই বারবার মত পরিবর্তন তাঁর মনের গতিশীলতারই পরিচয় দেয় এবং দেখায় যে তিনি কোনও প্রচলিত সাধনরীতিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যাকে গ্রহণ কবতেন তাকে নিজের মতিগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই গ্রহণ করতেন। আবার যখন নূতন উপলব্ধির আলোকে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করতেন, নিজের মত পরিবর্তিত করতেন। এইভাবে তিনি ধীরে ধীরে সাধনপথে তাঁর সাধনায় লব্ধ উপলব্ধির পরিণত রূপটি আবিষ্কার করেছিলেন।

এই মত পরিবর্তনের মূল কারণ হলো পিতারূপী ঈশ্বরের পরিকল্পনার পরিপূর্ণরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না, অথচ তাঁর মন চাইত সাম্যের ভিত্তিতে ঈশ্বরকে পেতে। পিতারূপে ঈশ্বরকে ধারণা করলে সেটা সম্ভব হয় না। এখানে বাৎসল্যরসের সাধনার সঙ্গে মধুররসের সাধনার সংঘর্ষ এসেছিল। বাৎসল্যরসের সঙ্গে যেন একটা ছোট এবং বড়র ভাব জড়িত আছে। এখানে সাধক ছোট, ঈশ্বর বড়; একদিকে ভক্তি, অপরদিকে স্নেহ। এই পরিকল্পনায় তো

পরিপূর্ণ মিলন সম্ভব হয় না। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে সাম্যের ভিত্তিতে প্রীতির সম্বন্ধে পেতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর মনে পিতাতত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ পিতারূপের ভিত্তিতে বাৎসল্য রসের পথে চলবেন, না সখারূপের ভিত্তিতে মধুর রসের পথ অবলম্বন করবেন—এই নিয়ে একটা দোটানায় পড়েছিলেন। তাঁর পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব তাঁকে বাৎসল্য রসের দিকে টানছিল। অপরদিকে তাঁর মতিগতি তাঁকে মধুর রসের সাধনার পথে আকর্ষণ করছিল। এই দোটানার মনোভাব সুন্দর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশে :

দেব্‌তা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দুহাত ধরি নে।[৩৫]

শেষে নিজের মতিগতিরই জয় হলো। তিনি পারিবারিক ধর্ম হতে দূরে সরে এলেন। এক নূতন সূত্র ধরে, জীবনের এক দিব্য অনুভূতিকে অবলম্বন করে তিনি জীবনদেবতা তত্ত্বে উপনীত হলেন। তার কথা তিনি সবিস্তারে 'দি রিলিজিয়ন অব ম্যান' গ্রন্থে লিখেছেন। সে উপলব্ধির পরিচয় তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে আছে। এই জীবনদেবতাকে আবিষ্কার, তাঁর সহিত বিচ্ছেদের ব্যথা এবং পরিশেষে তাঁর সহিত মিলনে আনন্দ তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে বিধৃত। এই তত্ত্ব তিনি তাঁর দুটি প্রতীকধর্মী নাটকেও প্রচার করেছেন : 'রাজা' ও 'অরূপরতন'। তিনি ভক্তের হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থান গ্রহণ করেন বলে তিনি 'অন্ধকার ঘরের রাজা'। তাঁর নিজের কোনও বিশেষ প্রকাশ নেই বলেই তিনি 'অরূপরতন'। ভক্তের সহিত প্রীতির সম্বন্ধে ভক্তের মনে যে আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ

৩৫. গীতাঞ্জলি, ২৯

মথিত হয়ে ওঠে তাতেই তাঁর অস্তিত্ব প্রতিফলিত।

এই জীবনদেবতাতত্ত্বও রবীন্দ্রনাথের মনে গড়ে উঠেছিল আর একটি দোটানার প্রভাবে। জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়ে প্রকৃতির মধ্যে তিনি এক প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অবকাশ পান নি। তাই একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে পিতারূপী ঈশ্বরের কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তাতেও হৃদয়বৃত্তির পরিপূর্ণ তৃপ্তি ঘটে নি। তাই হলো জীবনদেবতা তত্ত্ব। তা যেন এ দুয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করে তাদের সহাবস্থিতি সম্ভব করায়। তার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যেন তিনি অবহিত ছিলেন মনে হয়। তাঁর সমালোচক অধ্যাপক টমসন-এর কাছে তার ব্যাখ্যা করে তিনি যে চিঠি লেখেন তা এই প্রতিপাদ্য সমর্থন করে। তিনি বলেছেন, জীবনদেবতাতত্ত্বের দুটি দিক আছে। একটি দিক উপনিষদের ব্রহ্মবাদ সমর্থন করে। সেখানে তিনি বিশ্বের নিয়ামক শক্তি। অপরদিক বলে তিনি অতিরিক্তভাবে ভক্তের হৃদয়ে স্থান নিয়ে তার সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে উৎসুক। এর মধ্যে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের সহিত বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের দ্বৈতবাদের যেন সহাবস্থিতি ঘটেছে।[৩৬]

এই জীবনদেবতাতত্ত্বের উৎপত্তি সংঘটিত হয়েছে খানিকটা দিব্য-অনুভূতির ভিত্তিতে খানিকটা চিন্তার ফলে। দিব্য-অনুভূতির কথাই প্রথমে বলা যাক। সে বিষয় রবীন্দ্রনাথ দু-জায়গায় বিবরণ দিয়েছেন। একবার 'মানুষের ধর্মে'র (সংযোজন) অংশে। আর একবার তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায় যা 'রিলিজিয়ান অফ ম্যান' নামে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটা ঘটেছিল সাহাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে।

৩৬. The idea has a double strand There is the Vaishnava dualism —always keeping the separateness of the salf—and there is the Upanishadic monism. God is wooing each individual , and God is also the ground-reality of all as in the Vedantist unification. *Rabindranath,* Edward Thompson Jivan Debata, p. 105.

তিনি সেদিন স্নানের আগে দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে নববর্ষার জলভারনত মেঘের শোভা দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো তাঁর অন্তরে একটি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা রয়েছেন যিনি কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করছেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর মনে ধারণা জন্মাল যে একটি বিশেষ সত্তা তাঁকে এবং বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে আছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নিজের পূর্ণতম প্রকাশের সন্ধান করছেন। এই উক্তিটি পাই 'রিলিজিয়ন অব ম্যান'-এ।[৩৭]

'মানুষের ধর্মে'র সংযোজন অংশ এই সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা আছে। তাঁর ধারণা এই জীবনদেবতা ব্যক্তিবিশেষের অন্তরে থেকে তার জীবনকে পরিচালিত করেন। তাঁর ভূমিকা অনেকটা নাট্যকার এবং নাটকের নির্দেশকের ভূমিকার মতো। তিনি বিশ্বনাট্য রচনা করেছেন, ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ ভূমিকা দিয়েছেন। অতিরিক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে জীবন-শিল্পীরূপে তার জীবনকে গড়ে তুলতে উৎসুক হয়েছেন। নাটকের নির্দেশকের অভিনেতার সঙ্গে যেমন একটা প্রীতির সম্বন্ধ আছে এবং তাকে কি ভাবে কি অভিনয় করতে হবে শিখিয়ে দিচ্ছেন, তেমন অভিনেতা ঠিকমতো অভিনয় করছেন কিনা তা দেখে তিনি সাফল্যে আনন্দ পাচ্ছেন, অসাফল্যে বেদনা পাচ্ছেন। অনুরূপভাবে জীবনদেবতা জীবননাট্যের অভিনয়েও আছেন তার বাহিরেও আছেন। তিনি ব্যক্তিবিশেষের মধ্য দিয়েই তার সহযোগিতা নিয়ে নিজের ইচ্ছাটি পূরণ করতে চাইছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

'কিন্তু পরমপুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার করে এবং

৩৭. I felt sure that some Being who comprehands me and my world, was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever-widening individuality which is a spiritual work of art. *Religion of Man*. The Vision.

অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা তেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং পেরিয়ে।'[৩৮]

একেই রবীন্দ্রনাথ 'সীমার মাঝে অসীমে'র প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। জীবনদেবতা অসীম এবং অশরীরী, ব্যক্তি মানুষকে অতিক্রম করে তিনি পরিব্যাপ্ত। ভক্ত সসীম। ব্যক্তিবিশেষের বা ভক্তের হৃদয়ে স্থান নিয়ে তার সহযোগিতা নিয়ে তিনি তার জীবনকে পরিচালিত করেন। নাট্যের নির্দেশক যেমন অভিনেতার অভিনয়কে পরিচালিত করেন। এর মধ্যে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। যে ভক্ত তাঁকে গ্রহণ করে তার সহযোগিতা নিয়েই তিনি তাকে ফুটিয়ে তোলেন। কারণ, এটা তো প্রীতির সম্বন্ধ, জবরদস্তি কাজ করিয়ে নেবার ব্যাপার নয়। ভক্ত জীবনদেবতার সহিত সহযোগিতা করবে কিনা, তা ভক্তের ইচ্ছাধীন। এখানে তিনি প্রেমের ভিখারী; প্রেম তো জবরদস্তি করে পাওয়া যায় না. তাই তিনি বলেছেন, এটি দুজনের সহযোগিতার লীলা 'সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ, কেন না স্বাধীন না হয়ে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলবে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হতে পারবে না।'[৩৯]

সুতরাং ভক্ত ও জীবনদেবতার মধ্যে এই লীলার প্রকৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত ভক্তের জীবনকে অবলম্বন করে উভয়ের পরস্পরের সহযোগিতায় জীবনদেবতার ইচ্ছাটি ভক্তের কাজের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ভক্তের সহযোগিতা করা তার নিজের ইচ্ছাধীন। সুতরাং এই লীলা সাম্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এবং উভয়ের প্রয়োজনেই এই সহযোগিতা। তাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এই পরিকল্পনায় একটি দৃপ্তভাব ফুটে উঠেছে। ভক্ত অবজ্ঞার পাত্র নয়, প্রীতির প্রকাশের জন্য ঈশ্বরেরও ভক্তকে প্রয়োজন আছে। সেই দৃপ্তভাব এই কাব্যাংশে সুন্দর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

৩৮. মানুষের ধর্ম—৩ (সংযোজন)
৩৯. শান্তিনিকেতন, বিশেষ

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।[৪০]

এই হলো রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় 'সীমার মাঝে অসীমে'র লীলা। তাকে তিনি 'মধুর প্রকাশ'ও বলেছেন। এখানে ভক্ত ও দেবতা উভয়ে মিলে ভক্তের জীবনকে পরিস্ফুট করে চলেছেন। তাই ভক্তের জীবনের কর্মধারার মধ্যে দেবতারই ইচ্ছা তরঙ্গিত হচ্ছে। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই:

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলেছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।[৪১]

এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের মধুর রসের সাধনার সঙ্গে জীবন-দেবতাতত্ত্বের সাদৃশ্যের কথা প্রসঙ্গত এসে পড়ে। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধের চারটি সম্ভাব্য রূপের উল্লেখ আছে: দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। এই শৃঙ্গারকেই মধুর রস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।[৪২] ঈশ্বরের সহিত ভক্তের সম্বন্ধ কোন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তার ওপরেই এদের বিভিন্নতা নির্ভর করে। দাস্যে ঈশ্বরকে প্রভু কল্পনা করা হয়, সখ্যে বন্ধুরূপে কল্পনা করা হয়, বাৎসল্যে পিতা বা মাতারূপে কল্পনা করা হয়, আর মধুরে দয়িত বা প্রেমাস্পদরূপে কল্পনা করা হয়। সেখানে প্রীতির সম্বন্ধের পরিপূর্ণ রূপটি পাই। তাই তাকে মধুরসও বলা হয়। শ্রীরাধার সাধনা মধুর রসের সাধনা।

৪০. গীতাঞ্জলি, ১২১
৪১. গীতাঞ্জলি, ১২১
৪২. চৈতন্য চরিতামৃত

জীবনদেবতাতত্ত্বের সঙ্গে মধুর রসের সাধনার মিলও আছে অমিলও আছে। মিল এই জন্য যে উভয় ক্ষেত্রেই প্রীতি পরিপূর্ণতম রূপে প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়। কিন্তু দুই তত্ত্বের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্যও আছে। রাধাভাবে সাধনায় ঠিক সাম্যের ভাব পাওয়া যায় না; তাঁর দয়িত যেন তাঁর থেকে বড়, এই ধরনের একটা চিন্তা বৈষ্ণব সাধনশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র্য আছে। এখানে বলা হয়েছে রাজার রাজা হয়েও জীবনদেবতা ভক্তের প্রেমের ভিখারী। এই চিন্তায় সাম্যের বোধ অত্যন্ত প্রকট।

দ্বিতীয়ত বৈষ্ণব সাধনায় ঈশ্বরের সহিত প্রীতির চর্চাই ভক্তের সমগ্র মন জুড়ে বসে। ফলে ভক্তের কল্যাণধর্মী কর্ম করবার কোনও অবকাশ থাকে না। কর্মবৃত্তি তাঁর একরকম উপবাসে থাকে। ভক্তি-ভাবকেই এইভাবে সবস্ব করে তোলা রবীন্দ্রনাথের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁর জীবনদেবতা কর্মযোগী; শুধু প্রীতির আস্বাদনে তাঁর লীলা' সীমিত নয়। তাই তিনি উপদেশ দিয়েছেন, 'কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরি'। কর্মের মধ্য দিয়েও মধুর রসের সাধনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় কেবল ভক্তির উচ্ছ্বাসে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তা হয়ে দাঁড়ায় ফেনিল ভাবোন্মত্ততা। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই:

'আমাদের সাধনা যেমন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল, ভক্তি তখন বিচিত্র কর্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে, নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত সৃষ্টি করেছে।'[৪৩]

বিশ্বসত্তারই যে জীবনদেবতারূপে ভক্তের হৃদয়ে বিশেষ প্রকাশ ঘটে এ বিষয় আগেই উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির মধ্যে কিছু অস্পষ্টতা থাকায় তা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে জীবনদেবতা একটি স্বতন্ত্র সত্তা।

৪৩. শান্তিনিকেতন, ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা

যে মন্তব্যটিকে ঘিরে এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা এই :

'বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ চন্দ্র তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ'।[৪৪]

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের এমন নানা পরিপূরক উক্তি পাওয়া যায় যার সাহায্যে এ বিতর্কের সহজ মীমাংসা হয়ে যায়; বিভিন্ন বিরোধী মতের সম্মুখীন হয়ে বিভ্রান্ত হতে হয় না। তাই তাঁর কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে স্থাপন করবার প্রস্তাব করি।

'অরূপরতন' প্রতীকধর্মী নাটক। তার বিষয় হলো একটি কাহিনীর সাহায্যে জীবনদেবতার প্রকৃতির কিছু পরিচয় দেওয়া। তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি মন্তব্য করেছেন যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে স্পষ্টই বিশ্বদেবতার সঙ্গে জীবনদেবতার কোনও বিভেদ টানা হয় নি, তাঁরা যে উভয়েই এক, এই কথার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে :

'যে প্রভু সকল দেশে সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।'

'শান্তিনিকেতনে'র ভাষণমালায় 'সৌন্দর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বশক্তির দুই পর্যায়ে প্রকাশ : একটি কাজের প্রকাশ, অপরটি আনন্দের প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে তিনি 'সত্য' রূপে প্রকাশ। সেখানে তাঁর নিয়ম অমোঘ। আর আনন্দরূপে প্রকাশ সৌন্দর্যের মধ্যে। সেইরূপে তিনি প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়ে ভক্তকে বলেন, 'আমাতে তোমাতে আনন্দ হোক; তুমি স্বতঃ আমাকে গ্রহণ কর।'

বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতার একত্ব আরও স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত

৪৪. মানুষের ধর্ম', (সংযোজন)

হয়েছে 'শান্তিনিকেতনে'রই অন্তর্ভুক্ত আর একটি ভাষণে।[৪৫] সেখানে তিনি বলেছেন, বিশ্বে যেখানে নিয়মের রাজত্ব চলছে সেখানে তিনি 'বিধাতা' সেটা তাঁর কাজের প্রকাশ। আর একটি প্রকাশ আছে বন্ধুরূপে মানুষের মনে। সেটাই আনন্দের প্রকাশ। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

'কিন্তু তিনি তো শুধু বিধাতা নন, "স এব বন্ধুঃ" ; তিনিই যে বন্ধু।'

'বিধাতার প্রকাশ তো বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোন্‌খানে ? বন্ধুর প্রকাশ তো নিয়মের ক্ষেত্রে নয়, সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে, প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথা হবে ?'

এই উক্তিগুলি হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতা ও বিশ্বসত্তার মধ্যে কোনও ভেদ টানেন নি। একই সত্তার যে তারা ভিন্ন প্রকাশ, তা বোঝাতে তিনি কোথাও বলেছেন একটি সত্তারূপে প্রকাশ, অন্যটি আনন্দরূপে প্রকাশ, কোথাও বলেছেন একটি বিধাতা-রূপে প্রকাশ অন্যটি বন্ধুরূপে প্রকাশ। সুতরাং বিশ্বদেবতা ও জীবন-দেবতা পৃথক সত্তা নয়, একই মহাসত্তার দুই ভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ—একটি প্রকৃতির মধ্যে নিয়মরূপে, অন্যটি মানুষের হৃদয়ে ভক্তের প্রেমের ভিখারী রূপে। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ, অন্যটি ব্যক্তিরূপী প্রকাশ।

এই আলোচনার আরম্ভে বলা হয়েছিল জীবনদেবতাতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল খানিকটা দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে, খানিকটা কবির নিজস্ব মতিগতির পথে যুক্তির প্রভাবে। এর সমর্থক যুক্তি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন প্রকৃতির কাছ হতেই পাঠ নিয়ে। তাঁর প্রতিপাদ্য হলো একই বিরাট সত্তা দুই বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা রাখেন। একটি প্রকাশ হলো সমগ্র বিশ্বে ক্রিয়াশীল একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তিরূপে। অপরটি হলো ব্যক্তিবিশেষের কাছে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট প্রেমিকরূপে। প্রকৃতির মধ্যে তার একটি সমর্থক দৃষ্টান্ত তিনি লক্ষ্য

৪৫. শান্তিনিকেতন, বিধান

করেছিলেন। সেটি 'উৎসর্গ'-এর একটি কবিতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৪৬]

আকাশের সূর্য একটি বিরাট বস্তু, বিপুল তার শক্তি, আকাশের মতো বিরাটতর আধার না হলে তাকে ধারণ করবে কে? অপরপক্ষে ঘাসের ডগায় লম্বমান শিশিরবিন্দু একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র বস্তু। উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক সম্ভব নয় বলেই মনে হবে। শিশির-বিন্দুরও তাই ধারণা। তাই সে বলছে :

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে
করিতে পারিনে সেবা।

কিন্তু সত্যই কি সূর্য তাকে ধরা দেন না? তিনি যেমন বিরাট বিশ্বকে কিরণে ভরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন, তেমন শিশিরবিন্দুর বক্ষে প্রতিফলিত হবারও ক্ষমতা রাখেন। তপন তাই উত্তরে বলছেন :

আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।

এই উপমাটি মনে হয় অপূর্ব হয়েছে। এতে যেন রবীন্দ্রনাথের মনের ধারণার প্রতিধ্বনি পাই। রবীন্দ্রনাথ যেন শিশিরবিন্দু এবং বিশ্বসত্তা যেন সূর্য। সূর্যের দুই পর্যায়ে প্রকাশ। নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে মহাকাশে এবং ব্যক্তিরূপী সত্তারূপে শিশিরবিন্দুর বক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়ে। বিশ্বসত্তারও প্রকাশ দুই পর্যায়ে, বিশ্বদেবতারূপে এবং জীবনদেবতারূপে, বিধাতারূপে ও বন্ধুরূপে। একটি কাজের প্রকাশ, অপরটি আনন্দের প্রকাশ।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে এক অবস্থায় গ্রহণ করে, পরের অবস্থায় তা হতে সরে এসেছিলেন। কারণ, ব্রহ্মবাদ একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তার জ্ঞানের পথে পরিচয় দেয়। সুতরাং তাতে

৪৬. উৎসর্গ ১২

হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগের অবকাশ নেই। ভক্তিমার্গে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের সাধনায় হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগের এবং তৃপ্তির যথেষ্ট সুযোগ মেলে। এই পথে তিনি প্রথমে পারিবারিক ধর্মচিন্তার প্রভাবে পিতারূপী ঈশ্বরের পরিকল্পনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন; কিন্তু তাতে তিনি তৃপ্তি পান নি। কারণ, তিনি ঈশ্বরের সহিত আরও নিবিড় সম্বন্ধ চেয়েছিলেন। এই অতৃপ্তির প্রভাবেই তিনি তাঁর জীবনদেবতাতত্ত্বকে লাভ করেছিলেন। তবে ঔপনিষদিক চিন্তাকে একেবারে ঠেলতে পারেন নি। তাই জীবনদেবতাতত্ত্বের মধ্যে দেখি নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মবাদের সহিত একেশ্বরবাদের ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য এক অভিনব পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। এ সত্যই এক অভিনব সৃষ্টি। সুতরাং বলা যায় তাঁর সাধনপথে ব্রহ্মবাদের কাছে এসে আবার সরে গিয়েছিলেন। তবু উপনিষদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ শিথিল হয় নি। জীবনদেবতাতত্ত্বই তার প্রমাণ।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বৈতভাব তত্ত্ব

এক

দ্বৈতভাব ও মায়াবাদ

দৃশ্যমান বিশ্বের মধ্যে একটি দ্বৈতভাব ক্রিয়া করছে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে আমরা যে বিশ্বের সহিত পরিচিত হই তা বৈচিত্র্যে ভরা। চোখে দেখি নীল আকাশের ঊর্ধ্বে বিস্তার, মেঘের গায়ে দেখি রামধনুর সাত রঙের সমাবেশ, পৃথিবীর বক্ষে দেখি উদ্ভিদের সবুজ সমারোহ, ফুলে দেখি রঙের বাহার! কান দিয়ে শুনি কত বিচিত্র শব্দ; ঘ্রাণ শক্তি দিয়ে আঘ্রাণ করি কত বিচিত্র ধরনের ঘ্রাণ। রাতের অন্ধকারে যে-ফুল ফোটে তা কোথায় আছে জানি না, অথচ বাতাসে বাহিত তার সুগন্ধ আমাকে পুলকিত করে। এই ভাবে দেখা যায়, বিশ্বের যে পরিচয় আমরা পাচ্ছি তার মধ্যে একটি দ্বৈতভাব ক্রিয়া করছে। একদিকে আছে বহির্জগতের নানা বস্তু, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যাদের পরিচয় এনে দিতে পারে। অপর দিকে আছে তাদের সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে এমন একটি মন।

উপনিষদ এই দ্বৈতভাব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল। যার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গুলি খবর এনে দেয় তাকে উপনিষদে বিষয় বলা হতো। আর যা ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয় তাকে উপনিষদে ভোক্তা বলা হতো। কঠ উপনিষদে এই দ্বৈততত্ত্বকে একটি উপমার সাহায্যে বোঝান হয়েছে। বিশ্ব যেন একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র। আমাদের তার সহিত পরিচিত হতে হবে। ছোট জায়গায় পায়ে

হেঁটে ঘুরে আসা যায় ; কিন্তু বিরাট জায়গায় তা সম্ভব নয়। একটি যানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই কল্পনা করা হয়েছে বিশ্ব দর্শনের জন্য মানুষের মন যেন একটি রথে চড়ে বসেছে ; আর ইন্দ্রিয়গুলি যেন অশ্বের মতো সেই রথটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মন যেন পাঁচ ঘোড়ার রথে চড়ে বিশ্বরূপ দর্শন করছে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ॥
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥[১]

সুতরাং এই বিশ্লেষণ অনুসারে বহির্বিশ্ব হলো বিষয়, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্বের মতো আমাদের তাদেব সহিত সংযোগ ঘটায়, আর অন্যদিকে ভোক্তা তাদের খবব নেয়। ভোক্তা আবার তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত : ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা। ইন্দ্রিয় খবব আনে, মন তাব অর্থ-গ্রহণ করে এবং আত্মা তা উপলব্ধি কবে। বোঝাই যায় একটা ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি দেখা হয়েছে। মোট কথা হলো বিশ্ব প্রকট হয় না একটি দ্বৈতভাব না থাকলে। তাব একদিকে বিষয়, অপর দিকে ভোক্তা। দুয়ের পরস্পব সংঘাতে বিশ্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে আবও কিছু অতিরিক্ত কথা বলা হয়েছে। তাতে এই দ্বৈতভাবেব পূবে একটি অদ্বৈতভাব স্থাপন কবা হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বসত্তা বা ব্রহ্ম বা আত্মার দুটি পৃথক অবস্থা হতে পাবে। একটি হলো অদ্বৈত অবস্থা যেখানে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ বা ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ থাকে না। সেখানে কেবলমাত্র অদ্বৈতভাবই প্রকট। আর একটি অবস্থা থাকে যেখানে জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় সম্বন্ধের ভিত্তিতে একটি দ্বৈতভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেখানেই বহু দ্বারা খণ্ডিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহু ও বিচিত্র বিশ্বের সমাবেশ আবিষ্কৃত হয়। আর বলা হয়েছে এই দ্বৈতভাবের ও উপলব্ধির তারতম্য আছে। সেখানে তিনটি অবস্থা

১. কঠ ।১।৩।৬

আছে। প্রথম, যেখানে দ্বৈতভাব পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত; দ্বিতীয়, যেখানে বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ ছিন্ন হলেও দ্বৈতভাব প্রকট; তৃতীয়, যেখানে দ্বৈতভাব প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। প্রথমটি জাগ্রত অবস্থা, দ্বিতীয়টি স্বপ্ন-অবস্থা এবং তৃতীয়টি সুষুপ্তি-অবস্থা। কাজেই ব্রহ্মের চারটি অবস্থা পাই। সুতরাং তিনি চতুষ্পাৎ।[২]

এই ব্যাখ্যা অনুসারে চারটি অবস্থার বিন্যাস এইভাবে হবে:

১। দ্বৈতভাবমণ্ডিত অবস্থা। তার অন্তর্ভুক্ত তিনটি অবস্থা পাই:

(ক) মানুষের জাগ্রত অবস্থা (উপনিষদের ভাষায় জাগরিত স্থান)। এখানে মন বহিঃপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ বাহিরের বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ ঘটে এবং তাদের পরস্পরের সংঘাতের ফলে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ গন্ধের বিচিত্র বিশ্বের উপলব্ধি হয়।

(খ) স্বপ্নের অবস্থা (উপনিষদের ভাষায় স্বপ্ন স্থান): এখানে মনের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিষয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটে। এখানেও দ্বৈতভাব প্রকট; তবে ভোক্তা ও বিষয় উভয়েই মানসিক পদার্থ। তাই এখানে অন্তঃপ্রজ্ঞের অবস্থা বর্তমান আছে বলা হয়েছে।

(গ) সুষুপ্তি অবস্থা (উপনিষদের ভাষায় সুষুপ্ত স্থান)। এখানে পাই স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার অবস্থা। এখানে মনের সহিত কি বহির্বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয়, কি মনের কল্পিত বিষয়ের যোগ থাকে না। দ্বৈতভাব এখানে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। কারণ, যে-কোনও মুহূর্তে আবার মনের সহিত বিষয়ের সংযোগ স্থাপিত হতে পারে। মন ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকে বলে একে অপ্রজ্ঞ অবস্থা বলা হয়েছে।

২। দ্বৈতভাব মুক্ত অবস্থা। তাই হলো চতুর্থ অবস্থা। তাকে

২. সর্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ মাণ্ডূক্য ॥২

উপনিষদে বলা হয়েছে অদ্বৈত অবস্থা। এই অবস্থায় দ্বৈত-ভাববিহীন স্বরূপে স্থিত আত্মা বা ব্রহ্মকে পাই। এই অবস্থায় ব্রহ্মের উপর বিষয়গুলির যা গুণ তাও আরোপ করা যায় না, আবার জ্ঞাতৃরূপী মনের যা গুণ তাও আরোপ করা যায় না। তাইজন্য, বলা হয়েছে, এই অবস্থায় ব্রহ্ম একদিকে অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, লক্ষণহীন, চিন্তা ও শ্রবণের অগম্য এবং অপরদিকে তা বহিঃপ্রজ্ঞ নয়, অন্তঃপ্রজ্ঞ নয়, অপ্রজ্ঞ নয়। লক্ষ্য করে দেখা যেতে পারে প্রথম পর্যায়ের বিশেষণগুলি জ্ঞেয় বিষয়ের ওপর প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষণগুলি জ্ঞাতারূপী মনের ওপর প্রযোজ্য। সুতরাং এর তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে অদ্বৈত অবস্থায় ব্রহ্মের না জ্ঞাতৃরূপ প্রকট থাকে, না বিষয়রূপ বা জ্ঞেয়রূপ প্রকট থাকে। তা এক তৃতীয় সাম্যাবস্থায় থাকে। তাকে তাই শান্ত এবং শিব বলা হয়েছে।[৩]

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ সম্ভবত এই চতুর্থ অবস্থাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপর কারিকাই তার ভিত্তি। তাঁর অদ্বৈততত্ত্ব কিছু ভিন্ন। মোটামুটি উপরের ব্যাখ্যা হতে বোঝা যায় যে দ্বৈত অবস্থা এবং অদ্বৈত অবস্থা ব্রহ্মের দুই ভিন্ন অবস্থা বলে সূচিত হয়েছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য তাদের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। তিনি উভয়ের অনন্যত্ব স্বীকার করেও দ্বৈত অবস্থাকে একটি বিকৃতরূপ বা মায়া বলে বর্ণনা করেছেন। সেই কারণে তাঁর দর্শনকে মায়াবাদ বলা হয়। বর্তমান আলোচনায় শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে দুই কারণে। প্রথমত তাঁর তত্ত্বটি তিনি উপনিষদের কতকগুলি আপ্তবচনের উপর স্থাপন করেছেন। তাঁর ধারণায় উপনিষদের বাণীর উপরই তা প্রতিষ্ঠিত।

৩. মাণ্ডুক্য ॥৭

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি তরুণ বয়স হতেই মায়াবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়; কিন্তু তিনি তাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই নানাভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে উপনিষদে মায়াবাদের সমর্থন আছে কি-না। এইপ্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত-বাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে: নিরালম্বন ভ্রম ও সালম্বন ভ্রম। নিরালম্বন ভ্রম পাই যখন এমন একটি বস্তু উপলব্ধি করি যার আদৌ অস্তিত্ব নেই, যেমন আকাশকুসুম, বা স্বপ্নে দেখা বস্তু বা ঘটনা। আব সালম্বন ভ্রম পাই যখন একটি বস্তু আছে ঠিকই, কিন্তু আমরা তার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করে বসি, যেমন শুক্তি রূপা বলে ভ্রম কবি। শঙ্করাচার্য বলেন আমরা বহু দ্বারা বিখণ্ডিত যে-বিশ্বকে দেখি তা আছে ঠিকই, কিন্তু তা ব্রহ্ম হতে অভিন্ন। সুতরাং তাকে যে বহুরূপে দেখি সেটা ভ্রান্ত দর্শন। সংক্ষেপে তাঁর মতে বিশ্ব ব্রহ্ম হতে অভিন্ন, কিন্তু তার বহুরূপে প্রকাশ বিকৃত দর্শন। এখন তাঁব অদ্বৈতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

অদ্বৈতবাদে তিনটি মূল কথা পাই। প্রথম তত্ত্ব হলো ব্রহ্ম বিশুদ্ধ-ভাবে একক সত্তা, তাঁর মধ্যে বিভাগ নেই। দ্বিতীয় তত্ত্ব হলো বহুরূপে প্রকট বিশ্ব ব্রহ্ম হতে অভিন্ন, তবে তার বহুত্ব ভ্রান্ত দর্শনের ফলে ঘটেছে এবং অবিদ্যা তার মূলে। তৃতীয় তত্ত্ব হলো ব্রহ্মের প্রকৃতি হলো জ্ঞাতৃস্বরূপ, তিনি শুধু বিশুদ্ধভাবে চিন্ময় নন, তিনি নিত্য জ্ঞাতারূপী, জ্ঞেয় বস্তু না থাকলেও তাঁর জ্ঞাতৃরূপ বর্তমান থাকে। এইবার এই তিনটি তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেবার প্রস্তাব করি।

শঙ্করাচার্য বিশ্বের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রমাণ করেছেন তাদের ওপর কার্যকারণ সম্বন্ধ আরোপ করে। তিনি বলেন ব্রহ্ম একাধারে বিশ্বের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা বলে যে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর

পৃথক হয়ে থাকে। যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার তার উপাদান কারণ মৃত্তিকা হতে পৃথক। শঙ্কর বলেন বিশ্বসম্পর্কে ব্রহ্মের এ ধরনের কারণত্ব আরোপ করলে তিনি বিশ্বের একমাত্র কারণ হতে পারেন না। সুতরাং এখানে ধরতে হবে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হিসাবে এখানে কার্যকারণ সম্বন্ধের অভিন্নতা বর্তমান। এইপ্রসঙ্গে তাঁর প্রাসঙ্গিক ভাষ্যের অনুবাদ স্থাপন করা যেতে পারে।

'এই ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধযুক্ত ব্যবহারিক বিভাগ প্রকৃত বলে গৃহীত হতে পারে বিবেচনায় এই ব্যতিক্রমের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিভাগের পরমার্থতঃ কোনও অস্তিত্ব নাই; কারণ, কার্য ও কারণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। কার্য হলো আকাশাদি বহু প্রপঞ্চময় জগৎ, কারণ হলেন ব্রহ্ম; সেই কারণ হতে কার্যের পার্থক্য নাই, আছে অনন্যত্ব—এই বুঝতে হবে।'[৪]

সুতরাং বোঝা যায় শঙ্কর যে-অর্থে ব্রহ্মকে বিশ্বের কারণ বলেছেন তা সাধারণ অর্থ হতে ভিন্ন। আমরা কার্যকে কারণের রূপান্তর বা পরিণাম বলে ধরে নিই। কিন্তু শঙ্কর বলেন বিশ্ব ব্রহ্মের রূপান্তর নয়, তা ব্রহ্মই; তাদের মধ্যে সম্বন্ধ একত্বের। ব্রহ্ম নিত্যকাল তাঁর ঐকিক অসঙ্গতা নিয়ে অবস্থান করছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যে তাঁকে বহুরূপে দেখি তা দেখার ভুল। এইজন্য তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহু দ্বারা খণ্ডিত বিশ্বকে বিশ্বের পরিণাম বলেন নি, বলেছেন বিবর্ত বা বিকৃত রূপ। দুধ যখন দইয়ে পরিণত হয় তখন আমরা পাই পরিণাম, আর শুক্তিকে যখন রৌপ্য জ্ঞান করি তখন পাই বিবর্ত।

এখন এই বিবর্ত বা বিকৃতি কি করে ঘটে শঙ্কর তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে আমাদের দর্শনে দুরকম ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উল্লেখ আছে: সালম্বন ভ্রম ও নিরালম্বন ভ্রম।[৫] রজ্জুতে সাপ দেখা সালম্বন ভ্রম এবং আকাশকুসুম দেখা নিরালম্বন

৪. শারীরক ভাষ্য ॥২॥১॥১৪

৫. যথাক্রমে তারা হলো Illusion ও Hallucination.

ভ্রম। সালম্বন ভ্রমে দেখবার একটি জিনিস আছে, কিন্তু তাকে ভ্রান্তরূপে দেখি। এই শ্রেণীর ভ্রান্তিকে খ্যাতিও বলে। শঙ্কর বলেন বিশ্ব পরমার্থত ব্রহ্মই, কিন্তু তাকে ভুল করে আমরা বহুরূপে দেখি। অর্থাৎ এখানে সালম্বন ভ্রম বা খ্যাতি ঘটেছে। তিনি বলেন অবিদ্যাই তার কারণ। যেমন অস্পষ্ট আলোক রজ্জুকে সাপ বলে ভুল করতে সহায়ক অবস্থা সৃষ্টি করে। এই অবিদ্যা বিশ্বের প্রকৃতিকে খানিকটা আবৃত করে মায়া রচনা করে এবং সেই মায়ার প্রভাবে প্রকৃতপক্ষে যা দ্বৈতভাবহীন একক সত্তা তাকে আমরা বহুরূপে দেখি।

তৃতীয়ত শঙ্কর বলেন ব্রহ্মের প্রকৃতি হলো জ্ঞাতৃরূপ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা বলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পর আপেক্ষিক সত্তা। জানবার বস্তু থাকলে তবেই জ্ঞাতৃত্ব ফুটে ওঠে। কিন্তু শঙ্কর বলেন জানবাব কিছু না থাকলেও ব্রহ্ম জ্ঞাতৃরূপী; তাঁর জ্ঞাতৃরূপ নিত্য। তিনি নিত্য চিন্ময়।[৬] মহাকাশে কিরণ প্রতিফলিত করবার কিছু থাক বা নাই থাক, সূর্য যেমন কিবণ ছড়ায়, ব্রহ্মেরও সেইরূপ জানবাব বস্তু কিছু থাক বা নাই থাক, জ্ঞানশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। তিনি যে কিছু দেখেন না, তার কারণ দেখবার বস্তু কিছু নেই, কেবল একা তাঁকে নিয়েই বিশ্ব।

দুই

ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদ

এইপ্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে শঙ্করাচার্য প্রকল্পিত মায়াবাদ উপনিষদের বাণীতে সমর্থিত হয়েছে কি-না। এই প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন এসে পড়ে এই কারণে যে উপনিষদের দর্শনের প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করতে না পারলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা আদৌ সম্ভব হবে না। সুতরাং তার একটা মীমাংসা এখানে করে নিতে হয়।

প্রথমত ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যার কথা ধরা যাক। স্বরূপে

৬. নিত্য চৈতন্যোঽয়মাত্মা॥ শারীরক ভাষ্য ॥২॥৩॥১

অবস্থিত ব্রহ্মের যে-চিত্র শঙ্কর কল্পনা করেছেন সেখানে তিনি নিত্য চৈতন্য ও জ্ঞাতৃরূপী; জ্ঞেয়বস্তু নিরপেক্ষভাবে এই জ্ঞাতৃরূপ নিত্য প্রকট। মনে হয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লিখিত যাজ্ঞবল্ক্যের বচন হতে তার কিছু সমর্থন সংগ্রহ করা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে প্রাজ্ঞ আত্মা দ্বারা সংপরিষক্ত হলে মানুষের আত্মার দ্রষ্টারূপ নষ্ট হয় না; কেবল দ্বৈতভাব লুপ্ত হয় বলেই সে কিছু দেখে না।[৭] সম্ভবত এই উক্তির মধ্যেই বীজাকারে যোগদর্শনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব পাওয়া যায়। তবে সে-কথা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যাজ্ঞবল্ক্য মানুষের আত্মা সম্বন্ধেই এই মন্তব্য করেছেন। এই উপনিষদের আর এক জায়গায় যাজ্ঞবল্ক্যের আর একটি অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায় যা ব্রহ্ম সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ব্রহ্মের সদৃশ দ্রষ্টা আব নেই।[৮] মনে হয় এইসব উক্তি হতে শঙ্কর তাঁর তত্ত্বের সমর্থন পেয়েছেন।

অপরপক্ষে উপনিষদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে যাদের আমরা জড় পদার্থ বলি তারাও ব্রহ্ম হতে অভিন্ন। ব্রহ্ম জড়েও আছেন চেতন পদার্থেও আছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে 'যিনি মানুষে অবস্থিত এবং যিনি আদিত্যে অবস্থিত উভয়ে এক'।[৯] একই উপনিষদে উল্লেখ আছে যে যাকে আমরা জড় পদার্থ বলে জানি, যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম নিয়ে যে পঞ্চমহাভূত এরাও ব্রহ্ম। এই তালিকায় যেমন ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি স্থান পেয়েছেন তেমন পঞ্চমহাভূত, পৃথিবী, আকাশ, জল, নক্ষত্ররাজি স্থান পেয়েছে।[১০]

৭. যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। বৃহদারণ্যক ॥৪॥৩॥২৩

৮. নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টা ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩॥৭॥২৩

৯. স যশ্চায়ং পুরুষে ॥ যশ্চাসাবাদিত্যে ॥ স একঃ ॥ তৈত্তিরীয় ॥২॥৮

১০. এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র, এষ প্রজাপতিরেতে সর্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবীরাকাশ আপো জ্যোতীংষীতি…প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ঐতরেয় ॥৩॥৫॥৩

সুতরাং ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের মতের পূর্ণ সমর্থন উপনিষদে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। সম্ভবত এই তত্ত্ব তাঁর নিজস্ব চিন্তার ফলে গড়ে উঠেছে।

আরও বড় তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন হলো অদ্বৈতবাদের সমর্থন মূল উপনিষদগুলির বাণীতে পাওয়া যায় কি-না। শঙ্করাচার্য তাঁর মায়াবাদের সমর্থনে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি বচনের উপর নির্ভর করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে ইন্দ্র মায়ার সাহায্যে বিরাট আকার ধারণ করেছেন; তাঁর রথের অশ্বের সংখ্যা দশ শত।[১১] শঙ্করাচার্য এই বচনটির রূপক ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রের স্থলে ব্রহ্মকে ধরে নিয়েছেন এবং অর্থ করেছেন ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে বিস্তার লাভ করে বহু ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবের রূপে প্রতিভাত হন। এরূপ ব্যাখ্যার পশ্চাতে যে-সবল যুক্তি আছে তা বলা যায় না। কারণ এই বচনটি ঋগবেদের একটি সূক্ত হতে উদ্ধৃত।[১২] সেখানে নিশ্চিত তা অভিধা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ ইন্দ্র সেখানে নানা বৈদিক দেবতার অন্যতম। তবে সত্যই উপনিষদে এমন কিছু বচন পাওয়া যায় যা পরোক্ষভাবে মায়াবাদের সমর্থন করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের প্রকাশকে সম্ভব করতে দুটি ভিন্নধর্মী সত্তার সংযোগ প্রয়োজন। একটি জানবার বা উপভোগ করবার ক্ষমতা রাখবে, অন্যটি জ্ঞাত হবার বা ভোগ্য হবার ক্ষমতা রাখবে। এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ও ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন বস্তুর বিচিত্র সমাবেশ হিসাবে বিশ্ব মানুষের মনের নিকট প্রকট হয়। একে বলা হয় দ্বৈতভাব। এই দ্বৈতভাব না থাকলে বিশ্বের প্রকাশ নেই। তা লুপ্ত হলে সবকিছু বৈচিত্র্যহীন অখণ্ড একাকারে পরিণত হয়।

১১. ইন্দ্রো মায়োভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতদশেতি। বৃহদারণ্যক ॥২॥৫॥১৯

১২. ঋগ্‌বেদ ॥৬॥৪৭

ছান্দোগ্য উপনিষদ এই কথাটি বোঝাতে দুটি কথার ব্যবহার করেছে: 'অল্প' অর্থাৎ দ্বৈতভাব মণ্ডিত খণ্ডিত বিশ্ব এবং 'ভূমা' অর্থাৎ দ্বৈতভাববিহীন অখণ্ড বিশ্ব। তার মধ্যে কোনও বিভাগ বা ছেদ নেই বলে তা ভূমা। আরও বলা হয়েছে যেখানে এক অপরকে দেখে, এক অপরকে শোনে, এক অপরকে জানে, তাই হলো অল্প। আর যেখানে এক অপরকে দেখে না, এক অপরকে শোনে না, এক অপরকে জানে না, তাই হলো ভূমা।[১৩] এখানে যা অল্প তা যে ব্রহ্মের বিকৃত রূপ তা ইঙ্গিত করা হয় নি।

অপর পক্ষে বৃহদারণ্যক উপনিষদের দুই স্থানে যাজ্ঞবল্ক্য কথিত একটি বচন পাই; তা যেন ইঙ্গিত করে যে বিশ্ব যেখানে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় রূপে খণ্ডিত, সেখানে ব্রহ্মকে নিজস্বরূপে পাই না। বচনটির বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মূল আকারে তাকে উদ্‌ধৃত না করে উপায় নেই। কথাটি এই: "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরমভি বদতি' ইত্যাদি।[১৪] এখানে 'দ্বৈতমিব কথাটির ব্যবহার খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যাজ্ঞবল্ক্য যেন বলতে চেয়েছেন যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ও ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধে বিশ্ব যে বহুরূপে প্রকট হয়, তা ব্রহ্মের বিকৃত রূপ এবং দ্বৈতবোধের ভাব যেখানে লোপ পায় সেখানে তাঁর অদ্বৈত বিজ্ঞাতৃ রূপটি ফুটে ওঠে এবং তাই তাঁর প্রকৃতরূপ।

সুতরাং 'ইব' কথাটির প্রয়োগ হেতু এই তাৎপর্য দাঁড়ায় যে দ্বৈতভাবমণ্ডিত রূপ একটি ভ্রান্ত উপলব্ধির মত এবং অদ্বৈতরূপই ব্রহ্মের নিজস্ব প্রকৃতি সূচিত করে। এই অদ্বৈত অবস্থার একটি বর্ণনা আমরা উপনিষদে পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে সেই অবস্থায় তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় অনাস্বাদেয়, নিত্য এবং অগন্ধ।[১৫]

১৩. যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি তদল্পম্ ॥

ছান্দোগ্য ॥৭॥২৩॥১

১৪. বৃহদারণ্যক ॥২॥৪॥১৪ ও ৪॥৫॥১৫

১৫. অশব্দম স্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥ কঠ ॥ ১॥৩॥১৫

এই বাণী দুটির মধ্যে মায়াবাদের পরোক্ষ সমর্থন আছে মনে হয়। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে প্রাচীন উপনিষদগুলির বচনে মায়াবাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন নেই। এমনকি বৃহদারণ্যক উপনিষদেই এমন বচন আছে যা ব্রহ্মের খণ্ডিতরূপ এবং অখণ্ড অদ্বৈতরূপকে সমান মর্যাদা দিয়ে স্বীকার করে নেয়। সেখানে বলা হয়েছে ব্রহ্মের দুটি রূপ। মূর্ত এবং অমূর্ত, মর্ত্য এবং অমৃত, স্থির এবং গতিশীল, প্রকট এবং স্থানাতীত।[১৬]

প্রাচীন উপনিষদগুলিকে সমগ্রভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে উপনিষদের মূল ভাবধারা বলে যে বিশ্বসত্তার স্বাভাবিক গতিই হলো বিশুদ্ধ একক অবস্থা হতে সরে এসে বহু ও বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করা; কারণ তিনি নিজেকে বিভাগ করে, নিজের উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে আনন্দ পান। বিশ্বের মধ্যে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ না করলে তাঁর শিল্প রচনা সার্থক হয় না, তাঁর আনন্দের মহাকাব্য রচিত হয় না। তার জন্যই তো তিনি বিশ্বরূপ হয়ে, আনন্দরূপ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। তার অর্থ এই নয় যে তিনি বহু ও বিশ্লিষ্ট সত্তার গাণিতিক সমষ্টিতে পরিণত হন। সকলকে জড়িয়ে নিয়ে তাঁর অখণ্ড রূপ তখনও অক্ষুণ্ণ থাকে, যেমন নাটকের বহু চরিত্র ও ঘটনাকে জড়িয়ে নিয়ে তার অখণ্ডতা বিরাজমান। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে তা বোঝা যায়। সেই অখণ্ডতাবোধ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানে ধরা পড়ে না; মন দিয়ে, ধীশক্তি দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হয়। উপনিষদে সেই কথাই বলে।[১৭]

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে উপনিষদের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বচন এখানে উদ্ধৃত করবার প্রস্তাব করি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে মূল সত্তা (যাকে কোথাও সৎ, কোথাও আত্মা, কোথাও

১৬. দ্বেবাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ চচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ বৃহদারণ্যক ॥২॥৩॥১

১৭. মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিংচন ॥ কঠ ॥২॥১॥১১

ব্রহ্ম বলা হয়েছে) আগে একাই ছিলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করে অন্য কাউকে দেখতে পেলেন না। সেই জন্য তিনি আনন্দ পেলেন না। সেই কারণেই একাকী অবস্থায় কেউ আনন্দ পায় না। তখন তিনি দ্বিতীয়কে ইচ্ছা করলেন।[১৮] বলা বাহুল্য বিশ্বশক্তির ইচ্ছা হতে ক্রিয়া। তাঁর ইচ্ছাই তাকে পূরণ করবার শক্তি ধারণ করে। সুতরাং এই ইচ্ছা-প্রণোদিত হয়েই বিশ্বে দ্বৈতরূপের আবির্ভাব।

ঐতরেয় উপনিষদে আছে পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন। অন্য কেউ ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলেন বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করব।[১৯]

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই। সেখানে বলা হয়েছে পূর্বে এক এবং অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলেন আমি বহু হব, জন্মগ্রহণ করব। তখন তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন।[২০] সেই তেজ হতেই এই বহু দ্বারা বিখণ্ডিত বৈচিত্র্যময় বিশ্বের উৎপত্তি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দ্বৈতভাবের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা পাই তা এদেরই অনুরূপ তবে আরও বিস্তারিত। তা বলে: ব্রহ্ম ইচ্ছা করলেন আমি বহু হব, আমি জন্মগ্রহণ করব। তিনি তপস্যা করলেন এবং তপস্যা করে এই সবকিছু সৃষ্টি করলেন। তাদের সৃষ্টি করে তিনি তাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করে সত্তাবান ও সত্তাহীন রূপ ধারণ করলেন, বিশেষ বস্তু হলেন ও নির্বিশেষ হলেন,

১৮. আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ ॥
বৃহদারণ্যক ॥১॥৪॥১
স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ॥
বৃহদারণ্যক ॥১॥৪॥৩

১৯. আত্মা বেদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিংচন মিষৎ স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি ॥ ঐতরেয় ॥২॥১

২০. সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেক মেবাদ্বিতীয়ং···
তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজো হসৃজত। ছান্দোগ্য ॥৬॥২॥৩

আশ্রিত ও অনাশ্রিত হলেন, চেতন ও অচেতন হলেন।[২১] অর্থাৎ তিনি দ্বৈতমণ্ডিত রূপে প্রকট হলেন। সে রূপে তিনি চেতনও বটে অচেতনও বটে।

সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত হবে যে উপনিষদের মূল ভাবধারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে শুধু ব্রহ্মের অঙ্গীভূত বলে নি, অতিরিক্তভাবে এ কথাও বলেছে যে একক অবস্থায় তৃপ্তি না পেয়ে ব্রহ্ম নিজের উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে বহু হলেন। সেই ভাবধারা মায়াবাদকে স্বীকার করে নি, তা বিশ্বরূপে প্রকাশকে ব্রহ্মের প্রকাশ রূপেই বর্ণনা করেছে। মায়াবাদ ভারতীয় দর্শনে পরে এসেছে। গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্যই তার প্রবর্তক। অবশ্য মায়াবাদের পরোক্ষ সমর্থন উপনিষদের কিছু বচনে মিলবে, বিশেষ করে যাজ্ঞবল্ক্যের মন্তব্যে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের দেশের মধ্যযুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক শ্রীচৈতন্য এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে তার দু-জায়গায় উল্লেখ আছে; একবার সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত আলোচনায়, অন্যবার প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত আলোচনায়। আমাদের দেশে মধ্যযুগে শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের দারুণ প্রতিপত্তি ছিল, অথচ শ্রীচৈতন্য ছিলেন ভক্তিবাদী। সেই কারণেই তিনি তাঁদের সহিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। সার্বভৌমের কাছে তিনি যা মন্তব্য করেছিলেন তা এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে:

পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বর জগদ্ রূপে পরিণত।

২১. সোঽকাময়ত ॥ বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ স তপোঽতপ্যত ॥ স তপস্তপ্ত্বা ॥ ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিং চ ॥ স তৎ সৃষ্ট্বা ॥ তদেবানু-প্রাবিশৎ ॥ তদনুপ্রবিশ্য ॥ সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ ॥ নিরুক্তংচানিরুক্তং চ ॥ নিলয়নং চানিলয়নং চ ॥ বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। তৈত্তিরীয় ॥২।৬

মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্ রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥[২২]

বলা বাহুল্য বাদরায়ণ বা ব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্রকেই এখানে ব্যাসসূত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং শ্রীচৈতন্যের ধারণায় উপনিষদের বাণীতে যে তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে তা পরিণামবাদী, বিবর্তবাদী নয়; অর্থাৎ তা বলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব ব্রহ্মের বিকৃতরূপ নয়, স্বাভাবিক পরিণতি। তবে তাঁর ধারণায় ও উপনিষদে শঙ্করাচার্য প্রচারিত অদ্বৈতবাদের সমর্থক বচন যে নাই, তা নয়; তা আছে কিন্তু গৌণ তত্ত্ব আকারে। মুখ্যতত্ত্ব বলে ব্রহ্মই সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং তা বিকৃত রূপ নয়, স্বাভাবিক পরিণতি। এই কথাটিও শ্রীচৈতন্য দ্ব্যর্থহীনভাবেই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত তাঁর যে আলোচনার কথা বর্ণিত হয়েছে তা হতে প্রাসঙ্গিক উক্তিটি উদ্ধার করা যেতে পারে:

উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্য বৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥
গৌণ বৃত্ত্যে যে বা ভাষ্য করিলা আচার্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হায় সব কার্য॥[২৩]

বলা বাহুল্য আচার্য অর্থে এখানে শঙ্করাচার্য।

তিন

রবীন্দ্রদর্শনে মায়াবাদের প্রতিবাদ

এইবার এই চিন্তাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গে তুলনামূলক

২২. চৈতন্যচরিতামৃত ॥ মধ্যকাণ্ড ॥৬॥১০—৭২
২৩. চৈতন্য চরিতামৃত ॥ আদিকাণ্ড ॥৭॥১০৮—১০৯

আলোচনার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি। সেই আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে আমাদের দুটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। প্রথমত শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ উপনিষদের মূল ভাবধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে না। দ্বিতীয়ত, মূল ভাবধারা বলে বিশ্বশক্তি বা ব্রহ্মের স্বাভাবিক আকূতিই হলো আপনার উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে মণ্ডিত এই বিচিত্র বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করা। তা না হলে যে তাঁর আনন্দ নাই। আমরা এই দুই বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। প্রথমে মায়াবাদের কথা ধরা যাক।

আশ্চর্য লাগে দেখতে যে নিজস্ব মতিগতির পথে রবীন্দ্রনাথের মনে মায়াবাদবিরোধী মনোভাব অতি তরুণ বয়সেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। তখন মায়াবাদের সহিত তাঁর ভালরূপ পরিচয়ও হয় নি। সেই মনোভাব প্রকাশ পায় তাঁর রচিত 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'চিরদিন' শীর্ষক কবিতায়। এ গ্রন্থটির প্রকাশনের তারিখ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ (কার্তিক ১২৯৩)। তখন তাঁর বয়স বছর পঁচিশ। খুব সম্ভব এই কবিতাটিই হলো দার্শনিকভাবে অনুপ্রাণিত তাঁর প্রথম কবিতা।

কবিতাটি 'চিরদিন' অর্থাৎ শাশ্বত উদাসীন কালের উদ্দেশে রচিত। বিশ্বে কত কি ঘটে, কত মানুষ আসে, হাসে, কাঁদে চলে যায়, কিন্তু 'অনন্ত আঁধার মাঝে দোসর হীন' কাল উদাস হয়ে চেয়ে থাকে। কবির মনে প্রশ্ন ওঠে তা হলে কি এই প্রবহমান প্রাণের স্রোতকে অবলম্বন করে এত হাসি কান্না ফুটে ওঠে তা কি ছায়া, তা কি স্বপ্নের মতো মায়া। নিজের অন্তরের উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি সম্ভাবনার ইঙ্গিত গ্রহণ করে তার প্রতিবাদ করেছেন।

মহাকালের উদাসীন আচরণ হতে যে প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে তা তিনি প্রকাশ করেছেন এই ভাবে :

'তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে, থাকে আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই ?

তিনি এই সম্ভাবনাকে সত্য বলে স্বীকার করতে চান নি। তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই ভাবে:

'ব'লো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন,
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন?
সে কি এই প্রাণহীন, প্রেমহীন, অন্ধ অন্ধকার?'

তাঁর ধারণায় তা স্বপ্ন নয়; এর মধ্যে একটি প্রেমের লীলা চলছে যা চিরন্তন। তা না হলে কেন—

'যত দেয় তত পায় কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।'

তাই তাঁর ধারণ, এই বিশ্বের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু আন্দোলিত প্রাণের ধারায় এক প্রীতির আদান-প্রদান চলছে। দ্বৈতভাব মণ্ডিত বিশ্ব স্বপ্ন নয়, ছায়া নয়, মায়া নয়। প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এই—

অসীম জগতে একি পিরিতির আদান-প্রদান।
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।

সংসারের মধ্যেই যে দেবতা আছেন, সংসার যে মায়া নয়, সংসাব ত্যাগ করলে দেবতাকেই ত্যাগ করা হয়--এই সকল কথা বোঝাতে অনবদ্য ভঙ্গিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ক্ষুদ্র চতুর্দশপদী কবিতা, কিন্তু তারই অপ্রশস্ত বক্ষে নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর বক্তব্য এখানে সুন্দর ফুটে উটেছে।

সংসার মায়াময়, প্রেয়সী, শিশু-সন্তান, এরা সব মায়ার ছলনা, এই বোধ নিয়ে মুক্তিকামী মানুষ সংসার ত্যাগ করতে উদ্যত। ওদিকে শয্যায় শিশুকে বুকে নিয়ে প্রেয়সী নিদ্রিত আছেন। সংসার-বিরাগী মানুষটি তাদের উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করছেন: তারা কি মায়ার ছলনা? দেবতা উত্তর দিয়েছেন, তা নয়. তাদের মধ্যেই তিনি বর্তমান থেকে তাকে সংসারে আকৃষ্ট করেছেন। কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই:

সুপ্তিময় শিশুটিকে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, 'কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা ?'
দেবতা কহিলা, 'আমি'।—কেহ শুনিল না।[২৪]

সংসারকে যে মায়াজ্ঞান করেছে তার কাছে যে এমন উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না, তা বোঝাই যায়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের প্রতি মমতার আকর্ষণ একটা বড় আকর্ষণ। তাও সোচ্চার হলো কিন্তু ফল হলো না। শিশু স্বপ্নে কেঁপে উঠে পিতার স্নেহ আকর্ষণ করল, কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারল না। তখন দেবতা আর কি করেন ? খেদোক্তি করা ছাড়া আর কিছু করবার তাঁর উপায় রইল না :

স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি—
দেবতা কহিলা, 'ফির'। শুনিল না বাণী।
দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন 'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিলা কোথায় ?'

কিন্তু সব থেকে প্রবল প্রতিবাদ পাই 'সোনার তরী'র অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায়। তার নাম 'মায়াবাদ'। তা হতেই বোঝা যায় মায়াবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করাই এই কবিতার উদ্দেশ্য। প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে যুক্তি দিয়ে নয় আক্ষেপ দিয়ে। রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ-শব্দে বিচিত্রিত হাসি-কান্না, জন্ম-মরণের তরঙ্গে আন্দোলিত, প্রীতি-ভালবাসায় উদ্বেলিত এই পার্থিব জীবন এমন প্রত্যক্ষ, এমন নিশ্চয় প্রতীতির বিষয় যে তাকে কি করে মায়াবাদী দার্শনিক 'ছেলেখেলা' বা 'প্রবঞ্চনা' মনে করতে পারেন, তা দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়েছেন। তাই এই আক্ষেপ।

তাকে প্রবঞ্চনা প্রমাণ করতে যে সূক্ষ্ম যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়েছে তাতে তিনি আঘাত পেয়েছেন। আঘাত পাওয়ার কারণ এই। এদের ধারণা, বিশ্ব যেন মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই অতি

২৪. চৈতালি, বৈরাগ্য

কৌশলে রচিত হয়েছে। কিন্তু তা যে প্রপঞ্চ বা মায়া তা এঁদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাছে ধরা পড়ে গেছে। ঈশ্বর প্রবঞ্চনা করতে পারেন, এমন কথা তাঁরা ভাবতে পারেন, এই দেখেই তিনি মর্মাহত হয়েছেন। তাই ক্ষোভ করে কবি বলেছেন :

হারে নিরানন্দ দেশ পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে—
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে!

অন্য কারণ হলো এই যে মায়াবাদী দার্শনিক বিশ্ব জুড়ে যে সৃষ্টির অনবচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত, যাকে যুগ যুগ ধরে সকল জীব একান্ত সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাকে মায়া বা স্বপ্নের মতো অলীক বস্তু বলে কল্পনা করেছেন। একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন এই খেদোক্তির মধ্যে রয়ে গিয়েছে এই যে তাঁরাই একমাত্র প্রজ্ঞার অধিকারী, আর যাঁরা বিশ্বকে সত্য বলে স্বীকার করে নেন তাঁরা কি বুদ্ধিশক্তি হতে একেবারেই বঞ্চিত? প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

যুগযুগান্তর ধরে পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি ;
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস।
লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা ;
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলে খেলা।

এই তো গেল মায়াবাদের প্রতিবাদ। প্রশ্ন ওঠে তা কেন উচ্চারিত হলো। তার উত্তর হলো রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব যে দার্শনিক চিন্তা, তা বিশ্বকে প্রপঞ্চ বলে প্রত্যাখ্যান করে নি ; তাকে তিনি এক আনন্দ-অভিসারী বিশ্বশক্তির স্বাভাবিক প্রকাশ বলেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই প্রত্যয় তাঁকে মায়াবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যোগী করেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও দার্শনিক আলোচনায়

মিলবে।' আমাদের উপরের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

চুম্বকে তাঁর ধারণাটি সুন্দরভাবে 'স্মরণ'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি চতুর্দশপদী কবিতায় পাওয়া যায়। যে শক্তি বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আনন্দ অভিলাষী হয়ে, বিশ্বের উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে, বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন! এই দ্বৈতবোধের ভিত্তিতেই ভোক্তা ও ভোগের মধ্যে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়, তা হতেই বিশ্ব বর্ণ, গন্ধ, গীতে বিচিত্র হয়ে ওঠে, প্রণয়ী যুগলের মধ্যে প্রীতি প্রবাহিত হয়, ধরণীর বক্ষে লতায়, ফুলে, নদীর লহরীতে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা উপনিষদের মূল চিন্তাধারার এত কাছে এসে গেছে যে মনে হয় যেন উপনিষদের বাণীই তাঁর ভাষায় নূতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবিতাটির কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে :

যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য আভাসে।[২৫]

বিশ্বের মধ্যেই যে বিশ্বসত্তার প্রকাশ এবং বিশ্বকে বা সংসারকে ত্যাগ করে মুক্তিলাভ হয় না, এ প্রতীতি তাঁর তরুণ বয়সেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর প্রথম বয়সে রচিত 'প্রকৃতির পরিশোধ' নামক নাটকের ভঙ্গিতে রচিত কবিতায় প্রথম তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

'আমি বালক বয়সে 'প্রকৃতির পরিশোধ' লিখিয়াছিলাম—তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলাম কিনা জানি না—কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে গ্রহণ

২৫. স্মরণ, ২২

করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি।'[২৬]

এই দৃষ্টিভঙ্গির পুনরুল্লেখ তাঁর যৌবনে রচিত 'কড়ি ও কোমল'-এর অন্তর্ভুক্ত কবিতায়ও যে পাই তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরিণত বয়সে যে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল তা তাঁর 'নৈবেদ্যে'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করেই তিনি লিখেছিলেন :

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বার বার
তোমার অমৃত ঢালি দিব অবিরত
নানা-বর্ণ-গন্ধময়।[২৭]

সংসারকে ভোগ করবার জন্য তিনি বৈরাগ্যের প্রতি বিমুখ হন নি ; এই সংসারেই ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করবেন, এই ধারণা ছিল বলেই তিনি সন্ন্যাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দ্বৈতভাব মণ্ডিত বিশ্বে বহু ও বিচিত্ররূপের প্রকাশের মধ্যেই তাঁর অপ্রত্যক্ষ প্রকাশ। সুতরাং সেই অরূপকে এই বিশ্বরূপের মধ্যেই পাওয়া যাবে এই ছিল তাঁর ধারণা। এ বিষয় তাঁর নিজের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

'পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা—ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি।'[২৮]

আমরা ইতিপূর্বে উপনিষদের দ্বৈততত্ত্ব আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে উপনিষদের মূল ভাবধারা দ্বৈতভাব মণ্ডিত বহুরূপে প্রকাশ বিশ্বকে স্বপ্ন বা মায়া বা ছায়া বলে প্রত্যাখ্যান করে নি ; বরং তাকে বিশ্বসত্তার প্রকাশ বলেই গ্রহণ করেছে। তাই বিশ্বকে

২৬. আত্মপরিচয়, ১ ২৭. নৈবেদ্য, ৩০ ২৮. আত্মপরিচয়, ১

সেখানে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'[২৯] বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি এই চিন্তাটি রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন এবং সেই কারণেই তিনি মায়াবাদের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

চার

বিশ্বরচনায় মানব মনের ভূমিকা

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি মায়াবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি ছিল। আমরা দেখেছি তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে এবং মতিগতির সঙ্গে তা সামঞ্জস্য রক্ষা করত না এবং সেই কারণে তিনি মায়াবাদকে প্রত্যাখান করে এ বিষয় শ্রীচৈতন্যেব অনুগামী হয়েছিলেন। আমরা অতিরিক্তভাবে এই সিদ্ধান্ত করেছি যে প্রাচীন উপনিষদগুলির মূল ভাবধারার সঙ্গে মায়াবাদ সঙ্গতি রক্ষা করে না; তারা বলে বিশ্বসত্তা রস-আস্বাদনের জন্য নিজেব উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে বহুদ্বারা বিখণ্ডিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এখন আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটি নিজের স্বাধীন চিন্তা ও উপলব্ধিব পথে সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তায় দুটি অবস্থা পাই। প্রথম অবস্থায় দ্বৈতভাবহীন একত্ব একান্তই নীরস এবং অর্থহীন বলে তাঁর মনে হয়েছে। সেই জন্যই তাঁর আরও মনে হয়েছে সেই শুষ্ক, নীরস একত্বকে খণ্ডন করে তার ওপর বিশ্বশক্তি দ্বৈতভাব আরোপ করলেন রসের উপলব্ধিব জন্য। একক অবস্থায় যে প্রকাশ তা বাণীহীন এবং একান্তই নীরব। তার জন্যই চেতনায় উদ্দীপিত মন এল এবং দুয়ের জানাজানির সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে বিশ্বে রসের প্রকাশ প্রবাহিত হলো। এখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা একান্তভাবে উপনিষদের চিন্তার অনুরূপ।

দ্বিতীয় অবস্থায় দেখি রবীন্দ্রনাথ আর একটি নূতন কথা বলেছেন

২৯. মণ্ডুক ॥২॥২॥৭

যার উল্লেখ উপনিষদের বচনে পাই না। তিনি লক্ষ্য করেছেন বিশ্বজোড়া যে রসের ধারা প্রবাহিত, যা রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে বিচিত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তা অপ্রকট থেকে যেত যদি না মানুষের মন সৃষ্টি হতো। তাঁর চিন্তাটি পরিস্ফুট করবার জন্য তিনি দুটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। প্রথমত বলেছেন অভিনয়ের সঙ্গে শ্রোতার যে সম্পর্ক, বিশ্বের প্রকাশের সঙ্গে মানুষের সেই সম্পর্ক। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলেছে অথচ শ্রোতা না থাকলে তা যেমন অর্থহীন হতো, তেমন মানুষের মন না থাকলে বিশ্বের বিচিত্র প্রকাশ অর্থহীন হয়ে পড়ত। অনুরূপভাবে বিশ্বের প্রকাশের সহিত মানুষের মনের যে সম্পর্ক তার তুলনা করেছেন পটের সঙ্গে শিল্পীর আঁকা চিত্রের যে সম্পর্ক তার সহিত। চিত্র তো শূন্যে আঁকা যায় না, তার জন্য পট চাই। তেমন বিশ্বের রূপ প্রকট হয় না যদি না তাকে গ্রহণ করবার উপযুক্ত মন থাকত। সুতরাং বিশ্বের প্রকাশের জন্য মানুষের মনের একান্তই প্রয়োজন।

দ্বৈতভাবে প্রকট বিশ্বের রচনায় এইভাবে মানুষের মনের একটি মূল ভূমিকা এসে পড়ে। এ বিষয়ে সচেতন হয়ে তিনি মানুষ হিসাবে বিশেষ গর্ববোধ করেছিলেন এবং মানুষের হয়ে অহঙ্কারও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি হয়ত সেই কারণে চেতনবাদী[৩০] দার্শনিকের মতো এতখানি এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না যে সেই কারণে দাবী করবেন যে মানুষের মনই বিশ্বকে সৃষ্টি করে। তিনি বস্তুর বাস্তবতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন বলেই মনে হয়। অর্থাৎ তিনি মন-নিরপেক্ষভাবে বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন; তবে তাঁর ধারণা মানুষের মন না থাকলে বস্তু অপ্রকট থেকে যেত। মনের এই বিশেষ ভূমিকার জন্যই তাঁর মানুষের হয়ে অহঙ্কার। মানুষের মন না থাকলে বিশ্বে যে শিল্প রচিত হয়েছে তা অর্থহীন হয়ে পড়ত, দেবতার কাব্যের রসগ্রহণ করতে কেউ থাকত না। এই জন্যই তাঁর

৩০. Idealist.

গর্ববোধ। এই অহঙ্কারবোধের প্রকাশ তাঁর একাধিক কবিতায় বেশ দৃপ্তভঙ্গিতে পরিস্ফুট। উপনিষদে এ বিষয় কোনও উল্লেখ নাই। এ তাঁর একান্তই নিজস্ব চিন্তা।

দুই স্তরে দ্বৈতভাব সম্পর্কে তাঁর যে চিন্তার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থনে এবার আমরা তাঁর রচনা হতে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্‌ধৃত করে স্থাপন করবার প্রস্তাব করি। প্রথমে আমরা দ্বৈতভাব আরোপের কথা দিয়ে শুরু করতে পারি।

'মহুয়া'র একটি কবিতা আরম্ভ হয়েছে একটি বচন দিয়ে যাকে উদ্‌ধৃত করে আমাদের এই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে :

একার ভিতরে একের দেখা না পাই,
দুজনার যোগে পরম একের ঠাঁই।[৩১]

দুটি পরস্পর বিরোধীভাব দিয়ে এখানে নিপুণভাবে অল্প কথায় দ্বৈততত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিহীন অসঙ্গ একার একত্বের মধ্যে সামগ্রিক একত্ব উপলব্ধি হয় না। তা সম্ভব করতে প্রয়োজন তার ওপর দ্বৈতভাবের আরোপের। তা প্রথমে দুই হবে তবেই জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্পর্কে তাদের ভেদ সত্ত্বেও তাদের অখণ্ডতা উপলব্ধি হবে।

এই কথাই অন্যভাবে বলা হয়েছে 'বীথিকা'র অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায়। কেউ কাউকে শোনাবে তবে তো বলবে। জানাবার লোক না থাকলে বলবার কথাও ওঠে না। কাজেই মানুষের জানবার মন এল তবেই তাকে অবলম্বন করে বাণী এল। সেই বাণীই তো আমাদের বীণাপাণি বাগ্‌দেবী। তাই কবি বলছেন :

অস্তিত্বের গহন তত্ত্ব ছিল মূক বাণীহীন—
অবশেষে একদিন
যুগান্তের প্রদোষ আঁধারে
শূন্য পাথারে
মানবাত্মার প্রকাশ উঠিল ফুটি।[৩২]

৩১. মহুয়া, পরিণয় ৩২. বীথিকা, সংযোজন, বাণী

মানুষের মনের চেতনারূপী পদ্মই বাগ্‌দেবীর অধিষ্ঠান। তাই কবি আরও বলছেন :

চিৎপদ্মের আবরণ গেল টুটি।
শতদলে দিল দেখা
অসীমের পানে মেলিয়ে নয়ন
দাঁড়ায়ে রয়েছে একা
প্রথম পরম বাণী
বীণা হাতে বীণাপাণি।

সুতরাং আকাশভরা সূর্য তারা শুধু নয় বিশ্বভরা প্রাণও চাই। তবেই বিশ্বনাট্যের পরিপূর্ণ এবং সার্থক রূপটি পরিস্ফুট হবে। কাজেই বিশাল বিশ্বের একপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র গ্রহের আশ্রয়ে ক্ষণকাল স্থায়ী যে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়েছে তার ভূমিকা নগণ্য নয়, ক্ষুদ্র নয়, মহৎ। এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে 'প্রান্তিকে'র একটি ক্ষুদ্র কবিতায়। কবিতা হলেও তা যে ভাবটিকে ধারণ করে তাকে দিয়ে একটি দর্শন গড়ে তোলা যায়।

আমাদের দার্শনিক কবি বলেছেন কোটি কোটি বৎসর ধরে লক্ষ লক্ষ তারা আবর্তিত হয়েছে। তাদের কাছে আমাদের পৃথিবী একটি মাটির বুদবুদের মতো। তাকে অবলম্বন করে প্রাণের আবির্ভাব ঘটল, তবেই তো এই বিরাট বিশ্বের অসীমতা প্রকট হয়ে উঠল :

তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।[৩৩]

সেই প্রাণের আবির্ভাব যদি না ঘটত, তা হলে তো বিশ্বরূপ মহামন্দিরে শঙ্খধ্বনি উঠত না, আলোকের বাণী অশ্রুতই থেকে যেত :

৩৩. পরিশেষ, প্রাণ

সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।

এতক্ষণ দেখেছি রবীন্দ্রনাথ দ্বৈতভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন; মানুষের মন না এলে বিশ্বনাট্য অনাবিষ্কৃত রয়ে যেত সে কথা বলেছেন; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে যে পদ্ম প্রস্ফুটিত হলো তাতে আবির্ভাব হলো বাগ্‌দেবীর বাণী সে কথা বলেছেন। এরপর দেখি তাঁর রচনার মধ্যে একটি নূতন সুর সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এখন তিনি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে নিজের মনের ভূমিকার মূল্য উপলব্ধি করে গর্ববোধ করতে শুরু করেছেন। মানুষের মন তো তুচ্ছ জিনিস নয়, তার আবির্ভাব হলো বলেই তো আকাশভরা তারার বিস্ময় উৎপাদনের ক্ষমতা, ফুলের রঙের বাহারের মাধুর্য, এক কথায় সমগ্র সৃষ্টির হৃদয়-হরণ রূপ প্রকট হয়ে উঠল। এই অবস্থায় এই ধরনের ভাবনা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কাব্যাংশ এই প্রসঙ্গে আমাদের মন্তব্যের সমর্থনে এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

কোটি কোটি সূর্য-তারা হতে যে শতলক্ষ ধারায় আলো ঝরে পড়ছে, তা সার্থক হবে তখন, যখন তা কবির চেতনায় প্রতিফলিত হয়ে তাঁকে মুগ্ধ করবে। পুষ্পের বিচিত্র বর্ণাঢ্য রূপ অস্পষ্টই থেকে যায় যদি না তা কবির অনুভূতিতে ধরা পড়ে। এই প্রসঙ্গে নীচের কাব্যাংশটি লক্ষ্য করা যেতে পারে:

এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায়
ঝরে পড়ে শতলক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে॥
তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মতো লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল গো।[৩৪]

৩৪. গীতবিতান, পূজা, ৭৩

একই চিন্তা একটু ভিন্ন আকারে প্রকাশ নিয়েছে আর একটি কবিতায়। ওপরে বলা হয়েছে মানুষের মন আছে বলেই বিশ্বের বিচিত্ররূপে প্রকাশ সার্থক হয়ে উঠেছে। এখানে বলা হয়েছে বিশ্ব দ্বৈতভাবমণ্ডিত হয়ে বিখণ্ডিত হয়েছিল; কিন্তু কবির মনের মধ্যে তাঁর চেতনায় ঐক্যমণ্ডিত হয়ে তার অখণ্ডরূপ ফিরে পেয়েছে। কাজেই বলা যায় বিশ্ব তার অখণ্ডরূপ ফিরে পেয়েছে কবির চেতনার মধ্যে। প্রাসঙ্গিক কাব্যাংশটি এই:

ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল
আমার চেতনায়!
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা।[৩৫]

এই চিন্তার পেছনে একটি দর্শন আছে। তা বলে, সৃষ্টি-পূব অবস্থায় যে দ্বৈতহীন একক সত্তা ছিল তা সৃষ্টির মধ্যে নিজের উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে বহু হলো। তার পর মানুষের মনে তার উপলব্ধির ভিতর দিয়ে, খণ্ডরূপের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়ে মূলসত্তা আবার অখণ্ডরূপ ফিরে পেল। এই জন্যই মানুষের মনের সম্পর্কে কবির এই সার্থকতাবোধ।

এই চিন্তার সঙ্গে যেন হেগেল-এর দর্শনের মূল তত্ত্বটির তুলনা চলে। অবশ্য মৌলিক পার্থক্য আছে। হেগেল-এর চিন্তার স্বরূপে অবস্থিত মূল সত্তা সকল সম্ভাব্য জ্ঞানের ধারক স্বরূপ। তাকেই তিনি 'এবসলিউট আইডিয়া'[৩৬] বলেছেন। সেখানে তা অমূর্ত। প্রকৃতির মধ্যে মূর্তরূপ ধারণ করে তা আবির্ভাব হলো বহু দ্বারা বিখণ্ডিত বিশ্বরূপে। আবার মানুষের মনের চিন্তায় তা অখণ্ডজ্ঞানরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো।

৩৫. পত্রপুট, ৭
৩৬. Absolute Idea.

একে তিনি 'এবসলিউট স্পিরিট'[৩৭] বলেছেন। যা ছিল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত একক সত্তা তা মানুষের মনের ভিতর দিয়ে আবার একক সত্তারূপে প্রতিভাত হলো। তাঁর ভাষায় যা ছিল **Absolute-in-itself** তা **Abs**ɔ**lute-for-itself**-এ পরিণত হলো।

এখন উভয় চিন্তাব মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। দ্বৈতপূর্ব অবস্থার একত্ব খণ্ডিত হলো দ্বৈতভাবমণ্ডিত বিশ্বে। আবার মানুষেব মনের চিন্তায় তার ঐক্যসূত্র আবিষ্কৃত হয়ে তার অখণ্ড রূপের উপলব্ধি এল। মোটামুটি উভয়েই এক কথা বলতে চেয়েছেন। তবে তাঁদেব মধ্যে পার্থক্য সুদূরপ্রসারী। হেগেল-এর ধারণায় কি প্রাক্‌সৃষ্টি একক সত্তা, কি প্রকৃতির মধ্যে প্রকট দ্বৈতভাব মণ্ডিত সত্তা উভয়েই জ্ঞান যে প্রকৃতির সেই প্রকৃতির। অর্থাৎ তিনি বিশুদ্ধরূপে চেতনবাদী।[৩৮] রবীন্দ্রনাথ এ বিষয় কোনও সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেন নি। জড় বা চেতন কোনও পদার্থের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল না। তাঁর ধারণা উভয়েই বিশ্বসত্তাব প্রকাশ। এ বিষয় তাঁব চিন্তা উপনিষদের অনুবর্তী।

এইবার আমরা একটি অনন্যসাধারণ কবিতা স্থাপন করব যার মধ্যে মানুষেব মনের ভূমিকার গভীর তাৎপর্যের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের মানুষের হয়ে গৌরববোধ চূড়ান্তভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তা হলো 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'আমি' নামে পরিচিত কবিতাটি।

তাঁর অহঙ্কারের কারণ হলো এই উপলব্ধি যে বিশ্বসত্তা যে বিরাট শিল্প রচনা কবেছেন তার পট হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছেন মানুষের মনকে। পান্নার সবুজত্ব বা চুনির রাঙিমা বা আলোকের জ্যোতিরূপ অপ্রকট রয়ে যেত যদি না অহংবোধ বিশিষ্ট মানুষের চেতনায় তা প্রতিফলিত হতো। তাই তিনি বলছেন :

৩৭. Absolute Spirit.

৩৮. Idealist.

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।

সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে মানুষের মানসপটেই বিশ্বশিল্প প্রকট হয়ে উঠেছে, যেমন চিত্রকরের মনের কল্পনা পটের ওপর রূপ পায়। সুতরাং সকল মানুষের হয়ে তাঁর অহঙ্কার দৃপ্ত ভাষায় এইভাবে ঘোষিত হয়েছে :

এ আমার অহঙ্কার,
অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহঙ্কার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।

এই গর্বিত ঘোষণা বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাউআর-এর একটি অনুরূপ ভঙ্গিকে উচ্চারিত বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থটি আরম্ভই হয়েছে সেই বাণীটি দিয়ে : বিশ্ব তো আমারই চিন্তা।[৩৯]

বিশ্বশিল্পীর শিল্পরচনায় মানুষের এই অপরিহার্য ভূমিকার তাৎপর্য একই কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, মানুষ যে দিন বিশ্ব হতে সরে যাবে সেদিন বিধাতার কি অবস্থা হবে, তা কল্পনা করে। মানুষের ইন্দ্রিয়, মানুষের মন—এদের সাহায্যেই তো বিশ্বের বর্ণ গন্ধ গীতে মধুময় রূপটি পরিস্ফুট হয়। সুতরাং মানুষ চলে গেলে তারাও চলে যাবে :

মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনে মন
ছানিয়ে নেবে রস।

৩৯. The world is my 'Idea', The World as Will And Idea.

শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।

সুতরাং কবির ধারণা মানুষ যদি চলে যায় বিধাতা কি নিজের গরজেই আবার বসবেন সাধনায় মানুষকে ফিরে পেতে? তাঁর প্রশ্নের ভিতর দিয়ে এই ধ্বনিটি ফুটে উঠেছে। এ যেন উপনিষদেরই বাণীর প্রতিধ্বনি: সোঽকাময়ত ॥ বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ স তপোঽতপ্যত ॥ ৪০

৪০. তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥২॥৬

চতুর্থ অধ্যায়

আনন্দবাদ

এক

প্রাথমিক কথা

এই যে বিরাট আকাশে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র এবং পৃথিবীর বক্ষ জুড়ে প্রাণের তরঙ্গিত প্রবাহ নিয়ে মহাবিশ্ব প্রকট হয়েছে, তার মধ্যে কি কোনও উদ্দেশ্য নিহিত আছে? ব্রাট্রাণ্ড রাসেল-এর ধারণায় মহাবিশ্ব সম্বন্ধে এ প্রশ্ন আদৌ উত্থাপন করা সঙ্গত নয়। তাঁর অভিমতের সমর্থনে তিনি দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত, তাঁর ধারণায় সৃষ্টির অভ্যন্তরে যে নানা প্রক্রিয়া চলছে তার মধ্যেই উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রাখা যুক্তিসঙ্গত। সৃষ্টির বাহিরে স্রষ্টার সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ, তা হলেই প্রশ্ন উঠবে আর এক শক্তিমত্তর ঈশ্বর তাঁকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করছেন কিনা[১]। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেন ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধরনের উদ্দেশ্য চিন্তা করা অধার্মিকের মতো[২] আচরণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্পষ্টই বোঝা যায় রাসেল-এর এই আপত্তি একেশ্বরবাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাঁর পরিকল্পনায় ঈশ্বর ব্যক্তিরূপী, তিনি সৃষ্টি হতে ভিন্ন, তিনি একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র। কাজেই তাঁর কার্যসম্বন্ধে কোনও উদ্দেশ্য ইঙ্গিত করা ধার্মিকের আচরণ-বিরুদ্ধ। এই ধরনের

১. The conception of purpose is only applicable within reality, not to reality as a whole.

—History of Western Philosophy, Book I, Chap. IX

২. Impious

যেন একটি যুক্তি তার পেছনে নিহিত আছে। কিন্তু যে পরিকল্পনায় ঐশী শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলে ধরে নেওয়া হয়, সেখানে দুটি যুক্তির কোনটিই প্রয়োগযোগ্য থাকে না। এখানে ভক্তি বা শ্রদ্ধাবোধ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, কারণ জিজ্ঞাসু মনোভাব এখানে প্রবলতর। সৃষ্টিকে রহস্যাবৃত ধরে নিয়ে, তার প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল কিনা, তা অনুসন্ধান করে দেখা জিজ্ঞাসু মনোভাবের স্বাভাবিক প্রকৃতি বলে পরিগণিত হওয়া উচিত। অবশ্য এখানে কল্পনাভিত্তিক অনুমান করতে হয়; কিন্তু উদ্দেশ্য থাকা যে অসম্ভব, এমন কথাও তো জোর করে বলা যায় না।

বরং আমরা দেখি সাম্প্রতিককালে মহাবিশ্বের প্রক্রিয়ার মধ্যে দুজন বিশিষ্ট দার্শনিক সৃষ্টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং নিজস্ব ধারণা অনুসারে একটি উদ্দেশ্যের নির্দেশও করেছেন। এঁরা হলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং ডু নুয়ি[৩]। এঁদের দুজনেরই ধারণা, মহাবিশ্বের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থেকে সৃষ্টিপ্রবাহকে তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই শ্রেণীর দার্শনিক মতকে আমরা লক্ষ্যবাদ বলতে পারি।

শ্রীঅরবিন্দের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে কি ভাবে বিশ্বশক্তি তাঁর ইচ্ছাপুরণের ব্যবস্থা করেছেন তার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর এই দার্শনিক তত্ত্বের সবিস্তার আলোচনার কোনও প্রয়োজন দেখি না। সংক্ষেপে কি উদ্দেশ্য তাঁর মতে ক্রিয়া করছে তার একটি পরিচয় দিলেই বর্তমান প্রসঙ্গে চলবে।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের দুটি মুল তত্ত্ব আছে।[৪] তাদের একটি হলো মূলসত্তার স্বরূপে অবস্থিত অবস্থা। তা স্থান-কাল-অতীত এবং স্থাণু;

৩. Lecomte Du Nouy-এর Human Destiny এবং শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৪. We have, therefore, two fundamental facts of pure existence, a fact of Being and a fact of Becoming.
Life Divine, Book I, Chap. VII.

তাকে তিনি সচ্চিদানন্দরূপ বলেছেন। এই অবস্থায় তিনি সৎ, অর্থাৎ আছেন; চিৎশক্তি বিশিষ্ট, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ; এবং আনন্দস্বরূপ। সুতরাং তিনি আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি হলো এই মূল স্থাণু সত্তার বিকাশধর্মী রূপ। একে তিনি বিকাশপরায়ণ সত্তা বলেছেন। সেই অবস্থায় তা স্থান ও কালে বিধৃত এবং গতিশীল সত্তা; তা একটি উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে বিকশিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, যিনি ছিলেন স্থাণু, তিনিই তাঁর জ্ঞান ও বল শক্তির যোগে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বে রূপান্তরিত হন। বিশ্বের এই বিকাশেরও দুটি স্তর আছে। একটিতে পাই জড় বিশ্ব; তাকে অবলম্বন করে প্রাণের বিকাশ এবং পরে মানবমনের বিকাশ। জড় প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে স্বরূপে অবস্থিত সত্তার অবরোহণ পর্বকে পাই। তার পরেই একই বিকাশের পথে আরোহণ পর্ব শুরু হয়। প্রথম স্তরে যে আরোহণ ঘটে তা সম্পাদিত হয় প্রাণশক্তি ও মানবমনের বিকাশের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু সেখানেই বিকাশের পথে আরোহণ পর্বের সমাপ্তি ঘটে না। তার দ্বিতীয় অবস্থায় তা আরও এগিয়ে চলে। মানুষের মন যুক্তির পথে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের[৫] প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পূর্ণতর জ্ঞানের সহিত পরিচিত হয়, যেমন দর্শনে ও বিজ্ঞানে। কিন্তু তাঁর ধারণায় সে জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। পরিপূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানের[৬] দিকে এগিয়ে যেতে হবে ভিন্ন পথে। সে পথ যুক্তির নয়, স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের[৭]। এই পথে উন্নততর জ্ঞানশক্তির বিকাশের ফলে তা এমন এক অবস্থায় উন্নীত হয়, যেখানে মূল সত্তা নেমে এসে তার সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। তখন মানুষের মন পরিপূর্ণ অখণ্ডজ্ঞানের অধিকারী হয় এবং ফলে মানবচরিত্রের রূপান্তর ঘটে[৮]। মানুষ তখন স্বতঃজ্ঞানের অধিকারী সত্তায়[৯] পরিণত হয়। তখন ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিত্ববোধ লোপ পাবে

৫. Analysis and Synthesis ৬. Integral Knowledge
৭. Intuition ৮. Transformation ৯. Gnostic being

এবং তা মূলসত্তা সচ্চিদানন্দের আবির্ভাবের কেন্দ্ররূপেই সে কাজ করবে। এই হলো আরোহণের চূড়ান্ত অবস্থা এবং বিকাশের পরিণতি।

এখন মূল সত্তার এই অবরোহণ এবং জটিল পথে পরে আরোহণের প্রয়োজন কি? শ্রীঅরবিন্দ বলেন তাঁর মানুষের মতো কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন থাকতে পারে না এবং প্রকৃতপক্ষে নেই। এ যেন একটা অহৈতুক খেলা, খেলার আকর্ষণেই খেলা। এই খেলায়, মূল স্বরূপে অবস্থিত সত্তা নিজেই খেলোয়াড়, নিজেই খেলার মাঠ এবং নিজেই খেলা[১০]।

এই হলো অতি সংক্ষেপে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন। তিনি জড়কে স্বীকার করেন; কিন্তু জড়বাদকে গ্রহণ করেন নি। তিনি এক বিকাশধর্মী বিশ্বে বিশ্বাসী এবং বিশ্বের মধ্যে একটি ঐশী শক্তির ক্রিয়াও লক্ষ্য করেছেন। সে ইচ্ছাশক্তি একটি সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা বলে, যা ছিল সৎ এবং স্থাণু, তা নিজেকে জড়ে পরিবর্তিত করে গতিশীল বিশ্বে পরিণত হয় এবং প্রাণের বিকাশের মধ্য দিয়ে মানবমনের বিকাশ ঘটায়; পরে সেই মনের চূড়ান্ত বিকাশের মধ্য দিয়ে স্বরূপে ফিরে আসে। সুতরাং তিনি বিশ্বাস করেন যে বিশ্ব একটি উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আমরা দেখি দার্শনিক ডু নুয়িও একটি তুলনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। প্রথমে তাঁর প্রতিপাদ্যের বিষয় আলোচনা করা যাক। তিনি তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের নাম দিয়েছেন 'টেলিফাইনালিজম্'[১১]। এর বাংলা অনুবাদ হতে পারে দূরপ্রসারী লক্ষ্যবাদ। নামকরণ হতেই বোঝা যায় তাঁর প্রতিপাদ্য হলো এক সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করছে।

১০. Creating and recreating Himself for the sheer bliss of Self-creation, of that Self-representation—Himself the play, Himself the player, Himself the playground.
Life Divine, Book I, Chap. XIII.

১১. Telefinalism.

ডু-নুয়ি-এর বিশ্বাস ক্রমবিকাশ ব্যাপারটি সমগ্র পৃথিবীর বক্ষ জুড়ে ক্রিয়াশীল। সুতরাং তাকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে। সেই ভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে এর মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়া করছে এবং তা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে[১২]। অবশ্য তার মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে; সব জায়গায়ই সব পরীক্ষা সফল হয় নি। তবে সমগ্রভাবে দেখলে তার গতি অগ্রগতির পথে। তাঁর ধারণায়, একটি চূড়ান্ত উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ধরে না নিলে, ক্রমবিকাশের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে, কেবল মাত্র জড়শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের হতাশ হতে হয়; কারণ জড়বস্তুর প্রকৃতি ও আচরণরীতির সঙ্গে তার প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধান[১৩], প্রাকৃতিক নির্বাচন[১৪] এবং জীবকোষের পরিবর্তন[১৫]—এদেরও ভূমিকা আছে। তবে তাদের ভূমিকা গৌণ; কেবল এই প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যে ক্রমবিকাশের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় না। এগুলি কার্যসাধনের উপায় মাত্র[১৬]। তারা প্রকৃত নিয়ন্ত্রকশক্তি নয়।' একটি বাড়ি নির্মাণ করতে কর্ণিকের বা রাজমিস্ত্রীর যে ভূমিকা, এদের ভূমিকা তার অনুরূপ। কর্ণিকের সাহায্যে বাড়ি গাঁথবার মালমসলা ব্যবহার করা যায় এবং প্রয়োজন হলে মিস্ত্রী তার সাহায্যে ইট কাটতে পারে; কিন্তু কেউ কি তা হলে বলবেন যে কর্ণিক বা মিস্ত্রী বাড়ি গাঁথে? প্রকৃতপক্ষে যে স্থপতি নকশা রচনা করেন, তিনিই এই নির্মাণ-কার্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও একটি লক্ষ্য অনুরূপভাবে মুখ্য নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল।

১২. We suggest the hypothesis of a finality ....that is to say, a telefinality directing evolution as a whole.

১৩. Adaptation　১৪. Natural Selection　১৫. Mutation

১৬. Mechanism

এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলো এমন একটি জীবরূপ বিকশিত করা, যার চূড়ান্ত বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা মিলবে। এই লক্ষ্যের পথ নানা বিঘ্ন ও প্রতিকূল পরিবেশ হতে জীবকে পরিত্রাণের চেষ্টার দ্বারা সূচিত। প্রথম অবস্থায় অচলভাবে স্থিতি হতে দেহের স্থান হতে স্থানান্তরে পরিচালনার শক্তি অর্জন তার প্রথম পদক্ষেপ। পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা হতে মুক্তি তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ; হাত দুটির দেহ সঞ্চালনের কাজ হতে মুক্তি তার তৃতীয় পদক্ষেপ; অর্জিত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা পুরুষানুক্রমে কথা ও গ্রন্থের মাধ্যমে সংক্রামিত করার একটি সফল উপায় উদ্ভাবন তার চতুর্থ পদক্ষেপ, এবং নীতিবোধের পরিস্ফুরণ তার শেষ পদক্ষেপ[১৭]।

সুতরাং দেখা যায়, ডু নুয়ি ক্রমবিকাশের মধ্যে একটি উন্নততর জীবন উদ্ভাবন করবার উদ্দেশ্য লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেন, ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত রূপ হলো মানুষ, এমন মানুষ যার মধ্যে উচ্চমানের নৈতিকবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। তাঁর ধারণায়, মানুষের প্রখরতর বুদ্ধি, দুপায়ে চলবার শক্তি এবং দুটি মুক্ত হাত তাকে শুধু প্রকৃতির দাসত্ব হতে মুক্তি দেয় নি, তার কাছে একটি সমৃদ্ধতর ও উচ্চতর মানসিক জীবনের সম্ভাবনার পথও উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সেই পথেই তার বিবেক ও দায়িত্ববোধের উৎপত্তি হয়েছে। সেই বিবেকবোধকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করেই মানুষ তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথও সৃষ্টির মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়া করছে বলে বিশ্বাস করেন। সে বিষয় বিস্তারিত আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়বে। সুতরাং এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দুই

উপনিষদের আনন্দবাদ

উপনিষদের ঋষিগণ ও সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের

১৭. Liberation of Conscience

ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মতে এই উদ্দেশ্য হলো আনন্দ আস্বাদন। তাঁদের এই প্রতিপাদ্যটি পরিস্ফুট করতে তাঁরা বিশ্বকে যে মহাসত্তা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁর দুটি রূপ কল্পনা করেছেন—একটি সৃষ্টি-পূর্ব রূপ এবং অপরটি সৃষ্টি-রূপ। প্রথমটিকে অমূর্ত বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিকে মূর্ত বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি বচন এখানে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে। তাতে বলা হয়েছে ব্রহ্মের দুটি রূপ : মূর্ত এবং অমূর্ত, মর্ত্য এবং অমৃত, স্থির এবং গতিশীল, সত্তাবান ও সত্তাহীন।[১৮] এখানে দুটি রূপেরই বর্ণনা পাই। প্রাক্ সৃষ্টির রূপ অমূর্ত রূপ; সেখানে ব্রহ্ম স্থির, স্থানকালে বিধৃত নন (সত্তাহীন) এবং মৃত্যুর স্পর্শ রহিত। আর যেটি সৃষ্টির রূপ, সেখানে তিনি মূর্ত হয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বে পরিণত হয়েছেন ; সেখানে তাঁর নিত্যপরিবর্তনশীল বিচিত্র রূপ ; স্থান-কালে তা বিধৃত (সত্তাবান)। অমূর্তরূপকেই উপনিষদে অন্যত্র অদ্বৈতরূপ বলা হয়েছে। এখানে তিনি বহুকে জড়িয়ে সমগ্ররূপে অখণ্ড নন, খণ্ডহীনভাবে বিশুদ্ধ এক।

এই অমূর্তরূপের প্রকৃতি কি রকম, তার একটি বর্ণনা কঠ উপনিষদের একটি বচনে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, সেই অবস্থায় ব্রহ্ম শব্দগুণহীন, স্পর্শগুণহীন, রসগুণহীন, অনাদি এবং অনন্ত[১৯]। অর্থাৎ সে অবস্থায় তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণযোগ্য নন। দ্বৈতভাব না থাকলে তো ভোক্তৃ-ভোগ্যের সম্পর্কে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের আস্বাদন থাকে না। এই অদ্বৈত অবস্থায় ব্রহ্ম একান্তই নিঃসঙ্গ। তাই তাঁকে 'একমেব' এবং 'অদ্বিতীয়' অর্থাৎ দ্বৈতভাবহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপনিষদের ধারণায় এই নিঃসঙ্গ অবস্থাই যেন সৃষ্টির প্রেরণা।

১৮। দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ বৃহদারণ্যক ২॥৩॥১

১৯। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ। কঠ ॥ ১॥৩॥১৫

অমূর্ত, অসঙ্গ, নিশ্চল, স্থাণুরূপ ভাল লাগে না বলেই ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করে তাতে রূপান্তরিত হলেন। এই কথাটি একাধিক উপনিষদে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি নির্বাচিত বাণী এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে: পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন। অন্য কিছুই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলেন, বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করব।[২০] বলা বাহুল্য, এখানে আত্মা অর্থে ব্রহ্মই সূচিত হয়েছেন; কারণ এখানে পাই সৃষ্টির পূর্বের অবস্থার কথা, তখনও মানুষের আত্মার আবির্ভাব হয় নি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, একমাত্র, দ্বিতীয়বিহীন একটি সত্তা সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন।[২১] তিনি তার পর ইচ্ছা করলেন, আমি বহু হব, জন্মগ্রহণ করব। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তেজ সৃষ্টি, করলেন।[২২] সেই তেজই সেই মহাশক্তি যা প্রকট বিশ্বকে সৃষ্টি করল।

একই কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটু স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। সৃষ্টি-পূর্ব অবস্থায় আত্মা বা ব্রহ্মকে সঙ্গবিহীন পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার পর বলা হয়েছে সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় আনন্দ পেলেন না বলেই তিনি দ্বিতীয়কে ইচ্ছা করলেন।[২৩]

তৈত্তিরীয় উপনিষদ একটি অতিরিক্ত কথা বলেছে। শুধু ইচ্ছা করলেই তো ইচ্ছাপূরণ হয় না; তার জন্য সাধনা করতে হয়, তপস্যা করতে হয়। তৈত্তিরীয় বলে, সেই একক, নিঃসঙ্গ দ্বিতীয় বিহীন সৃষ্টি-পূর্বসত্তা যখন কামনা করলেন তিনি জন্মগ্রহণ করে বহু হবেন, তখন

২০. আত্মা বেদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিংচন মিষৎ
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি॥ ঐতরেয়॥ ২॥ ১

২১. সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬॥ ২॥ ১

২২. তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তৎ তেজোঽসৃজত॥ ছান্দোগ্য॥ ৬॥ ২॥৩

২৩. আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ॥
বৃহদারণ্যক॥ ১॥ ৪॥ ১
স বৈ নৈব রেমে…স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ॥ বৃহদারণ্যক॥ ১॥ ৪॥ ৩

তিনি তপস্যা করলেন। সেই তপস্যার বলেই এই সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং তাতে প্রবেশ করে এই বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রকট হলেন[২৪]।

এখন প্রশ্ন ওঠে সৃষ্টিপূর্ব একক অমূর্ত রূপ কেন নিজের ওপর দ্বৈতভাব আরোপ করে বহু দ্বারা খণ্ডিত এই বিচিত্র বিশ্বরূপে নিজেকে পরিবর্তিত করলেন। তার উত্তরে উপনিষদের ঋষি বলেন, ব্রহ্মের তো কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন ছিল না: তিনি আনন্দ আস্বাদনের জন্য সৃষ্টি প্রবাহে রূপান্তরিত হলেন। এই কথাটি বোঝাতে উপনিষদে ব্রহ্মকে আনন্দ বা রসস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন রস তো শূন্যকে অবলম্বন করে স্ফুরিত হয় না; তার জন্য চারটি পক্ষের প্রয়োজন। যেমন শিল্পের ক্ষেত্রে চাই শিল্পবস্তু বা রূপকর্ম, তার অন্তর্নিহিত রসকে গ্রহণ করতে শিল্পরসিক, তাদের সংযোগের ফলে যে রসানুভূতি সংঘটিত হয় তাই এবং শিল্পবস্তু সৃষ্টির জন্য শিল্পী। শিল্পের ক্ষেত্রে এরা চারটি বিভিন্ন পক্ষ; কিন্তু বিশ্বশিল্প রচনার ক্ষেত্রে একই মহাশক্তি একাধারে এই চারটি পক্ষে রূপান্তরিত হলো। ব্রহ্ম একাধারে স্রষ্টারূপে বিশ্বশিল্পী, বিশ্বরূপে শিল্প, দ্রষ্টারূপে মানব মনে শিল্পরসিক এবং ভোগ্য-ভোক্তার সম্বন্ধ রূপে শিল্পানুভূতি: অতিরিক্তভাবে সবই তিনি বলে সমগ্ররূপে তিনি আনন্দ বা রসস্বরূপ। উপনিষদের ধারণায়, এই রসের বা আনন্দের আকর্ষণেই এই নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিধারা প্রবাহিত হয়েছে। তাতে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, তাদের জড়িয়ে রসানুভূতি আছে এবং সেই কারণেই অখণ্ড দৃষ্টিতে বিশ্বরূপে প্রকট রূপ বা ব্রহ্মের মূর্তরূপ তাঁর রসরূপ বা আনন্দরূপ।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে আমরা দুটি বিভিন্ন উপনিষদ হতে দুটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাণী এখানে উদ্ধৃত করব। একটিতে

২৪. সোঽকাময়ত ॥ বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ স তপোঽতপ্যত ॥ স তপস্তপ্ত্বা ॥ ইদং সর্বমসৃজত ॥ যদিদং কিংচ ॥ স তৎ সৃষ্ট্বা ॥ তদেবানুপ্রাবিশৎ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ২ ॥ ৬

ব্রহ্মের রসরূপের উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্যটিতে তাঁর আনন্দরূপের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বচনটি পাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে। সেখানে বলা হয়েছে: তিনি রসস্বরূপ। তিনি রসলাভ করে আনন্দিত হন। কে-ই বা জীবন-ধারণ করত বা প্রাণধারণ করত যদি না এই আকাশ আনন্দের আধার হতো। প্রকট বিশ্বের ভিতর দিয়ে তিনিই আনন্দ আস্বাদ করেন[২৫]।

এই বাণীটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। রস হলো তাই যা মনকে আনন্দসিক্ত করে। ভরতমুনি এই অর্থেই শিল্পকর্মকে রস বলেছেন। তাকে আস্বাদ করেই শিল্পরসিক ব্রহ্মাস্বাদের সমস্থানীয় আনন্দ লাভ করেন। এ কথা হলো বিশ্বনাথ কবিরাজের। উপনিষদের ঋষির পরিকল্পনায় বিশ্ব মূর্তরসস্বরূপ এবং বিশ্বশিল্পের প্রত্যেকটি উপাদানই ব্রহ্ম হওয়ায় ব্রহ্মও রস স্বরূপ। তাই বলা হয়েছে 'রসো বৈ সঃ'। বিশ্বশিল্পীর শিল্প আকাশপটেই বিধৃত। অগণিত গ্রহ নক্ষত্র এবং পৃথিবীর কোলে প্রবাহিত প্রাণের ধারা সবই তো আকাশে আশ্রিত। কাজেই আকাশ আনন্দে ভরা। মানুষের মন দিয়ে মানুষের চেতনা দিয়ে সেই বিশ্বশিল্পী আনন্দ আস্বাদন করেন। তাই যে মানুষের মনে অখণ্ডবোধ সঞ্চারিত হয়, সে বিশ্বকে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' বলে অভিবাদন করে।[২৬]

দ্বিতীয় বচনটিও একই উপনিষদে পাই। তাতে বলা হয়েছে (বরুণের পুত্র ভৃগু) জানলেন ব্রহ্মই আনন্দ। আনন্দ হতেই এই জীবসকল জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করে আনন্দের জন্যই জীবন ধারণ করে। (মৃত্যুর পর) আনন্দেই প্রতিগমন করে এবং (আনন্দে) প্রবেশ করে[২৭]।

২৫. রসো বৈ সঃ ॥ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ॥ কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ ॥ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ॥ এষ হ্যেবা নন্দয়াতি ॥ তৈত্তিরীয়। ২। ৭

২৬. মুণ্ডক ॥ ২। ২। ৭

২৭. আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ॥ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ॥ আনন্দেন জাতানি জীবন্তি ॥ আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি ॥ তৈত্তিরীয়। ৩। ৬

এ বচনটিও সমান-তাৎপর্যপূর্ণ। জন্ম ও মৃত্যু এখানে আনন্দের উপাদান রূপে কল্পিত হয়েছে। সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে সৃষ্টির প্রবাহ যেন বিশ্ব জোড়া নাট্য, তা স্থান ও কালের রঙ্গমঞ্চে বিধৃত। নাট্যকার, নাট্যের চরিত্র, নাট্যে আশ্রিত যে রস এবং নাট্যরসিক সবই ব্রহ্ম। তাই জন্মেও আনন্দ, মৃত্যুতেও আনন্দ। যেহেতু এদের সব কিছু ব্যাপ্ত করে ব্রহ্ম বিরাজিত, তিনিও আনন্দ।

এখন আনন্দ জিনিসটি কি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। তা সুখ নয়, তা সুখ হতে আরও ব্যাপক। আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি সুখ দেয় বা দুঃখ দেয়। আমাদের হৃদয়বৃত্তির অনুভূতিও সুখ দেয় বা দুঃখ দেয়; তবে তার অতিরিক্ত একটি অনুভূতিরও আস্বাদ দিতে পারে। তবে তা সুখের মতোও নয়, দুঃখের মতোও নয়, তা একটি স্বতন্ত্র ধরনের ব্যবহারিক জীবনের সহিত সংযোগহীন অনুভূতি উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে। তাকেই উপনিষদের ঋষি আনন্দ বলেন। তা সুখ-দুঃখকে জড়িয়ে নিয়ে, তাদের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে গড়ে ওঠে। নাটকের অভিনয় দেখে যে অনুভূতি মনে সঞ্চারিত হয়, তার সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে। এর ঠিক সমার্থবোধক শব্দ ইংরেজিতে নাই। যে পারিভাষিক শব্দটি তার সব থেকে কাছে যায়, তার বাংলা অনুবাদ দাঁড়াবে শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি[২৮]।

আমাদের বক্তব্যকে সহজবোধ্য করবার জন্য একটি উপমা প্রয়োগ করা যেতে পারে। নাট্যকার যে নাট্য রচনা করেন তাতে কত ঘটনার সমাবেশ, কত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে, কত ভিন্ন ধরনের অনুভূতি ফুটে ওঠে। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ প্রীতি করে, কেউ হিংসাত্মক কাজ করে। বিশেষ চরিত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে, আমরা দর্শক হিসাবে তাদের সুখে সুখী হই, দুঃখে মন খারাপ করি; কিন্তু সমগ্র নাটককে অবলম্বন করে যে রস বিকশিত হয়ে ওঠে, তা গ্রহণ করে আমরা আনন্দ পাই। বিশ্বকেও অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে এমন একটি

২৮. Aesthetic emotion

রসের ধারার আবিষ্কার করা যায়। উপনিষদ তাকেই আনন্দ বলেছে এবং আরও বলেছে যে সেই রসের আকর্ষণেই বিশ্বসত্তা বিশ্ব রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই অর্থেই বলা হয়েছে আনন্দের আকর্ষণেই জীবেরা জন্মগ্রহণ করে, আনন্দকে অবলম্বন করেই তারা জীবনধারণ করে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আনন্দে প্রবেশ করে। সুতরাং সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে রসের ধারা প্রবাহিত তা হতে ব্রহ্ম অভিন্ন। কাজেই আনন্দই ব্রহ্ম।

মনে হয় বিশ্বকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে একটি বিরাট প্রবহমান নাট্য বলেই প্রতিভাত হয়। মহাবিশ্বে কি দেখি? বিশ্লেষণ করে করে একদিকে পাই অণুকে। কিন্তু সেই অণুর মধ্যেও বিভাগ আছে; তাদের মধ্যে একটি সামগ্রিক সুমিতি বিরাজিত। প্রোটন ও নিউট্রনকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলি চক্রাকারে ঘুরছে। ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বিদ্যুৎ-শক্তির সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে তাদেব মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যেও আবার ভাঙাগড়া আছে। বড় অণু ভেঙে ছোট অণুতে পরিণত হচ্ছে, ছোট অণু অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে বড় অণুতে পরিণত হচ্ছে। এই ভাঙাগড়ার খেলায় যে শক্তি মুক্ত হচ্ছে, তাই তাপ ও আলোক তরঙ্গ রূপে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে। অপর-দিকে বিভিন্ন শ্রেণীর অণুর অন্তর্ভুক্ত ইলেকট্রনগুলির যে নির্দিষ্ট কক্ষপথ আছে তার মধ্যেও কোথাও কোথাও শূন্য স্থানের সুযোগ নিয়ে অণুতে অণুতে মিলন ঘটে রাসায়নিক মিশ্রণ সম্ভব হচ্ছে। এই ভাবেই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে জলের মতো, লবণের মতো রাসায়নিক পদার্থ গড়ে উঠেছে। এই নিয়েই তো জড় জগৎ।

কিন্তু সত্যই কি তা জড়? তাকে অবলম্বন করেই কি প্রাণের প্রকাশ নয়? সে প্রাণশক্তি তো দেহকে আশ্রয় করেই বিকশিত। সেই দেহ গড়ে উঠছে নানা মৌলিক ও মিশ্র পদার্থের সমাবেশে। তাতে কার্বন আছে, অক্সিজেন আছে, আরও কত কি আছে। তার মধ্যে যে সুসংহত শক্তি ক্রিয়াশীল তার ঐক্য ও তার অনবদ্য কর্মবিন্যাস সত্যই বিস্ময়কর। বাহিরকে জানা ও পরিবেশ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করার

কাজ কি নিপুণভাবে তা সম্পাদন করছে। সেখানেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হচ্ছে এবং তার সাহায্যে কাজ চলছে। হৃৎপিণ্ড দ্বারা যে রক্তপ্রবাহ পরিচালিত হচ্ছে তার ছন্দ এই বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মস্তিষ্কে যে চিন্তা হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান আহৃত হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিকট যে নির্দেশ যাচ্ছে, তার সঙ্গেও বিদ্যুৎশক্তির সংযোগ আছে। কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে কেবলমাত্র জড়শক্তির ওপর নির্ভর করে মানসিক ক্রিয়ার বা প্রাণশক্তিব ব্যাখ্যা হয় না সত্য; কিন্তু তাদের সম্বন্ধ তো নিত্য: জড়ের বাহিরে তো প্রাণের প্রকাশ দেখি না। কাজেই জড় ও চেতনের মধ্যে সমধর্মিতা নিশ্চয়ই আছে।

ওদিকে মহাকাশেও বিস্ময়কর ব্যবস্থার শেষ নাই। ক্ষুদ্র অণু জুড়ে জুড়ে উপগ্রহ, গ্রহ গড়ে উঠেছে। তারাও নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনের মতোই আবর্তিত। অণু ও বিরাটে একই ছন্দ ক্রিয়াশীল। কোটি কোটি নক্ষত্র এক কেন্দ্রবিন্দুকে মাঝে রেখে থালাব আকারে আবর্তিত। আমাদের ছায়াপথ এমনি একটি নক্ষত্রমণ্ডলী দিয়ে বচিত থালা। মহাশূন্য আবার এই ধরনের কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা বেষ্টিত। এ যেন এক ধরনের রাসনৃত্য; অণু হতে বিবাটে, বিরাট হতে বিরাটতরে একই বর্তুলাকার নৃত্যছন্দ নিত্য ক্রিয়াশীল।

অপবদিকে বিশ্ব ব্যেপে যে বিরাট নাট্য অভিনীত হচ্ছে তা বোঝবার বা হৃদয়ঙ্গম করবার উপযুক্ত মন যতক্ষণ না বিশ্বে ফুটে উঠছে, ততক্ষণ তা যে শূন্য প্রেক্ষাগারে নাট্যাভিনয়ের মতই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান সে কথা স্বীকার করুক বা নাই করুক, জ্ঞান-শক্তির উদয়ের পূর্বে বিশ্বে রূপ বলে কিছু ছিল না, শব্দ বলে কিছু ছিল না, আস্বাদ বলে কিছু ছিল না। রামধনুব বর্ণাঢ্য শোভা দেখে কেউ বলবার ছিল না, কি সুন্দর! হৃদয় বলে কিছু ছিল না; মায়া মমতা প্রীতি বলে কিছু ছিল না। উপনিষদে বলে সেই জন্যই সঙ্গহীন, দ্বিতীয়বিহীন একক জীবন বিশ্বসত্তার ভাল লাগে নি এবং সেইজন্য

তিনি বহুদ্বারা বিখণ্ডিত বিশ্বে নিজেকে রূপান্তরিত করলেন।

সুতরাং দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে যে বিচিত্র বিশ্ব গড়ে উঠেছে তা উপনিষদের ঋষির অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির গুণে আনন্দরূপ ও অমৃত বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁরা বুঝেছিলেন, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড বিরাজমান। একই সত্তা বিশ্বের মধ্যে; মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়ে তাদের একটি সামগ্রিক সুমিতির বিন্যাসে গ্রথিত করেছেন আনন্দ-উপলব্ধির জন্য। সেই কারণে, তাঁদের উপলব্ধিতে পৃথিবী হয়েছে মধুময় এবং তাতে অবস্থিত সকল ভূত হয়েছে মধুময় এবং তাদের ব্যাপ্ত করে যিনি বিরাজ করছেন তিনি অমৃতময়।[২৯]

এইভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে মনে হয়, সত্যই বিশ্ব জুড়ে একটি শিল্প-আস্বাদনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সেই ব্যবস্থায় শিল্প ও শিল্পরসিক একই মহাশক্তি হতে উদ্ভূত হয়েছে। বিশ্বের পরিণত রূপেই যেন বিশ্ব এক দিকে শিল্প এবং অন্যদিকে শিল্পরসিক হয়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ভোক্তা ও ভোগ্যের সম্বন্ধে প্রকট। আর যিনি শিল্পী তিনি উভয়কে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে, সবকিছু নিয়ে একটি সামগ্রিক একতা-মণ্ডিত করে শিল্প ও শিল্পরসিকের মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজ করেন। এই শিল্পকে অনবদ্য করার জন্য কোনও ত্রুটি রাখা হয় নি। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে, বিশ্বশক্তি যেখানে যেমনটি সাজে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা শাশ্বত কালের জন্য করে রেখে দিয়েছেন; কারণ, তিনি একাধারে কবি ও মনীষী[৩০]। এ শিল্প নিত্য প্রবহমান, কারণ এ যে দেবতার শিল্প। তাই জন্যই তা জীর্ণ হয় না, মৃত্যুও তার নাই। 'ন জীর্যতি ন ম্রিয়তে'।

২৯. ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজো ময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ বৃহদারণ্যক ।২।৫।১

৩০. কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতো ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ঈশ ।৮

উপনিষদের ঋষির ধারণায় ব্রহ্মের আনন্দ পরিমাণে এত বেশি যে তা ধারণা করা যায় না। তাঁর আনন্দের পরিমাপ বোঝাতে একটি গাণিতিক হিসাব স্থাপন করা হয়েছে। এই হিসাব দুটি উপনিষদে আছে (বৃহদারণ্যক ॥৪॥৩॥৩৩ ও তৈত্তিরীয় ॥২॥৮)। উভয় ক্ষেত্রেই একটি মানুষের আনন্দকে মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের আনন্দের ব্যাখ্যার ভাষায় কিছু তারতম্য থাকলেও অর্থ একই দাঁড়ায়। তৈত্তিরীয় বলে, একটি সাধু যুবা, সে একাধারে দ্রঢ়িষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী বিত্তে পূর্ণ হয়ে তার অধিকারে আসবে—এই হল মনুষ্য-আনন্দ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ মনুষ্য-আনন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে : একটি মানুষ, সে রাদ্ধ এবং সমৃদ্ধ এবং সমগ্র 'মনুষ্য আনন্দে সম্পন্নতম' হবে—তাই হলো এক মনুষ্য-আনন্দ। তারপর এই গাণিতিক বিবরণ ধাপে ধাপে উঠে গেছে ব্রহ্মের আনন্দকে লক্ষ্য করে পিতৃগণ, গন্ধর্ব ও বিভিন্ন দেবতাদের আনন্দের পরিমাপ দিতে দিতে। প্রতিক্ষেত্রেই আনন্দের অঙ্ক শতগুণ বর্ধিত হয়ে গেছে। উভয় ক্ষেত্রেই যে গাণিতিক সংখ্যা মেলে তা ধারণাতীত। অর্থাৎ মর্ম হলো এই যে ব্রহ্মের আনন্দের পরিমাণ এত বেশী যে তা ধারণা করা যায় না।

এই জন্যই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে : ব্রহ্মের আনন্দ মন দিয়ে গ্রহণ করা যায় না, বাক তাকে ধারণা করতে চেষ্টা করে মূক হয়ে ফিরে আসে, সেই আস্বাদ পেলে ভয় বলে কিছু থাকে না[৩১]। মূল বচনটি নীচে পাদটীকায় উদ্ধৃত করা হলো। অনেকে ব্যাখ্যা করেন যে মন ও বাক্য পরাহত হয়ে ফিরে আসে ব্রহ্মকে না পেয়ে। কিন্তু বাক্যটির ব্যাকরণগত বিন্যাস দেখলে সন্দেহ থাকে না যে এখানে মূল পদ হলো 'আনন্দ', 'ব্রহ্ম' নয় ; আনন্দই এখানে জ্ঞাতব্য বিষয়, আনন্দকে নির্দিষ্ট করতেই ব্রহ্মের সহিত তার সম্বন্ধ পদের সংযোগ ঘটেছে।

৩১. যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ॥ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ তৈত্তিরীয় ।২।৪। ও ২।৯

তিন

রবীন্দ্রনাথের আনন্দতত্ত্ব

আশ্চর্য লাগে দেখে যে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আনন্দবাদ সমগ্র অন্তঃকরণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। এ উপলব্ধি ঠিক উপনিষদ পাঠ করে সংঘটিত হয় নি, কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও হৃদয়ের অনুভূতি হতে উন্মথিত হয়ে উঠেছে। তিনিও বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো অহৈতুক আনন্দের আস্বাদ। তিনি এও বিশ্বাস করেন, এই আনন্দের আকর্ষণেই যিনি একান্তই একক ছিলেন, সেই দ্বিতীয়হীন পরম-এক এই বহুদ্বারা খণ্ডিত ও বিচিত্রিত বিশ্বে নিজেকে রূপান্তরিত করলেন। আরও আশ্চর্যের কথা, তাঁর এই উপলব্ধি এল একটি মহাশোকের আঘাতের মধ্য দিয়ে। তাঁর পত্নী মৃণালিণী দেবী অকালে লোকান্তরিত হলে, তিনি বিচ্ছেদের তীব্র আঘাতের বেদনায় নিপীড়িত হয়ে বলেছিলেন, 'প্রেম এসেছিল চলে গেছে আজি খুলি দ্বার'। কিন্তু সেই বেদনার আলোকেই তিনি উপলব্ধি করলেন এই মহাসত্য যে বিশ্বসত্তা আপনাকে দুই করে আনন্দ আস্বাদ করবার জন্যই এই বিশ্বে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তিটি চুম্বকে কি সুন্দরভাবে উপনিষদের আনন্দতত্ত্বের মর্মকথা বলে দিয়েছে, তা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই বোঝা যায়। সমগ্র উপনিষদের দর্শনখানিই যেন এখানে স্থাপন করা হয়েছে :

> যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
> আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
> দুয়ের মিলন ঘাতে বিচিত্র বেদনা
> নিত্য বর্ণ গন্ধ-গীত করিছে রচনা।[৩২]

রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহু দুঃখের আঘাত পেয়েছেন। পারিবারিক জীবনে মৃত্যুশোক তাঁর মনে বার বার নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে। অতি

৩২. স্মরণ, ২২

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা একে একে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। তবু তিনি দুঃখবাদী হন নি। তাঁর কবিতায় আনন্দের আস্বাদের বারবার পরিচয় পাই। সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, প্রীতি-বিদ্বেষ, জীবন-মৃত্যু জড়িয়ে নিয়ে যে মানবজীবন তাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন আনন্দের লীলাক্ষেত্ররূপে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সুন্দর পরিচয় পাই নীচের কাব্যাংশে :

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।[৩৩]

তা সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মতোই সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যুকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছিলেন বলে। এর জন্য প্রয়োজন অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির। জীবনের বহু খণ্ড অভিজ্ঞতাকে ঐক্যের সূত্রে যদি গ্রথিত করতে পারি, তবেই আনন্দকে আস্বাদ করবার অধিকারী হই। তা না হলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর আঘাতে ক্ষুণ্ণ হই। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের মনকে সুখ দুঃখ বোধের ঊর্দ্ধে তুলে নিতে পারে, যেখানে বিশ্ব জুড়ে প্রাণের প্রবাহের মধ্যে যে অমৃত লুকানো আছে তার সন্ধান মিলবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর নীচে স্থাপিত মন্তব্যটি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

'নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের সুখ শান্তি মঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের অবকাশ নাই। সে ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে, সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না—সে খণ্ড খণ্ড মৃত্যুদ্বারা আহত তাড়িত বিক্ষুব্ধ হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিক ধর্ম বশতঃই কখন জানিয়া, কখন না জানিয়া, কখন বক্রপথে, কখন সরল পথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে, সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে'।[৩৪]

৩৩. গীতাঞ্জলি, ৪৪
৩৪. আত্মপরিচয়, ৩

সুতরাং সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু আনন্দের উপাদান। দুঃখকে বা মৃত্যুকে এড়াতে চাইলে আমরা আনন্দ হতে বঞ্চিত হব। কারণ, আনন্দের দুইটি উপাদান, দুটিকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখতে পারবে, সেই আনন্দ আস্বাদের অধিকারী হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এই :

'আনন্দ দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এই জন্য কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর আনন্দের পক্ষে ভালো মন্দ দুই-ই সমান।'[৩৫]

এই জন্যই তিনি দুঃখকে, অশান্তিকে এড়াতে চান নি, তাদের সাদরে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কারণ, তাঁর ধারণায়, তাকে গ্রহণ করে, তার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে, তবেই ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়—এই ছিল তাঁর ধারণা। দুঃখের আঁধার, শোকের আঁধার, মৃত্যুর আঁধার—এদের উত্তীর্ণ হয়েই আনন্দলোকে পৌঁছান যায়। তিনি নিজেই বলেছেন 'খেয়াতে' 'আগমন' শীর্ষক কবিতায় তাকেই তিনি স্বাগত জানিয়েছেন[৩৬]। তাকেই তিনি এই কবিতায় 'আঁধার ঘরের রাজা' বা 'দুঃখরাতের রাজা' বলে স্বাগত জানিয়েছেন। কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

ওরে দুয়ার খুলে দেরে, বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের রাতে হঠাৎ এল দুঃখরাতের রাজা।

মনে হয় 'গীতাঞ্জলি'র একটি কবিতায় এই সুরেরই প্রতিধ্বনি পাই। বিশ্ব জুড়ে যে আনন্দনৃত্য প্রবাহিত তাতে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ভাঙা-গড়া এরাই ছন্দ। সুতরাং দুঃখকে, ভাঙাকে, মরণকে এড়িয়ে

৩৫. আত্মপরিচয়—৩
৩৬. খেয়া, আগমন

যেতে নেই। তাদের গ্রহণ করতে হয়; তাদের পার হয়েই আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাই কবি নিজেকেই উদ্দেশ্য করে বলছেন :

পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দেরে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দেরে।

একই চিন্তা তিনি উপনিষদের বাচনভঙ্গির অনুসরণে রুদ্রের প্রসন্ন-মুখের উল্লেখের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। রুদ্রের রুদ্রতাকে বক্ষে ধারণ করে নিলে তবেই রুদ্রের প্রসন্নমুখ দেখা যাবে। সেই প্রসন্নমুখ, তাঁর ধারণায়, পরম সত্য, কারণ, তাঁর ধারণায়, বিশ্বসৃষ্টির চূড়ান্ত সার্থকতা আনন্দ আস্বাদনে। তিনি বলছেন, 'চরমসত্য ও পরম সত্য হচ্ছে ওই প্রসন্নমুখ। সেই সত্যই হচ্ছে রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছাতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হয়'। ৩৭

সুতরাং বিশ্ব জুড়ে যে আনন্দযজ্ঞের আয়োজন চলেছে তাতে নিমন্ত্রণের অধিকার পেতে হলে সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। শুধু সুখকে আঁকড়ে ধরে এবং দুঃখকে এড়িয়ে চলে তাকে পাওয়া যায় না। তা হলে সুখ-দুঃখের বোধের স্তরেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকব। দুঃখকে, শোককে, অশান্তিকে গ্রহণ করে তবে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

'আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এই জন্যই যে দুঃখকে, মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে না—ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে—জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়'। ৩৮

সুখ-দুঃখ, সুশ্রী-কুশ্রী জড়িয়ে নিয়ে যে সামগ্রিক সুমিতি ফুটে

৩৭. আত্মপরিচয়—৩
৩৮. আত্মপরিচয়—৩

উঠেছে, তাই যে আনন্দের আকর রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি জীবনের শেষ প্রান্তেও অটুট ছিল। এই সুমিতিকে তিনি সুষমা বলেছেন একটি কবিতায়। শব্দটির দ্যোতনা অত্যন্ত গভীর। অভিধা অর্থে যা পাই ধ্বন্যর্থ পাই তার থেকে অনেক বেশি। তিনি বিতর্ক এড়িয়ে গেছেন, কবির হৃদয় দিয়ে অনুভব করা উপলব্ধির কথা বলেছেন, এই ভাবে, তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে :

আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রচণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার, সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন :
এইতো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট আলাপ[৩৯]।

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় বিশ্বরচনার উদ্দেশ্য আনন্দ-আস্বাদন বলেই তার কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন চরিতার্থ করবার ক্ষমতা থাকে না। এই কারণে, তিনি বিশ্বরচনাকে এমন জিনিসের সহিত তুলনা করেছেন, যার প্রেরণা কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধ নয়, আনন্দ-আস্বাদন। তাই দেখি তাঁর বিরাট কাব্যসাহিত্যে তিনি তাকে কোথাও তুলনা করেছেন খেলার সঙ্গে, কোথাও যাদুকরের পালার সঙ্গে, কোথাও নৃত্যের সঙ্গে। সব কটি উপমানই শিল্পের গুণ ধারণ করে। সবক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য, এই কথাটি বোঝানো যে বিশ্বরচনার পিছনে কোনও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নাই, তা অহৈতুক। তাঁর কাব্যে রঙীন কল্পনা এবং চিত্তহারী ভাষায় এগুলি প্রচারিত হয়েছে। আমরা এখানে তার কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করে স্থাপন করবার প্রস্তাব করি।

৩৯. রোগশয্যায়, ২১

প্রথমেই খেলার পরিকল্পনার কথা ধরা যাক। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় সমস্ত বিশ্ব জুড়েই সেই প্রচ্ছন্ন শিল্পীর খেলা চলছে। এই প্রসঙ্গে 'উৎসর্গে'র ৩৮ সংখ্যক কবিতাটি বিবেচনা করা যেতে পারে। এখানে কবির কল্পনায় যে চিন্তাটি রূপ নিয়েছে তা হলো এই: বিশ্বের পিছনে এক প্রচ্ছন্ন শক্তি আছেন। তিনি চিরকাল ধরে বিশ্ব রচনা করছেন, বিশ্ব ধ্বংস করছেন। এ যেন দোলা দেবার খেলা, দোলা একবার বাঁদিকে একবার ডানদিকে যায়। এরা দোলার ছন্দ। জন্ম-মৃত্যু, ভাঙা-গড়া সেই ছন্দেব তাল রক্ষা করে। আসলে তো এ খেলা, এ লীলা। যিনি খেলছেন তিনি নিজের ধন নিজেই হবণ করছেন, আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। কাজেই দেওয়া নেওয়া তাঁর কাছে দুইই সমান। তাঁর নিজের ভাষায়:

ডান হাত হতে বাম হাতে লও বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া কী যে কর কেবা জানে।
কোথা বসে আছ একেলা—
সব রবিশশী কুড়ায়ে লইয়া তালে তালে কর এ খেলা।
খুলে দাও ক্ষণ তরে, ঢাকা দাও ক্ষণ পরে—
মোরা কেঁদে ভাবি, আমারি কি ধন কে লইল বুঝি হরে!
দেওয়া নেওয়া তব সকলি সমান সে কথাটি কেবা জানে।
ডান হাত হতে বাম হাতে লও, বাম হাত হতে ডানে।

একই সুর ধ্বনিত হয়েছে 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থের একই নামে চিহ্নিত প্রথম কবিতাটিতে। তবে তাতে একটি বিভিন্ন ভঙ্গি পরিস্ফুট। উপরেব কবিতায় ভাঙা-গড়া দুই যেন সমান মূল্যের বলে দেখান হয়েছে। এখানে সৃষ্ট বস্তুর সংরক্ষণের ইচ্ছাকে দমন করে তাকে ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। গড়া এবং ভাঙা দুটিই প্রয়োজনীয়, দুয়ে মিলে সৃষ্টি-খেলার ছন্দ। এখন শুধু গড়া জিনিসকে নিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকলে যে ছন্দ-পতন ঘটে এবং খেলা থেমে যায়—এই কথাটির উপরই এখানে বেশি জোর

দেওয়া হয়েছে। খেলনা ভাঙাও যে খেলার একটা অঙ্গ, তাও উপলব্ধি করবার প্রয়োজন আছে। স্রষ্টা যেন শিশু ভোলানাথ। তাই তাঁর কাছে এ জিনিস সহজেই আসে, কারণ, তার কাছে কিছুরইতো কোনও মূল্য নাই। কবি তাই তাঁর ভক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এই ভাবে :

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত বলে
নেবে তোর তাণ্ডবের দলে,
দেরে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ওই ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।

এই শিশু ভোলানাথই 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'বোধন' শীর্ষক কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছেন 'নিত্যকালের মায়াবী'তে। এই কবিতার বিষয়টি হলো একটি প্রাকৃতিক ঘটনা—শীতের শেষে বসন্তের আবির্ভাব। শীত হলো প্রকৃতির জরতীর অবস্থা, সে তখন রিক্ত, ক্লান্ত, সর্বহারা। বসন্তের আবির্ভাবে সেই প্রকৃতিই যেন কোন যাদুকরের মায়াকাটির স্পর্শে রাতারাতি সৌন্দর্যের প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই ব্যাপারটি প্রতি বছরেই ঘটে থাকে। তাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আনন্দভাবনা ব্যক্ত করেছেন এই কল্পনা করে যে বিশ্বসত্তা যেন এক মায়াবী, তিনি প্রতিবছর প্রকৃতিকে রিক্ত করে দিয়ে, আবার তাকে সকল সম্ভাব্য আভরণে মণ্ডিত করে, নববরবেশে জয় করে নিতে চান। এই মায়ার খেলা নিত্যকাল ধরে চলেছে; তাই বিশ্বের রচয়িতাকে তিনি নিত্যকালের মায়াবী বলে বর্ণনা করেছেন :

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু আনিবে সে ধরণীতে।

লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নববর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে ফিরে জয় করে নিতে।

এই নিত্যকালের মায়াবীর প্রাচীন সঞ্চিত ধনে ঐকান্তিক অবহেলা। তাই বসন্তে যে ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়, শীতের আঘাতে তাকে তিনি ভেঙে-চুরে নিঃশেষ করে দেন। ভোলানাথ তাই করেন, কারণ, তিনি অকিঞ্চন, তাঁর কাছে তো কিছুরই কোনও মূল্য নাই। এই মায়াবী তাই করেন, কারণ, তিনি মহাশক্তিধর, তাঁর কাছে এমন পরশপাথর আছে, যা মূল্যহীনকে সোনা করবার ক্ষমতা রাখে। একই ভাবনা দুইভাবে প্রকাশ হয়েছে। এই লোকোত্তর প্রতিভাধারী কবির কল্পনা কত বৈচিত্র্যময়। নূতন ভঙ্গিতে তিনি তাই বলছেন :

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার, সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মত ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার,
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গে প্রযোজ্য তৃতীয় ভাবনা হলো সৃষ্টিপ্রবাহকে নৃত্যের সহিত তুলনা করা। পূর্বেই বলা হয়েছে, তাঁর ধারণায় সৃষ্টির প্রবাহকে অবলম্বন করে 'আনন্দ শত শত মূর্তি ধরে' বিকশিত হয়ে উঠে জীবনকে 'নিবিড় সুধায় ভরে দেয়'। এই আনন্দকে আস্বাদ করতে হলে দৈনন্দিন দৃষ্টিভঙ্গির উপরে উঠতে হয়। দৈনন্দিন জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বিখণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি ; তা খণ্ড আকারে বিষয়কে দেখে ; তাই ব্যক্তি-জীবনের সঙ্কুচিত দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে ক্রিয়াশীল। সেখানে আমরা সুখ পাই, দুঃখ পাই, ভালবাসি, রাগ করি, শোকের আঘাতে, মৃত্যুর আঘাতে কষ্ট পাই। কিন্তু যদি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তীর্ণ হতে পারি, তা হলে সুখ-দুখ, প্রীতি-বিদ্বেষ, আশা-নৈরাশ্য প্রভৃতিকে নূতন ভাবে

উপলব্ধি করি। তখন যে অনুভূতি জাগে তাই আনন্দ এবং সুখ দুঃখ প্রভৃতি তার উপাদান হয়ে যায়।

কেমন করে এই বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটে তা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। অন্য প্রসঙ্গে আমি সেটির ব্যবহার করেছি; কিন্তু বিষয়টি বোঝা সহজ করতে তাকে আবার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দুই শ্রেণীর মানুষ ফুটবল খেলা দেখতে যায়। এক শ্রেণী হলো; যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল খেলায় নামবে, তাদের নিজ নিজ সমর্থক দল। আর এক শ্রেণীর দর্শক আছে যারা কোনও দলেব সমর্থক নয়; ভাল খেলা দেখতেই তারা মাঠে যায়। অবস্থার পার্থক্য হেতু এই দুই শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য এসে পড়ে। দুই দলেব নিজ নিজ সমর্থকদের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত; কারণ তারা বিশেষ দলের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। অপর পক্ষে যে নিরপেক্ষ দর্শক তার দৃষ্টিভঙ্গি অখণ্ড: কারণ সে খেলাকে সমগ্রভাবে দেখতে চায়, একটি বিশেষ দলের খেলাকেই শুধু দেখতে চায় না। ফলে প্রথম দল খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে বলে তার সমর্থিত দল হারলে দুঃখ এবং জিতলে সুখ পায়; কিন্তু খেলা জমে উঠলে যে আনন্দ সঞ্জাত হয়, তা তার নাগালের বাহিরে থেকে যায়। অপরপক্ষে, যে দর্শক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুধু খেলা দেখবার আকর্ষণেই খেলা দেখে, তাকে কোনও বিশেষ পক্ষের জয়ের সুখ বা পরাজয়ের দুঃখ স্পর্শ করে না; দুই জড়িয়ে তার কাছে তারা আনন্দের উপাদানে রূপান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করেছেন। তাই দুঃখ ও সুখ জীবন ও মরণকে জড়িয়ে যে প্রাণের ধারা প্রবাহিত, তাকে তিনি 'জন্ম-মরণ খেলা' বলেছেন। প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতাংশটি এই:

এই জন্ম-মরণ খেলায়
মোরা মিলি তাঁরই মেলায়,
এই দুঃখ সুখের জীবন মোদের তাঁরই খেলার ভঙ্গি।[৪০]

৪০. গীতাঞ্জলি, ৩১

সৃষ্টি খেলারূপে কল্পনা করলে যেমন দুটি দল এসে পড়ে, তেমন তাকে নৃত্যরূপে কল্পনা করলে দুটি পদক্ষেপ এসে পড়ে। সেই পদক্ষেপই নৃত্যের ছন্দের তাল রক্ষা করে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন সৃষ্টিধারাকে নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তখন স্রষ্টা নৃত্যপরায়ণ শিল্পীতে পরিণত হয়েছেন এবং সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু তাঁর নৃত্যের ছন্দে পরিণত হয়েছে। এই পরিকল্পনাই পরিণত আকারে তাঁর মনে নৃত্যপরায়ণ নটরাজরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিধারার এমন বর্ণাঢ্য পরিকল্পনা বিশ্বসাহিত্যের কোথাও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করবাব এই যে এই পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনে দুটি অবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছে সৃষ্টি একটি বিরামহীন ধারা, তা নিত্য গতিশীল, তা নিত্য-পরিবর্তনশীল। তাই তাকে তিনি নদীর প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু উপমাটি প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে প্রবাহেব পরিকল্পনা কেবল সৃষ্টিধাবার গতিশীলতাবই পরিচয় দেয়। তাকে অবলম্বন করে, সৃষ্টি ও ধ্বংসকে উপাদান করে নিয়ে যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, তাব পরিচয় দেয় না। তাই তিনি নৃত্যের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। তাতে যেমন গতি প্রকট, তেমন ছন্দ প্রকট এবং সেই ছন্দকে অবলম্বন করে আনন্দ প্রকট।

এই ছোট তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসটুকু তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'চঞ্চলায়'[৪১] লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কবিতাটির বর্ণনীয় বিষয় সৃষ্টি প্রবাহ। এই বিষয়টির প্রকৃতির পরিচয় দিতে কবি পর পর তিনটি ভাবমূর্তি স্থাপন করেছেন। এইরূপে দুবার ভাবমূর্তি পরিবর্তনের কারণ, সৃষ্টিধারার প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা প্রথম দুটির সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বলা যায় না বলে। এইভাবে আমরা দেখি, তিনি সৃষ্টিধারার সঙ্গে প্রথমে নদীর স্রোতের তুলনা করেছেন, তার পর

৪১· বলাকা, ৮, চঞ্চলা

তাকে বিবাগিনী, অভিসারিণী নারীর সহিত তুলনা করেছেন এবং থেমেছেন তাকে নৃত্যপরা অপ্সরীর সাথে তুলনা করে। প্রত্যেকটি কল্পনাই সুন্দর এবং তিনটি জড়িয়ে তাঁর বক্তব্যটি পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনায় সৃষ্টিধারা এক বিরাট নদী, নিত্য প্রবাহিত। তার তরঙ্গের সংঘাতে যে ফেনা জেগে ওঠে তাই হল বস্তু; তার মধ্যে যে ঘূর্ণি আবর্তিত হয় তাতে যে বুদবুদ ফুটে ওঠে, তাই হলো গ্রহ, চন্দ্র, তারকা:

বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা ওঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণ স্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে।
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদবুদের মত।

কিন্তু তাতে কবি তৃপ্তি পান নি। তিনি লক্ষ্য করেছেন, সৃষ্টির মধ্যে শুধু অবাধ গতি নেই, একটি লক্ষ্যও আছে। সৃষ্টিধারা শুধু বৈরাগিনী নয়, নিরুদ্দেশ পথ চলাতেই সে নিযুক্ত নয়: নিশ্চয় কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাব তীব্র আকর্ষণ আছে। সে কি সুদূরের প্রেমের আকর্ষণ? তা হলে ত তিনি অভিসারিণী। সুতরাং নদী পরিবর্তিত হয়েছে অভিসারিকা নারীতে:

অন্তহীন দূর
তোমারে নিরন্তর দেয় সাড়া?
সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘর ছাড়া?
উন্মত্ত সে অভিসারে

তব বক্ষ হাঁরে
ঘন ঘন লাগে দোলা—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;

কিন্তু তাতেও ত কবির তৃপ্তি হল না। কারণ, সৃষ্টিধারা ত শুধু গতি নয়, শুধু বিবাগিনীর নিরুদ্দেশ চলা নয় ; এ ত শিল্প যা গতিশীল। তাই নদী শেষে রূপান্তরিত হল নৃত্যপরা অপ্সরীতে। তার নৃত্যের ছন্দ জীবন ও মৃত্যু :

ওগো নটী, চঞ্চলা অপ্সরী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি।
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যু স্নানে বিশ্বের জীবন।

'বলাকা'র প্রকাশ তারিখ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথের প্রতীকধর্মী নাটক 'রাজা' প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। তখনই মনে হয় বিশ্বসত্তাকে নৃত্যশিল্পীরূপে পরিকল্পনার কথা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল। তার প্রমাণ স্বরূপ তার অন্তর্ভুক্ত একটি সঙ্গীতের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ ॥
হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে।

এখানে সৃষ্টিপ্রবাহকে নৃত্যধারার সহিত তুলনা করা হয়েছে। যে নট নাচেন হাসি-কান্না তাঁর ভূষণ, ভালো-মন্দ তাঁর নৃত্যের ছন্দ, জন্ম-মৃত্যু সে নৃত্যপ্রবাহের অঙ্গ। ফলে যা উপজিত হয় তা আনন্দ। তার উল্লেখও এই সংগীতে আছে। সুতরাং সংক্ষেপে বিশ্বরচনাকে

নৃত্যশিল্প বলে পরিকল্পনা এখানে প্রায় পূর্ণাঙ্গরূপে পরিস্ফুট। তবে কে যে নৃত্য করেন তার সুস্পষ্ট উল্লেখ এখানে নাই। মনে হয় দুটি পরিকল্পনা—একটি প্রবাহিণী নদী ও অপরটি নৃত্যপরায়ণ শিল্পী—এদের মধ্যে একটা দোটানাভাব ছিল। সেটি সুস্পষ্টভাবে প্রকট হয়েছে 'বলাকা'র 'চঞ্চলা' শীর্ষক কবিতায়। শেষে যেন নৃত্যপরায়ণ শিল্পীরূপটিই জিতে গেছে, অর্থাৎ কবির তাকেই বেশী ভাল লেগেছে এবং সেই কারণে এই কবিতায় নদী নটীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিশ্বসত্তার নৃত্যশিল্পীরূপ যে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের মনকে রীতিমতো দখল করে বসেছিল তার পরিচয় পাই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ঋতুরঙ্গ' শীর্ষক গীতিগুচ্ছের মধ্যে। তার পরিকল্পনাটি এইরূপ: বিশ্বসত্তাকে সেখানে নটরাজরূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর নৃত্যে যে আনন্দ উথলিত হয় তারই আকর্ষণে ছয় ঋতুর আবির্ভাব। পরিকল্পনাটি নূতন নয়, পুরাতন; 'গীতাঞ্জলি'র একটি কবিতায় তাকে আভাসে পাওয়া যায়[৪২]। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই:

সেই আনন্দ চরণ পাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরণ গীতে গন্ধেরে।

এই চিন্তাই 'ঋতুরঙ্গে' সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এর সঙ্গীতগুলির মধ্যে নটরাজের ভাবমূর্তি পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভ করছে। 'রাজার' সঙ্গীতে যিনি অনির্দিষ্ট সত্তারূপে 'কে' সর্বনাম দ্বারা চিহ্নিত, তিনি এখানে নটরাজরূপে পরিকল্পিত হয়েছেন। সৃষ্টিধারা তাঁর নৃত্য। সুখ দুঃখ সে নৃত্যের তাল। সেই তালে যে মাধুর্য উচ্ছলিত হয়ে উঠল, তাই জড় অণুকে জ্যোতির মঞ্জীরা পরিয়ে চন্দ্র-ভানুতে রূপান্তরিত

৪২. গীতাঞ্জলি, ৩৬

করল। তা হতে যে প্রাণশক্তি মথিত হয়ে উঠল তাই যুগে যুগে কালে কালে বিশ্বের প্রাণের বিকাশ ঘটাল। প্রাসঙ্গিক অংশটি এই : "

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি মঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।
তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখ দুঃখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।

চার

উভয় চিন্তার তুলনা

উপনিষদের ও রবীন্দ্রনাথের আনন্দতত্ত্বের ব্যাখ্যা যথাক্রমে উপরে স্থাপিত হয়েছে। এখন আমরা বিচার করে দেখতে পারি এই দুই চিন্তার সাদৃশ্য কতখানি। বলা বাহুল্য যে সর্বক্ষেত্রেই চিন্তাদুটির মধ্যে সাদৃশ্য এত সুস্পষ্ট যে তা নিয়ে বিচার করার কোনও প্রয়োজন থাকে না। আমরা অনায়াসে বিনা দ্বিধায় এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এই দুই চিন্তায় কোনও পার্থক্য নেই; একটি অন্যের অনুসরণ করেছে। উভয়ের পরিকল্পনা একই। উভয়েরই বক্তব্য এই যে যিনি ছিলেন একক দ্বৈতহীন সত্তা তিনি অকারণে, আনন্দ আস্বাদনের জন্য নিজের উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে সৃষ্টির ধারারূপে প্রকাশ নিলেন। কারণ, বিশ্বসত্তা শিল্পী, বিশ্ব হল তাঁর শিল্প। তিনিই একাধারে শিল্পী, শিল্প ও শিল্পরসিক। তাই বিশ্বসত্ত্বই আনন্দ। উপনিষদে বর্ণিত বরুণের পুত্র ভৃগুর মতো রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করেছিলেন আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিকল্পনাও উভয় চিন্তায় একই। আনন্দ আস্বাদনের জন্য চাই ব্যাপক, অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু আনন্দের উপাদান। খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে দুঃখের আঘাত আছে, সুখের তৃপ্তি আছে; কিন্তু অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ভেদ অর্থহীন, কারণ

তারা আনন্দের উপাদান হয়ে যায়। সেই জন্যই উপনিষদ বলতে পারে, আনন্দের আকর্ষণেই জীব জন্মগ্রহণ করে, আনন্দের আকর্ষণেই সে মৃত্যুর মধ্যে লয় হয়। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন, নৃত্য পরায়ণ নটরাজের ভালের ভূষণ হলো হাসি-কান্না।

দুই চিন্তার মধ্যে যেটুকু পার্থক্য লক্ষিত হয় তা হলো বর্ণনার ভঙ্গিতে। উপনিষদের ঋষিও কবি ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও কবি ছিলেন। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যশক্তি অনন্য-সাধারণ। এমন শক্তিধর কবি বোধ হয় বিশ্বে আর দ্বিতীয় পাওয়া যাবে না। কাজেই উপনিষদে যে চিন্তা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, সে চিন্তা রবীন্দ্রনাথের লেখনীর গুণে আরও বর্ণাঢ্য রূপ পেয়েছে। উপনিষদে যেখানে সৃষ্টিপ্রবাহকে আনন্দরূপ এবং অমৃতরূপের প্রকাশ বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবনীশক্তি ও কল্পনাশক্তি তাকে নানাভাবে আরও চিত্তাকর্ষক করে বর্ণনা করেছে। যা বিমূর্ত আকারে উপনিষদের ভাষায় রূপ পেয়েছে, তা উপমা প্রয়োগের কৌশলে কোথাও খেলা, কোথাও যাদু, কোথাও নৃত্যরূপে বর্ণিত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে।

এ হলো বাহিরের বিষয়, গৌণ বিষয় ; মূল কথা হলো একই চিন্তা উভয়ক্ষেত্রে প্রকট হয়েছে। ঠিক বলতে কি এই পরিকল্পনায় আনন্দ-তত্ত্বের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় উপনিষদের অত্যন্ত কাছে চলে এসেছেন। তার প্রমাণস্বরূপ ভাষার ও ভাবের আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কেবল দুটি উদাহরণ এখানে স্থাপন করলেই যথেষ্ট হবে।

প্রথমে মুণ্ডক উপনিষদের সেই বিখ্যাত বাণীটির উল্লেখ করা যেতে পারে :

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি[৪৩]

৪৩. মুণ্ডক ॥২॥৭

এর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই বচনটির :

দিকে দিকে আজ টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া[৪৪]

সাদৃশ্য এত সুস্পষ্ট যে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাণীটি আছে : মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥৬॥৩॥৬

তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি :

এ দ্যুলোক মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্র খানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।[৪৫]

এখানে উপনিষদের ভাষা কবির মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব হৃদয় ও মনীষা দিয়ে যে তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, তা যে উপনিষদের ঋষির দেওয়া তত্ত্ব, সে বিষয় তিনি নিজেও অবহিত ছিলেন মনে হয়। তাঁর নীচে উদ্‌ধৃত মন্তব্য হতে তার সমর্থন পাওয়া যাবে :

'আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈতরূপ, তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।[৪৬]

৪৪. গীতাঞ্জলি, ১৩ ৪৫. আরোগ্য, ১ ৪৬. আত্মপরিচয়

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্যু ও অমৃত

এক

মৃত্যুরহস্য

মানুষের জীবনে যতগুলি অভিজ্ঞতা আছে, তাদের মধ্যে মৃত্যুশোক নিশ্চিত সবার থেকে বড় আঘাত। ঘটনাটি যেমন আকস্মিক বলে মনে হয় তেমনি তা রহস্য-আবৃত। একটি জীবন্ত মানুষ হাসছে, গল্প করছে, কাজ করছে; কিন্তু হঠাৎ যখন মৃত্যু এসে তার জীবনদীপ নির্বাপিত করে দিল তখন সে মানুষটির আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন তার দেহ নিতান্তই জড় পদার্থের মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজনের মনে তা কি প্রচণ্ড আঘাত হানে তার বিষয় সকল বয়স্ক মানুষেরই অভিজ্ঞতা আছে।

মৃত্যু যে মানুষের চোখে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার কারণ বোধ হয় দুটি। প্রথমতঃ যার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক আছে, যে একান্ত আপনজন তাকে চিরকালের জন্য হারিয়ে বসলাম—এই উপলব্ধি মনে প্রচণ্ড আঘাত হানে। এই চিরস্থায়ী বিচ্ছেদবোধ হতে যে প্রচণ্ড দুঃখবোধ মানুষের মনকে নিপীড়িত করে, তার বোধহয় অন্য কোনও শোকের সঙ্গে তুলনা হয় না। তাই দেখি তাকে অবলম্বন করে বিশ্বের নানা সাহিত্যে হৃদয়-গ্রাহী কত কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। শেলীর 'এডোনেইস', টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' তার উদাহরণ। কালিদাসের কাব্যে অজের বিলাপ এবং রতির বিলাপ তাই এত গভীরভাবে আমাদের মনকে স্পর্শ করে। বাংলা সাহিত্যে সরযূবালা দাশগুপ্তা রচিত 'বসন্ত-প্রয়াণ'ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় রচিত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত

'এষা' কাব্যগ্রন্থ বা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রচিত 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত মৃত্যুর পর যে লোকটি ছিল সে থাকে কি না, এ বিষয় নানা প্রশ্ন জাগে; কিন্তু তার উত্তর মেলে না। জীবনের উপর মৃত্যু যখন যবনিকা টেনে দেয়, তখন তার ওপারে কি ঘটছে তা জানবার উপায় নাই। আমরা নানা কল্পনা করতে পারি; কিন্তু সে কল্পনার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নাই: মৃত্যুর পর কি হয় তা জানবার আগ্রহ মানুষের একটি মূল কৌতূহলের বিষয়। তা অনন্তকাল ধরে উত্থাপিত হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতে উত্থাপিত হবে। গীতায় অবশ্য বলা হয়েছে বিষয়টি আমাদের বোধশক্তির নাগালের বাইরে, তা অব্যক্ত। আমরা কোথা হতে আসি তাও যেমন জানি না, তেমন মৃত্যুর পর কোথায় যাই, তাও জানি না: উভয়েই অব্যক্ত, কেবল মাঝের অংশটি নিয়ে যে জীবন রচিত তাই ব্যক্ত।[1]

কঠ উপনিষদে এই প্রশ্ন একটি সুন্দর কাহিনীর মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয়েছিল। সেটি সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বরং তা নানাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় বর্তমান গ্রন্থে বার বার আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। সংক্ষেপে কাহিনীটি এই। নচিকেতার পিতা ঔদ্দালক আরুণি দুগ্ধবতী নয় এমন বৃদ্ধা গাভী দান করছেন দেখে প্রতিবাদ করায় পিতা রাগের মাথায় বললেন, তোমায় যমকে দেব। ফলে নচিকেতা যমের বাড়ি আনীত হলেন, কিন্তু পিতার প্রতি অভিমান-হেতু উপবাসী রইলেন। অতিথি উপবাসী থাকলে অকল্যাণ হয় এই বিবেচনায়, যম তাঁকে অন্নগ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন এবং অতিরিক্তভাবে অনুরোধ রাখলে তিনটি বর দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বর হিসাবে নচিকেতা যা-যা চাইলেন তাদের অন্যতম হল মৃত ব্যক্তির কি অবস্থা হয় জানতে। প্রশ্নটি এখানে নচিকেতার

১. অব্যক্তাদীনি ভূতানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥
—গীতা ॥২।২৮

মুখের ভাষাতেই স্থাপন করা যেতে পারে :

'এই যে মৃত ব্যক্তির বিষয় মানুষের সংশয়, কেউ বলে সে থাকে, কেউ বলে থাকে না, এ বিষয় বিদ্যা আপনার নিকট শিক্ষা করব—এই হলো আমার তৃতীয় বর।'[২]

কিন্তু যম এ বিষয় তাঁকে নিরুৎসাহ করবার জন্য নানা লোভ দেখালেন। নচিকেতা তবু অটল রইলেন। যম তখন খুশী হয়ে তাঁকে মৃত্যু সম্বন্ধে এবং শ্রেয়তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

এই কাহিনীর মূল সূত্র বহু প্রাচীন। ঋগ্‌বেদেও যম এবং নচিকেতার সাক্ষাৎকারের উল্লেখ আছে।[৩] তবে তা খুব সংক্ষিপ্ত; সেখানে মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নের উল্লেখ নাই। তাতে শুধু বলা হয়েছে, পিতার নির্দেশে নচিকেতা পিতৃলোকে গিয়েছিলেন এবং যম সেখান থেকে তাঁকে পিতৃগৃহে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং উপনিষদের কাহিনী তুলনায় অনেক সুন্দর, যেমন কাব্যগুণে সমৃদ্ধ, তেমন তত্ত্বকথায় মহিমান্বিত।

আমরা দেখব এই প্রশ্ন উপনিষদের ঋষির মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। তা নিয়ে বিভিন্ন উপনিষদে আলোচনা করা হয়েছে এবং মৃত্যুর তাৎপর্য কি তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে, অতিরিক্তভাবে এই রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ ঘটবে।

অপর দিকে দেখি রবীন্দ্রনাথের মতো দার্শনিক-দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন কবির মনেও প্রশ্নটি বার বার উঠেছে। তাঁর জীবনে মৃত্যু বার বার দেখা দিয়েছে, অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের তাঁর কাছ হতে নির্মমভাবে সরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং মৃত্যুরহস্য ভেদ করবার ইচ্ছা তাঁর মনে বার বার উদয় হয়েছে। তাই দেখি তাঁর কাব্যে অতি তরুণ বয়স হতে

২. যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ। কঠ ॥১॥১॥২০

৩. ঋগ্‌বেদ ॥১০॥১৩৫

জীবনের সায়াহ্ন কাল পর্যন্ত মৃত্যু সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা আছে। এই সম্বন্ধে তাঁর পরিণত চিন্তায় একটি সমাধানও স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর সেই চিন্তাগুলিকে সুসংবদ্ধ আকারে সংগ্রহ করে আমাদের স্থাপন করতে হবে। তবেই আমরা প্রস্তুত হব মৃত্যু সম্পর্কিত উপনিষদের চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা করতে।

আলোচনার শেষে আমরা দেখব এই প্রশ্নের সম্বন্ধেও উভয়ের চিন্তা অত্যন্ত কাছাকাছি এসে গেছে। আনন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে সে কথা এখানেও খাটে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তা যেন উপনিষদের চিন্তার প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। তাঁর ভাষায় নতুন ভঙ্গিতে প্রাচীন ঋষির বাণীই যেন শুনতে পাই। প্রস্তুতি হিসাবে এইটুকু বলেই আমরা মূল আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারি।

দুই

উপনিষদের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা

এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখব উপনিষদের বচনে 'মৃত্যু' ও 'অমৃত' এই শব্দ দুটি একযোগে হোক, পৃথক ভাবে হোক বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। মৃত্যুর অর্থে কি বুঝি সে সম্বন্ধে অস্পষ্টতা নাই। জীবনের তা বিপরীত। তাদের সহাবস্থিতি সম্ভব নয়। জীবনের যখন সমাপ্তি ঘটে তখন মৃত্যুকে পাই। অমৃত শব্দের অর্থ কিন্তু সুস্পষ্ট নয় এবং দেখা যায় উপনিষদের বাণীতে এবং অন্যত্র বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং উপনিষদে ব্যবহৃত 'অমৃতে'র অর্থ কি সে বিষয়ে আমাদের বিশ্লেষণ করে জানা উচিত।

সোজাসুজি অমৃত অর্থে বুঝি যা জীবিত। যা মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হয় না তাকে সাধারণ ভাষায় অমৃত বলি না, বলি অমর বা অমর্ত্য। যা মরণশীল তাই মর বা মর্ত্য। সুতরাং যা মরে না তাই অমর বা

অমর্ত্য। কিন্তু অমৃতের অন্য অর্থও আছে।

আমরা জানি উপনিষদোত্তর যুগে অমৃত শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মেদিনী মুক্তি অর্থে তাকে ব্যবহার করেছেন এবং পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সমুদ্রে মন্থন করে যা পাওয়া গিয়েছিল এবং যা পান করে দেবতারা অমর হয়েছিলেন তাকে ও অমৃত বলেছেন। প্রাচীন উপনিষদের যুগে এই দুটি অর্থের কোনটিই ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, তা ছিল বেদের জ্ঞান কাণ্ডের যুগ। তখনও পরজন্মবাদ এবং পরজন্মতত্ত্ব তার বর্তমান রূপ গ্রহণ করে বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয় নি; এ বিষয় একটি অস্ফুট ধারণা মাত্র বীজাকারে ছিল। কাজেই মুক্তির আকৃতি সে যুগে জাগে নি। প্রাচীন উপনিষদগুলিতে মুক্তি শব্দটির প্রয়োগ কোথাও দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, সে যুগে পুরাণগুলি রচিত হয় নি। কাজেই পৃথিবীকে দোহন করে যে অমৃত পাওয়া গেল এবং দুর্বাসার শাপে সমুদ্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত হলো এবং দেবতারা অসুরদের সাহায্যে তাকে মন্থন করে খেয়ে অমর হলেন, সে অমৃতের সঙ্গে উপনিষদের ঋষির পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

উপনিষদে 'অমৃত' শব্দটি দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম অর্থ হলো অমর্ত্য হওয়া অর্থাৎ মৃত্যুর অধীনতা হতে মুক্ত হওয়া। দ্বিতীয় অর্থে তা আনন্দের সমার্থবোধক। কোথায় কোন্ অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে তা নির্ধারিত হবে যে প্রসঙ্গে তা ব্যবহার হয়েছে তা হতে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে।

অমৃতের অমর্ত্য অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনীতে। যেখানে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করেছিলেন, যদি সমগ্র পৃথিবী বিত্তে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হয়, তা হলে কি তিনি 'অমৃতা' হবেন? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন বিত্তের দ্বারা 'অমৃতত্বে'র আশা করা যায় না[৪]।

৪. অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি। বৃহদারণ্যক ॥২॥৪॥২ ও ৪॥৫॥৩

কাহিনী হতেই বোঝা যায় এখানে অমৃত শব্দটি মৃত্যুহীন বা অমর্ত্য বা অমর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অমৃতকে আনন্দ অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত উপনিষদে অনেক আছে। ঠিক বলতে কি আনন্দের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবেই সেখানে তার ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করব যে প্রাচীন উপনিষদে আত্মা, ব্রহ্ম, অমৃত ও আনন্দকে পরস্পরের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তার কারণ খুঁজতে হলে আমাদের উপনিষদের দৃষ্টি ভঙ্গির কথা উত্থাপন করতে হয়। উপনিষদের ধারণায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকট বিশ্ব ও মূল সত্তা একই। তিনিই অহেতুক আনন্দ আস্বাদনের জন্য নিজেকে সৃষ্টিপ্রবাহরূপে পরিবর্তিত করছেন। ফলে তিনি একাধারে বিশ্বের উপাদান কারণ, রূপ কারণ এবং উদ্দেশ্য কারণ। উদ্দেশ্য আনন্দ উপলব্ধি। আনন্দ উপলব্ধি হয় শিল্পের রস গ্রহণ করে। সুতরাং সৃষ্টি শিল্পও বটে। কাজেই মৌলিক সত্তা একাধারে শিল্প, শিল্পী, শিল্পরসিক এবং অমৃত বা আনন্দ। বিশ্বসত্তা প্রচ্ছন্নভাবে সকল জড় ও চেতন পদার্থের মধ্যে বিরাজ করেন বলে তিনি আত্মা। যা নিজেকে গোপন রেখে কাজ করে তাই আত্মা। তিনি বর্ধিত হয়ে বিশ্বরূপে প্রকট হন বলে ব্রহ্ম। তিনি বিশ্ব রচনা করে নিজেকে শিল্প বস্তুতে পরিণত করেন বলে তিনি অমৃত। এখানে অমৃত রসের প্রতি-শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার আস্বাদনে আনন্দ উপলব্ধি হয় বলে তিনি আনন্দও বটে। এইভাবে অমৃত ও আনন্দ এক রকম সমার্থবোধক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের এই বচনটি লক্ষ্য করা যেতে পারে;

"যিনি সকল জীবের মধ্যে অবস্থিত থেকেও তাদের থেকে পৃথক, যাঁর (উপস্থিতি) বিভিন্ন জীবেরা লক্ষ্য করে না, যাঁর সকল জীব শরীর স্থানীয়, যিনি সকল জীবের অভ্যন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রিত

করেন, তিনি হলেন তোমার সেই অন্তর্যামী অমৃত, আত্মা।"[৫]

উপরের উদ্ধৃত বচনে আত্মা যে ব্রহ্মের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বেশ সুস্পষ্ট। তা না হলে তাঁকে সকল জীবের অন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন বলে বর্ণনা করা হত না। তিনি সকল জীবের অন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন বলেই অন্তর্যামী, আর তিনি নিজেকে এমনভাবে গোপন রাখেন যে জীবেরা তাঁর অবস্থিতি লক্ষ্য করে না ; তাই তিনি আত্মা। সেই আত্মা বা ব্রহ্মকে এই বচনে আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আত্মাকে কেন অমৃত বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা মিলবে আর একটি প্রাসঙ্গিক শ্লোকে। যা শুধু সুখ দেয় না, যা অত্যন্ত উল্লাস দেয় তাকেই অমৃত বলি। তা শুধু প্রজ্ঞা নয়, হৃদয়বৃত্তিকেও আলোড়িত করে, তা চন্দনের প্রলেপের মতো হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে। এই বোধ বা অনুভূতিকে জ্ঞাপন করতে আমরা সাধারণত দুটি শব্দের ব্যবহার করি। যে বিষয় মনকে এমন অনুভূতি দ্বারা সম্পৃক্ত করে তাকে মধুর বলি বা অমৃত বলি। এই অর্থে হৃদয়কে স্পর্শ করে এমন বচনকে মধুর বলি বা অমৃতময় বলি। যাকে মধুর বলি তাকে মধুও বলি, কারণ তা মাধুর্যের আস্বাদ দেয়। অনুরূপভাবে যাকে অমৃতময় বলি তাকে অমৃতও বলি, কারণ তা অমৃতের আস্বাদ দেয়। এই অর্থেই বলি যিনি মিষ্ট কথা বলেন তাঁর বচনে মধু। এই অর্থেই সংস্কৃতে একটি বচন প্রচলিত আছে, 'অমৃতং বালভাষিতম্', শিশুর বচন অমৃতস্বরূপ। আমরা দেখব যাকে এইভাবে মধুময় বলা যায়, তাকেই মধু বলা যায়, যাকে অমৃতময় বলা হয়েছে তাকে অমৃত বলা হয়েছে।

আমরা এখনি উল্লেখ করেছি যে উপনিষদে সাধারণ ক্ষেত্রে আত্মাকে ব্রহ্মের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এও

৫. যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩॥৭॥১৫

জানি পুরুষ শব্দটিও ব্রহ্মের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেই ব্রহ্ম বা পুরুষ যেমন মানুষের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে বিদ্যমান তেমন বহিঃপ্রকৃতিতেও প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজমান। উপনিষদ বলে উভয় রূপেই তিনি মধুস্বরূপ বা অমৃতস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে নীচের বচনটি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

'এই পৃথিবী সকল জীবের নিকট মধুস্বরূপ। এই পৃথিবীর কাছে সকল জীব মধুস্বরূপ। এই পৃথিবীতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আছেন এবং এই শরীরের অভ্যন্তরে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আছেন, ইনিই তিনি, যিনি হলেন আত্মা, অমৃত, এই ব্রহ্ম, এই সব কিছু।[৬]

এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে যে সত্তা মানুষের অভ্যন্তরে আছেন এবং বাহিরে আছেন তাঁকে যুগপৎ পুরুষ, আত্মা, ব্রহ্ম ও অমৃত বলা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে বলা হয়েছে তিনি একাধারে তেজোময় ও অমৃতময়। অশেষ শক্তি ধারণ করেন বলে তিনি তেজোময় ও অমৃতস্বরূপ বলে তিনি অমৃতময়। বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়। বিশ্বের মধ্যে ব্যক্ত রূপ তেজেরই পরিবর্তিত রূপ এবং অমৃতের পরিবর্তিত রূপ।

এইবার আর একটি বচন এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'আনন্দরূপ এবং অমৃতরূপে যিনি বিভাসিত হয়েছেন তাঁকে ধীর ব্যক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে উপলব্ধি করেন।[৭]

এখানে বিজ্ঞানের অর্থ হলো বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ পরাবিদ্যা। উপনিষদের ব্যাখ্যায় পরাবিদ্যা হলো তাই যা যিনি বিশ্বকে অখণ্ড রূপ দিয়ে বিশেষের যোগসূত্র হিসাবে বিরাজমান তাঁর বিদ্যা দেয়।

সুতরাং আমরা দেখি ব্রহ্মকে আনন্দও বলা হয়েছে এবং অমৃতও

৬. ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্। বৃহদারণ্যক ॥২॥৫॥১

৭ তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। মুণ্ডক ॥২॥৫॥১

বলা হয়েছে। তার কারণটি বুঝতে আমাদের পূর্বে উদ্‌ধৃত তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি বচনের পুনরায় উদ্ধৃত করতে হবে। তাতে বলা হয়েছে 'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি', তিনি রসস্বরূপ, তিনি রস আস্বাদ করে আনন্দে রূপান্তরিত হন। এখানে রস শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনও শিল্পবস্তুর মধ্যে যে সুষমা বিরাজ করছে তাকে আস্বাদ করে আমরা আনন্দ পাই। শিল্পে বিধৃত এই সুষমাকে রসও বলা হয়; কারণ তার পরিচয় পেয়ে মন রসিত বা রসে আপ্লুত হয়। এখানে শিল্পবস্তু, তার আশ্রিত সুষমা বা রস এবং তাকে আস্বাদন করে যে রসানুভূতি বা আনন্দানুভূতি, সবই এক হয়ে গেছে। সুতরাং বিশ্বশিল্পরূপী ব্রহ্মকে রস বলে ধারণা করতে উপনিষদের ঋষির বাধে না। রস হতেই রসোপলব্ধি এবং তা হতেই অমৃত বা আনন্দ আস্বাদ হয় বলে রস বা অমৃত বা আনন্দকে এক বলতেও বাধে না। যিনি শিল্প, তিনিই শিল্প রসিক। তাই শিল্পরূপে তিনি রস এবং শিল্পরসিকরূপে তিনি আনন্দ আস্বাদন করে 'আনন্দী ভবতি'। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে উপনিষদের একটি চিন্তায় অমৃত আনন্দের সমার্থবোধক হয়ে গেছে।

উপনিষদে মৃত্যু ও অমৃত সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। এক পর্যায়ে বলা হয়েছে মৃত্যু আছে, কিন্তু মৃত্যু ব্রহ্ম বা আত্মাকে স্পর্শ করে না। আর এক পর্যায়ে বলা হয়েছে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েও আনন্দ বা অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মের দুটি অবস্থার কথা এসে পড়ে। প্রথম হলো অমূর্ত বা দ্বিতীয়বিহীন একক অবস্থা। তা হলো সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবর্তিত হবার পূর্ব অবস্থা। দ্বিতীয় হলো ব্রহ্মের প্রকট রূপের অবস্থা। সেখানে তিনি বহু দ্বারা খণ্ডিত এবং বিচিত্রিত। ব্রহ্মের অমূর্ত অবস্থায় মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, কারণ সে অবস্থায় তিনি সৃষ্টিপ্রবাহের বহির্ভূত এবং তাঁকে বিশেষণ দিয়ে ভূষিত করা যায় না। দ্বিতীয় অবস্থায় দ্বৈতভাব আরোপিত হওয়ায় তাতে

বহু আছে, সৃষ্টির প্রবাহ আছে, কাজেই স্থান-কালের প্রভাব আছে। এই অবস্থায় মৃত্যু আছে, কিন্তু অমৃত বা আনন্দের উপাদানরূপে তা বর্তমান। বিশ্বশিল্প ততটা চিত্রশিল্পের মত কেবল স্থানাশ্রয়ী শিল্প নয়, তা কালাশ্রয়ী শিল্পও বটে। সেই অর্থে তাকে নাট্যের সঙ্গে বা ছায়া শিল্পের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিশ্বনাট্যে নানা ঘটনার সংঘাত আছে; নানা অভিজ্ঞতা, সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, জন্ম-মৃত্যু সে অভিজ্ঞতার অঙ্গ। এখানে মৃত্যু আছে কিন্তু অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তার দাহিকা শক্তি থাকে না, তা আনন্দ অনুভূতির অঙ্গ হয়ে যায়। এই হলো উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

সুতরাং আমরা দুই পর্যায়ে আলোচনা করব। প্রথমে ব্রহ্মের অমূর্ত রূপের কথা ধরা যাক। এই বচনটি হতে দেখা যাবে ব্রহ্মের দুই অবস্থার দুটি রূপের উল্লেখ করা হয়েছে:

ব্রহ্মের দুটি রূপ, মূর্ত এবং অমূর্ত, মর্ত্য এবং অমৃত, স্থির এবং গতিশীল, সত্তাবান এবং সত্তাহীন।[৮]

স্পষ্টতঃই এখানে সৃষ্টিপূর্ব বীজসত্তা অবস্থায় অবস্থিত ব্রহ্মের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সৃষ্টিরূপে তাঁর গতিশীল মূর্ত প্রকাশের সহিত সেই বীজ অবস্থার তুলনা করা হয়েছে। অমূর্ত অবস্থায় ব্রহ্ম মরণশীল নয়, কারণ সেখানে তিনি একক এবং অদ্বিতীয় বীজ সত্তারূপে অবস্থিত; কাজেই তিনি স্থাণু, গতিশীল নন। অপরপক্ষে বিশ্বরূপে প্রকট অবস্থায় তিনি সৃষ্টির ধারার মধ্যে গতিশীল। অমূর্ত অবস্থায় তিনি স্থানকালে বিধৃত নন, তাই তিনি সত্তাবান নন, অথচ প্রকট বিশ্বরূপে তিনি স্থান-কালে বিধৃত হয়ে সত্তাবান্।

এই অমূর্ত রূপের খুব সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ একটি বর্ণনা আমরা পাই কঠ উপনিষদে। সেখানে বলা হয়েছে, এই অবস্থায়

৮. দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ বৃহদারণ্যক ।২।৩।১

তিনে 'শব্দগুণহীন, স্পর্শগুণহীন, রসগুণহীন, গন্ধগুণহীন, আদিহীন এবং অন্তহীন'।[৯]

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এখানে নেতিবাচক ভাষায় তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ এখানে তিনি বীজরূপী অব্যপদেশ্য সত্তা। সেই কারণে তাঁর ওপর কোনও গুণ আরোপ করা যায় না; তাঁকে কোনও বিশেষণ দিয়ে ভূষিত করা যায় না। সেই জন্যই বলা হয়ে থাকে এই বীজ অমূর্ত আত্মাকে নেতিবাচক কথা দিয়ে ধারণা করা ছাড়া উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই বচনটি দেখা যেতে পারে:

'এই আত্মা এ নয় ও নয়। তিনি অগৃহ্য, তাই তাকে গ্রহণ করা যায় না: অশীর্য, তাই তাঁকে শীর্ণ করা যায় না; তিনি অসঙ্গ, তাই তাঁকে সঙ্গ দেওয়া যায় না: তিনি অনুভূতিহীন, তাই তাঁকে ব্যথা দেওয়া যায় না, তাঁকে বিনাশ করা যায় না।'[১০]

এই অমূর্ত অবস্থায় ব্রহ্ম স্থান কালে বিধৃত নন: কাজেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্বে অবস্থিত বস্তুর যে গুণগুলি আছে তাদেব তাঁর ওপর প্রয়োগ করা যায় না। সৃষ্টিপ্রবাহে সৃষ্টি আছে, ধ্বংস আছে, পরিবর্ধন আছে, ক্ষয় আছে: কিন্তু যেহেতু তিনি স্থান-কালের ঊর্ধ্বে তাঁর ক্ষয় নেই। সেইজন্য তাঁকে অক্ষয় বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাই তাঁকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

'তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বললেন: গার্গি, এই হলেন সেই অক্ষর যাঁর সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন যে তিনি অস্থূল, অণু নয়, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, তৈলগুণসম্পন্ন নন, বায়ু নন, আকাশ নন তিনি সঙ্গহীন, রসহীন, গন্ধহীন, চক্ষুহীন, শ্রোত্রহীন, বাক্যবর্জিত, মনবর্জিত, তেজ-

৯ অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥ অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্ ॥ কঠ ।১।৩।১৫

১০ এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি সজ্জতেঽসিতো ন ব্যথ্যতে ন রিষ্যতি ॥ বৃহদারণ্যক ।৪।২।৪

বর্জিত, প্রাণহীন, মুখহীন, মাত্রাহীন, ছিদ্রহীন, তাঁর বাইরে অভিব্যক্তি নাই, তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না, তাঁকেও কেহ ভক্ষণ করে না'।[১১] সুতরাং বোঝা যায় যে এই অমূর্ত অবস্থা হলো ব্রহ্মের সৃষ্টি পূর্ব অবস্থা। যেহেতু সে অবস্থায় তিনি সৃষ্টিপ্রবাহের অঙ্গীভূত নন, সেহেতু তিনি স্থান-কালের অতীত, জন্ম মৃত্যুর অতীত, জরা তাঁকে স্পর্শ করে না, তিনি না ভোগ্য না ভোক্তা : এই জন্যই তাঁকে অক্ষর বলা হয়েছে। এই জন্যই তাঁকে বিমৃত্যু বলা হয়েছে। সেই জন্যই অন্যত্র বলা হয়েছে, এই অবস্থায় তাঁকে অহোরাত্রি অতিক্রম করে না, জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত, দুষ্কৃত এরাও তাঁকে স্পর্শ করে না।[১২]

কঠ উপনিষদে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে ব্রহ্মের এই অমূর্ত বা অক্ষর অবস্থায় তিনি মৃত্যুদ্বারা স্পৃষ্ট হন না, কারণ তিনি জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। নচিকেতা যমকে যে প্রশ্ন করেছিলেন প্রেতাত্মার মৃত্যুর পর কি হয় তাই তাঁকে বলতে হবে; সেই প্রসঙ্গেই যম এই কথাগুলি বলেছিলেন। তবে জীবাত্মা সম্বন্ধে এই উক্তি করা হয়নি। নচিকেতা কথোপকথনের মধ্যে তাঁর প্রশ্ন পরিবর্তিত করেছিলেন। সেই বিশেষ প্রশ্ন প্রসঙ্গে এই কথাগুলি নচিকেতা বলেছিলেন - 'ধর্মের ঊর্ধ্বে, অধর্মের ঊর্ধ্বে, এই কৃত অকৃত সমন্বিত (সংসারের) ঊর্ধ্বে যা দেখতে পান তাই আমাকে বলুন।'[১৩]

এই প্রসঙ্গেই যম যাঁকে অক্ষর বলা হয়েছে তাঁর কথা উল্লেখ করে তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন এই অক্ষর ব্রহ্ম নিত্য এবং শাশ্বত, তিনি মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

১১. স হোবাচৈতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বম-দীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্ক-মশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩॥৮॥৮

১২. নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্। ছান্দোগ্য ॥৮॥৪॥১

১৩. অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ ॥ অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ ॥ কঠ ॥১॥২॥১৪

'এই প্রজ্ঞাময় সত্তা জন্মান না, মরেন না, ইনি (স্থানে) কোথাও অবস্থিত নন, ইনি কোথাও অতীতে ছিলেন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, শরীর হত হলেও তিনি হত হন না।'[১৪]

এইভাবে দেখা যায় ব্রহ্মের দুটি রূপের প্রসঙ্গে যেটি অমূর্ত রূপ সে সম্বন্ধে উপনিষদে বলা হয়েছে যে সে অবস্থায় তিনি মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হন না। কারণ, যে ভাবে এইরূপ কল্পিত হয়েছে সেখানে মৃত্যুর অনুপ্রবেশের সুযোগ নাই। এখানে ব্রহ্ম স্থান-কালের উর্ধ্বে, সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে জড়িত নন ; একক, অসঙ্গ, বিমূর্ত সত্তা। এটি সৃষ্টি-পূর্ব অবস্থা। কাজেই এখানে জন্ম-মরণ, সুখ-দুঃখ, ভোক্তা-ভোগ্য প্রভৃতির আবির্ভাবের অবকাশ নাই। এখানে তিনি স্থাণু এবং সেই কারণেই অক্ষর।

এখন আমরা ব্রহ্মের মূর্ত অবস্থায় মৃত্যু ও অমৃতের কি সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছে তার আলোচনা করতে পারি। তার প্রস্তুতি হিসাবে আমরা এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আনন্দতত্ত্বের ব্যাখ্যায় যা বলেছি তার সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করতে পারি। একক অসঙ্গ ব্রহ্ম রস-অভিলাষী হয়ে এই সৃষ্টি প্রবাহ প্রবর্তিত করলেন। তখন বহু বিচিত্র বস্তুর সমাবেশে গঠিত এই বিশ্ব এল। তারা পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধে যুক্ত হল। মানুষের মনে চেতনা এল। তার সুখবোধ এল, দুঃখবোধ এল। জন্ম এল, মৃত্যু এল। তার মৃত্যুশোক এল।

এখন এই পরিবেশে মৃত্যু এবং অমৃতের সম্বন্ধটি উপনিষদের পরিকল্পনায় কি রকম দাঁড়ায় তা দেখে নিতে হবে। সৃষ্টিপ্রবাহই ব্রহ্মের মূর্ত রূপ। যখন সৃষ্টি আছে, তখন ধ্বংসও আছে। যখন জন্ম আছে, তখন মৃত্যুও আছে। যখন সুখ আছে, তখন দুঃখও আছে। উপনিষদে এ সবই স্বীকৃত। কাজেই ব্রহ্মের মূর্তরূপে মৃত্যু যে আছে তাও স্বীকৃত। কিন্তু তা বলে অমৃত যে নেই, তা নয়।

১৪. ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ॥ অজো নিত্যঃ শাশ্বতো হয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ কঠ ১॥২॥১৮

তার কারণ এখানে অমৃত আনন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, মরণহীন অর্থে নয়। ব্রহ্মের অমূর্ত অবস্থায় তাঁকে বিমৃত্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু মূর্ত অবস্থায় তাঁকে আনন্দরূপ এবং অমৃত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার একটি কারণ আছে। উপনিষদের পরিকল্পনায় সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যুকে আনন্দ বা অমৃতের উপাদানরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

কি করে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু আনন্দের বা অমৃতের উপাদান হয়ে যায়, তা বুঝতে হলে আমাদের আবার আনন্দের সংজ্ঞার উল্লেখ করতে হয়। দুই পক্ষ যখন খেলে তখন একপক্ষ হারে আর এক পক্ষ জেতে। সেখানে যে পক্ষ হারে তার ভাগ্যে দুঃখ, আর যে পক্ষ জেতে তার ভাগ্যে সুখ। যারা এই দুই পক্ষের সমর্থক তাদের ভাগ্যেও তাই ঘটে। আর যদি কেউ নিরপেক্ষ দর্শক থাকেন, তাঁর ভাগ্যে সেই দুর্লভ বস্তুটি জোটে যাকে উপনিষদে বলে আনন্দ বা অমৃত। তার কারণ তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে খেলার রস গ্রহণ করেন। একদলের হার ও অপব দলের জিত তাঁব কাছে অর্থহীন; খেলা কতখানি জমে উঠল তাই তিনি দেখেন। অর্থাৎ তিনি খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টিকে দেখেন না, অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন।

এখন আমরা ব্রহ্মের মূর্তরূপে বা দ্বৈতভাব মণ্ডিত প্রবহমান সৃষ্টিরূপী ব্রহ্মে মৃত্যু কি ভাবে আনন্দ বা অমৃতের উপাদান হয়ে যায় সে বিষয় আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি, উপনিষদের চিন্তা অনুসারে রসের আস্বাদনের জন্য ব্রহ্ম আপনার উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে বিশ্ব হলেন। তাঁর এই বিশ্বরূপই আনন্দরূপ; কারণ তা শিল্প এবং আনন্দরূপ বলে তা অমৃত।

ব্রহ্মের এই দ্বৈতভাব মণ্ডিত মূর্তরূপের অবস্থায় মৃত্যু স্বীকৃত; তবে তাকে আনন্দের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সৃষ্টিপ্রবাহে জন্ম আছে মৃত্যু আছে, ভাল আছে মন্দ আছে, হাসি আছে কান্না

আছে। তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সুখ-দুঃখ বোধও আছে। কারও ভাল হলে সুখী হই, ভাগ্যে ভাল কিছু জুটলে খুশী হই, উৎসবে মন উৎফুল্ল হলে হাসি। অপর পক্ষে ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের মৃত্যু হলে শোকে অভিভূত হই, ভাগ্যে মন্দ ঘটলে দুঃখ পাই, অবস্থা প্রতিকূল হলে মন খারাপ হয়ে যায়। এ সবই স্বীকৃত। তবে উপনিষদের চিন্তায় এই সুখ-দুঃখ বোধ আপেক্ষিক। দৃষ্টিভঙ্গির উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। এক দৃষ্টিভঙ্গিতে সুখবোধ, দুঃখবোধ আছে, আর এক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা নেই। এক দৃষ্টিভঙ্গিতে জন্মে সুখ এবং মৃত্যুতে শোকবোধ আছে। আর এক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সুখ-দুঃখ বোধের উপরে ওঠা যায় এবং ফলে শোকের বা মৃত্যুর দাহিকাশক্তি থাকে না। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যা পাই তা আনন্দ বা অমৃত। সুখ-দুঃখ তখন সেই আনন্দ বা অমৃতের উপাদান হয়ে যায়। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তবে আমরা আনন্দ বা অমৃত আস্বাদের অধিকারী হই।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হল বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে মানুষ তার নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে স্থাপন করে বিশ্ব-প্রবাহকে দেখে বলে সে সুখ-দুঃখবোধের অধীন হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা যে উপমাটি ব্যবহার করেছি তা স্মরণ করতে পারি। যে খেলোয়াড় নিজের দলের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খেলা দেখে, সে জিতে সুখ পায়, হেরে দুঃখ পায়। আর যে দর্শক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কেবল শিল্প হিসাবে খেলা দেখে, তার রস গ্রহণ করতে চেষ্টা করে, তার কাছে হারজিত অর্থহীন; হারজিতকে উপাদান করে খেলায় যে সৌন্দর্য পরিস্ফুট হল তাকেই সে গ্রহণ করে। সে তাই হারজিতের ঊর্ধ্বে উঠে খেলাকে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে বলে সে খেলা দেখে আনন্দ পায়। সে আনন্দেএকপক্ষের জয়এবং অপর পক্ষের পরাজয়ের সমানই তাৎপর্য, তারা উভয়েই সে যে আনন্দ আস্বাদ করে তার উপাদান।

অনুরূপভাবে আমরা যখন ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, অখণ্ড বিশ্ব হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা ভাবি,

তখন সুখ দুঃখের দ্বারা আমাদের মন আন্দোলিত হয়। তখন আমরা অনুকূল কিছু ঘটলে সুখ পাই, হাসি, উৎসব করি, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের জন্ম হলে উল্লসিত হই। উপনিষদ একে খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি বলে।

উপনিষদ আরও বলে, বিশ্বকে সঙ্কুচিত, বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে না দেখে, যদি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি, তা হলে তার মধ্যেই আমরা আনন্দের বা অমৃতের আস্বাদ পাই। সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, জন্ম-মৃত্যু তখন এই আনন্দ বা অমৃতের উপাদান হয়ে যায়। ফলে দুঃখ তখন আমাদের বিচলিত করে না, মৃত্যুশোক আর পীড়া দেয় না। তাই উপনিষদ বলে, যে মানুষ সৃষ্টিধারাকে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে পারে সে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যুর সংঘাতের নাগালের বাহিরে চলে যায়। তখন সে আনন্দ আস্বাদ করে এবং এই আনন্দই অমৃত, অমরত্ব নয়। এই বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিকে উপনিষদে মোহ বা অবিদ্যা বলা হয়েছে। এবং অখণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্ভূতি বা একত্বের দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়েছে। মূর্ত বিশ্বরূপী ব্রহ্মের মধ্যে দুই-ই সত্য। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের উপর তাদের উপলব্ধি নির্ভর করে।

আমরা এখানে বলেছি যে ব্রহ্মের মূর্তপ্রকাশ দুই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে দুই পৃথক আকার নেয়। তাদের একটি রূপ পাই বিশ্লিষ্ট বা খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে এবং অপরটি পাই সামগ্রিক বা অখণ্ড দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়ে দেখে। উপনিষদের ধারণায় দুটি রূপই সত্য এবং দুটি রূপকে না জানলে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। দুটি রূপকে পৃথক করে গ্রহণ করলে তাঁর মূর্ত রূপের পরিচয় আমরা ঠিক পাই না, আমরা বিভ্রান্ত হই। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের এই শ্লোকটি দেখা যেতে পারে:

'যাঁরা অবিদ্যার উপাসনা করেন তাঁরা অন্ধকরা অন্ধকারে প্রবেশ করেন। তার থেকে যেন বেশি অন্ধকারে প্রবেশ করেন যাঁরা (কেবল) বিদ্যাকে গ্রহণ করেন।"[১৫]

১৫. অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে॥ ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ১২॥১০॥৯ বৃহদারণ্যক ॥৪॥৪॥১০

এই বচনটির মধ্যে খানিকটা অস্পষ্টতা আছে। তাই এ বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন। প্রশ্ন ওঠে অবিদ্যা বলতে কি বুঝি। এটা নিশ্চিত যে অবিদ্যার অর্থ জ্ঞানের অভাব নয়। কারণ এই প্রসঙ্গে ঈশ উপনিষদে বলা হয়েছে যে অবিদ্যা একরম বলে এবং বিদ্যা অন্যরকম বলে।[১৬] তারা দুটি বিভিন্ন ব্যাখ্যা। এখন আমরা অবিদ্যা বলতে কি বুঝি তা অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।

আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে অবিদ্যাকে মায়ার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ভগবান বুদ্ধও অবিদ্যা শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল জীবন দুঃখময় এবং এই আত্যন্তিক দুঃখময় জীবনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি বারোটি কারণ পেয়েছিলেন। তাদের তিনি দ্বাদশ নিদান বলেছেন। এই দ্বাদশ নিদানের মূলে আছে অবিদ্যা। সুতরাং অবিদ্যা হল সেই মিথ্যাজ্ঞান যা অহংবোধের মূলে। কাজেই দেখা যায় যে অহংবোধ বা দ্বৈতভাবের ভিত্তিতে বিশ্ব-সম্বন্ধে যে ধারণা মনে ফুটে ওঠে তাকে উভয়েই অবিদ্যা বলেছেন।

উপনিষদও একরকম তাই বলে, আবার বলেও না। বলে এই অর্থে যে দ্বৈতভাব আরোপিত হলে ব্যক্তি বিশেষ সাধারণত খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কাজেই নিজের সীমিত স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখে বলে সে বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন আকারে দেখে। ফলে সে সুখ-দুঃখবোধে আন্দোলিত হয়, মৃত্যু তার কাছে গভীর শোকের কারণ হয়। এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্ব সম্বন্ধে যা ধারণা, তাকেই উপনিষদে অবিদ্যা বলেছে। তবে পরবর্তীকালে বুদ্ধ বা শঙ্করের চোখে তার যে হেয়ত্বের ধারণা ফুটে উঠেছিল তা উপনিষদে ঋষিকে স্পর্শ করে নি। তাঁদের ধারণায এই সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি দুটি বিশ্বসত্তার মূর্তরূপের পরিচয় দেয় দুভাবে। উভয়েই সত্য। বিদ্যা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত ধারণা এবং অবিদ্যা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত ধারণা।

১৬. ঈশ ॥১০

তুইকে নিয়ে ব্রহ্মের মূর্তরূপের সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে। শুধু একটাতে আংশিক পরিচয় মেলে। সুতরাং অবিদ্যা অবজ্ঞার বিষয় নয়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। উপনিষদে যে অর্থে অবিদ্যা ও বিদ্যার উল্লেখ হয়েছে, তাদের সমার্থবোধক আরও তুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপনিষদের প্রাসঙ্গিক বাণীর আলোচনায় তাদের সহিত আমাদের পরিচয় হবে। তাই প্রস্তুতি হিসাবে তাদের এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কথা তুটি হল নানাত্ব ও একত্ব। বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্বকে দেখলে আমরা নানাত্বকে পাই। সেখানে শোকে আমরা বিচলিত হই, মৃত্যুর আঘাতে আমরা কাতর হই। আর সামগ্রিক বা অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে, আমরা একত্বকে পাই। সেখানে তুঃখ-শোক আমাদের স্পর্শ করে না, তারা আনন্দের উপাদান হয়ে যায়। সুতরাং অবিদ্যা নানাত্ব-বোধের সমস্থানীয় এবং বিদ্যা একত্ববোধের সমস্থানীয়।

উপনিষদে তাই বারবার বলা হয়েছে, তুঃখ, তাপ, শোক, বিশেষ করে মৃত্যুশোক দ্বারা আমরা পীড়িত হই তখনি, যখন নানাত্বের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনকে দেখি। এরা থাকবেই, তবে এদের আঘাত অতিক্রম করতে প্রয়োজন অখণ্ড বা ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্বের অভিজ্ঞতা একটি নাট্যের মতো; সুখ-তুঃখ, জন্ম-মৃত্যু তার উপাদান। তাদের আঘাত এড়াতে হলে রসিকের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি চাই। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা যখন নাটক দেখি, তখন মনকে উৎফুল্ল করে এমন অভিনয়ও দেখি, আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে এমন অভিনয়ও দেখি। যে নাট্যরসিক বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নাটকের ঘটনাগুলি দেখেন, তিনি প্রথম ক্ষেত্রে প্রফুল্ল হন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিষণ্ণ হন। এর অতিরিক্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যেখানে দর্শক নাট্যের সমগ্র রস উপলব্ধি করতে উৎসুক। তিনি শিল্পরসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে চান, অভিনয়ের মধ্যে একটি সামগ্রিক সুমিতি বিরাজ করে কিনা। তিনি নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই নাটকের

ঘটনাগুলি দেখেন। তাই, বিশেষ চরিত্রের ভাগ্যোদয়ে উৎফুল্ল হন না বা বিশেষ চরিত্রের দুর্ভাগ্যে কাতর হন না। যাঁরা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নাটক দেখেন, তাঁরা পান, অবস্থা অনুসারে সুখ বা দুঃখ, আর যিনি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নাটক দেখেন, তিনি পান আনন্দ। সেখানে চরিত্র বিশেষের সুখ-দুঃখ, সেই আনন্দের উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে উপনিষদে বলা হয়েছে, যিনি অখণ্ড বা একত্বের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংসারকে দেখেন তাঁকে শোক ব্যথিত করে না বা মৃত্যুর আঘাত স্পর্শ করে না।

এইবার উপনিষদের বচন হতে আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন কতখানি পাই, দেখে নিতে পারি। উপনিষদে এই প্রসঙ্গে যে বাণীগুলি পাই তাদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একশ্রেণীর বাণী জোর দিয়েছে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির বা একত্ববোধের উপর। তা বলে, এই একত্ববোধ মনে পরিস্ফুট হলে মৃত্যুর আঘাত আব আমাদের স্পর্শ করে না। আব একশ্রেণীব বচন আছে যা বলে, নানাত্ব এবং একত্ব এই দুটি দৃঙ্গিভঙ্গির মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হবে; কারণ উভয় দৃষ্টি-ভঙ্গিই সত্য এবং সৃষ্টিধারাব উপর প্রযোজ্য। খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে মৃত্যুর আঘাত পেয়ে, তাবপর অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তীর্ণ হয়ে অমৃত বা আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়। দুটি নিয়ে পরিপূর্ণতর অভিজ্ঞতা লাভ হয়। আমরা প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের আলোচনা আরম্ভ কবব।

বর্তমান প্রসঙ্গে এই বচনটি দেখা যেতে পারে; 'যে অবস্থায় উপলব্ধি হয়েছে যে সকল জীবেই আত্মা আছেন, সেখানে একত্ব অনুভব করবার ফলে শোকও থাকে না মোহও থাকে না।"[১৭]

এখানে একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উপনিষদের মূল তত্ত্ব বলে অহৈতুক আনন্দ আস্বাদেব জন্য মূল সত্তা নিজের উপর

১৭. যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ ॥ তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ঈশ ৭

দ্বৈতভাব আরোপ করে সৃষ্টিপ্রবাহে পরিবর্তিত হলেন। তাতে ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধে সংযুক্ত হলো বহু জীব ও বহু বস্তু। প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুর ছন্দে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হল। প্রাণের ধারা অক্ষুণ্ণ, কিন্তু বিশেষ জীব বিনাশশীল ; তার মৃত্যু আছে। ফলে তার আত্মীয়ের মৃত্যু শোক ভোগ আছে। দ্বৈতবোধ হতেই এই শোকবোধ। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে উপলব্ধি হবে বিশ্বে যে মহানাট্য অভিনীত হচ্ছে তার চরিত্র ও নাট্যকার অভিন্ন। তাঁর উদ্দেশ্য, বিশ্বশিল্প রচনার মধ্য দিয়ে আনন্দ আস্বাদন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি যদি নিজের মনে ফোটাতে পারি, তা হলে দুঃখ-শোক তার দাহিকা শক্তি হারায়। বিচ্ছিন্ন দ্বৈতবোধের মোহ হতেই শোক। একত্বের অখণ্ডতাবোধ তা হতে আসে মুক্তি।

উপরের বচনে মৃত্যুশোকের পৃথকভাবে উল্লেখ নাই ; কিন্তু নিচের বচনে তার উল্লেখ পাই :

"যিনি যথার্থ দেখেন, তিনি মৃত্যু, রোগ ও দুঃখ দেখেন না। যিনি যথার্থ দেখেন তিনি (অখণ্ডভাবেই) সব দেখেন এবং সর্বতোভাবে অখণ্ডকে পান।"[১৮]

যথার্থ দেখার অর্থ হল যে সব দেখা বা সৃষ্টিধারার অখণ্ডরূপ দেখা, তা এই বচনেই বলা হয়েছে। অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মৃত্যু, রোগ ও দুঃখ সমগ্রের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং ফলে আনন্দের উপাদান হয়ে যায় বলে এগুলির আঘাত মনকে স্পর্শ করে না।

আর একটি বচনে কেবল মৃত্যুর কথাই বিশেষ করে আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মন দ্বারা এই কথা উপলব্ধি করতে হবে যে বিশ্বে পৃথক বলে কিছু নেই। মৃত্যু হতে মৃত্যুর শোক অনুভব করে যে বিশ্বকে নানার মতো দেখে।'[১৯]

১৮. ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং সর্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৭॥২৬॥২

১৯. মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিংচন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ কঠ ॥২॥১॥১ বৃহদারণ্যক উপনিষদেও একই বচন আছে, কেবল 'গচ্ছতি' স্থানে 'আপ্নোতি' আছে। ৪॥৪॥১৯

জীবনের ধারা গ্রথিত হয় জন্ম এবং মৃত্যু দিয়ে। ব্যক্তিবিশেষ আসে যায়; প্রাণের ধারা নিত্য প্রবাহিত থাকে। খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে (নানা ইব) দেখলে মরণে শোক আছে; কিন্তু অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে মৃত্যু প্রাণধারার উপাদান। তখন মৃত্যুশোক মনকে স্পর্শ করতে পারে না।

দ্বিতীয় চিন্তাটি মৃত্যুকে পরিহার করতে বলে না, খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি হতে মৃত্যুর শোককে অনুভব করে, তারপর অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতের আস্বাদ পেতে বলে। দ্বিতীয় অবস্থায়ও মৃত্যু থাকে, তবে সেখানে তা আনন্দের উপাদান হয়ে যায়। একই পৃথিবী ভূপৃষ্ঠ হতে একরকম দেখায়, আবার উপরে উঠলে আর একবকম দেখায়। দুটিই তার রূপ। দুটিকে দেখলে তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাই ঈষ উপনিষদে বলা হয়েছে, খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়। এই ভাবনাটি দুই পৃথক বচনে বিভিন্ন ভাষায় স্থাপিত হয়েছে।

প্রথমে বলা হয়েছে: 'যিনি তাঁকে জানেন তাঁর কাছে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই তিনি (ব্রহ্ম)। অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুর শোক ভোগ করে বিদ্যার দ্বাবা অমৃত আস্বাদ করতে হয়।"[২০]

আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে 'অবিদ্যাকে' কর্ম বলে অনুবাদ করেছেন। আমরা এ-বিষয়ে পূবেই আলোচনা করেছি। উপনিষদেব ভাবধারার সঙ্গে শক্তি রক্ষা করলে, তাকে নানাত্ববোধ বা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি বলাই সঙ্গত হবে। সুতরাং বিদ্যা হবে একত্ববোধ বা অখণ্ড দৃষ্টিবোধ।

একই চিন্তা উপনিষদেব অন্য একটি শ্লোকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। শ্লোকটিব বা লা অনুবাদ এই—"যিনি তাঁকে (ব্রহ্ম) জানেন, তাঁর কাছে সম্ভূতি (প্রাণের ধারা) ও বিনাশ উভয়ই তিনি। বিনাশের মধ্য দিয়ে মৃত্যুশোক ভোগ করে সম্ভূতির বা প্রাণধারার

২০. বিদ্যাং চা বিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং স হ॥
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ঈশ॥ ১১

অখণ্ডতা বোধের সাহায্যে অমৃত আস্বাদ করতে হয়।[২১]

সম্ভূতি শব্দটি শঙ্কর 'অসম্ভূতি' ধরে নিয়ে অব্যাকৃত প্রকৃতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত। সম্ভূতির সরল অভিধা অর্থ ভরণ (শব্দকল্পদ্রুম)। সুতরাং বর্তমান প্রসঙ্গে সম্ভূতির অর্থ হবে প্রাণের ধারা যাকে আশ্রয় করে জন্ম-মৃত্যুর ছন্দ দোলায়িত, যা জীবনকে ভরণ করে। প্রাণের ধারা নিত্য, তা হতে মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে মৃত্যুর শোক আছে। তাকে প্রাণধারার অঙ্গ হিসাবে দেখলে, তা অখণ্ড দোলায়িত প্রবাহ। তখন তা অমৃত।

তিন

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা

রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যু বার-বার হানা দিয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপরিণত বয়সে একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁর মনে মর্মান্তিক বেদনা ঘটিয়ে পৃথিবীর বুক হতে সরে গেছেন। এই অভিজ্ঞতার আরম্ভ যখন তাঁর মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু (২৭ ফাল্গুন ১২৮১ / ১০ মার্চ ১৮৭৫) ঘটে। তখন তাঁর বয়স চোদ্দ বছর অতিক্রম করেনি। সে শোক তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, কিন্তু তাঁর মনকে তেমন গভীরভাবে নাড়া দিতে পারেনি। একথা তিনি 'জীবনস্মৃতিতে' উল্লেখ করেছেন। তারপর অল্পকালের ব্যবধানের মধ্যেই পরিবারে পর-পর তিনটি মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়। তাঁর বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মারা যান (২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯৫ / ডিসেম্বর ১৮৮৩)। পরের বছর (৮ বৈশাখ ১২৯১ / ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪) তাঁর বৌঠান কাদম্বিনী দেবী আত্মহত্যা করেন এবং তার দুমাস পরেই তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ অকালে মারা যান (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ / জুন ১৮৮৪)। এগুলির মধ্যে বৌঠানের আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে সর্বাধিক

২১. সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং স হ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥ ঈশ। ১৪

আঘাত করে। কাদম্বরী দেবী তাঁর স্নেহ ও সাহচর্য দিয়ে এই দেওরটিকে এমন ঘিরে রেখেছিলেন যে তাঁর অন্তর্ধান রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল। তার চিহ্ন তাঁর নানা কবিতার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান আছে। এ বিষয় তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে একটি স্মৃতি-অর্ঘ্যে লিপিবদ্ধ ছিল ; কিন্তু সে রচনা তাঁর গ্রন্থাবলীতে স্থান পায়নি।

পরবর্তী জীবনে বারবার তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুশোক তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবীকে তিনি হারান নভেম্বর ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে (৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯)। পরের বছর তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা মারা যান (ভাদ্র ১৩১০ / সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে (৬ মাঘ ১৩১১ / ১৯ জানুয়ারি ১৯০৫)। তিন বছরের মধ্যে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান (৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ / ২৪ নভেম্বর ১৯০৭)। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা মারা যান (২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ / ১৬ মে ১৯১৮)। কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৭ শ্রাবণ ১৩৩৯ / ৭ আগষ্ট ১৯৩২) জারমানীতে পরলোকগত হয়।

যিনি জীবনে এতবার একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের একের-পর-এক হারিয়েছেন, ধরে নেওয়া যায় তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ে তিনি মৃত্যুর তীব্র আঘাত অনুভব করেছেন। কিন্তু বাহিরে তার বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় না ; এমনকি রচনায়ও না। কেবল একটি বড় ব্যতিক্রম পাই তাঁর পত্নীর ক্ষেত্রে। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর স্মরণে নিবেদিত কতকগুলি কবিতা একত্রিত করে তিনি 'স্মরণ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। তিনি শোককে সংহত করতে পারতেন। গীতায় যাকে বলে স্থিতধী তিনি তাই ছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত শোককে তিনি অন্যের কাছে আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন। তাঁর রুচির সঙ্গে এবং আদর্শের সঙ্গে তা সামঞ্জস্য রাখত না। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিচে উদ্‌ধৃত কাব্যাংশটি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে-আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে অর্গল দিয়ে।[২২]

সুতরাং যাঁর জীবনে মৃত্যু এমন বার-বার আঘাত হেনেছে, তিনি যে মৃত্যু সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। মানুষের জীবনে পরিবারে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু যে শোক সঞ্চার করে, তার তীব্রতার সঙ্গে আর কোনও শোকের তুলনা চলে না। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও মনীষী ছিলেন। তাঁর সংবেদনশীলতা তাঁকে যতই আঘাত হেনেছে, তাঁর প্রজ্ঞা তাঁকে ততই মৃত্যু-রহস্য ভেদ করবার চিন্তায় আকৃষ্ট করেছে। ফলে তাঁর সাহিত্যে, বিশেষ করে তাঁর কাব্যে সে চিন্তাকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই চিন্তা তাঁকে ক্রমশ পরিণত সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে তাঁর রচনার মধ্যে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তাব পরিণতির পথে এগিয়ে যাবার একটি ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা তাঁর রচনা হতে চিন্তাকণা সংগ্রহ করে সেই ইতিহাসটিকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তায় অগ্রগতির পথে আমরা কয়েকটি অবস্থা পাই। প্রথমটি প্রশ্নের অবস্থা। সেখানে দেখি মৃত্যুর পর মানব-আত্মার ভাগ্যে কি ঘটে, এ-নিয়ে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন উদিত হয়েছে। তারপর দেখি একটা অস্পষ্ট ধারণা ফুটে উঠেছে যে মৃত্যুর পর ব্যক্তিজীবনের সব শেষ হয়ে যায় না। তারপর দেখি, মৃত্যুর প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা ক্রমশ সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। এই অবস্থায়

২২. পুনশ্চ, বিশ্বশোক।

চিন্তা দুটি ভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছে। একটি পর্যায়ে মানুষের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হতে মৃত্যুকে দেখা হয়েছে। অপর পর্যায়ে সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে সৃষ্টিধারা প্রবাহিত তার অঙ্গরূপে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে মৃত্যুকে দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও আবার চিন্তার দুটি স্তর পাই। প্রথম অবস্থায় ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হতে মৃত্যুকে একটি অবাঞ্ছিত ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে একটি বিষাদের ভাব জড়িত। দ্বিতীয় স্তরের চিন্তায় এই বিষাদের ভাব তিরোহিত। সেখানে মৃত্যু জীবনের সমাপ্তিসূচক একটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু রূপে কল্পিত হয়েছে। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি মৃত্যুকে অন্যরূপে দেখেছেন। তা প্রাণধারার তরঙ্গের ছন্দের মতো, তা নৃত্যের তালের মতো, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে আনন্দধারা প্রবাহিত জন্মের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মৃত্যু তার উপাদানের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর বেশি এই অবস্থায় বলবার দরকার নাই। বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করবার পক্ষে এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট বলে মনে হয়।

মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে যে নানা প্রশ্ন উঠেছিল তার সুন্দর তালিকা পাওয়া যায় 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'মৃত্যুর পরে' শীর্ষক কবিতাটিতে। এটি রচিত হয় এপ্রিল ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। তখন পরিবারে কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটেছে বলে আমাদের জানা নাই। সম্ভবত ঘটে থাকবে। সেই প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছে। এই কবিতায় তিনি এক জায়গায় বলেছেন,

> গিয়েছে কি আছে বসে জাগিল কি ঘুমাল সে
> কে দিবে উত্তর।
> পৃথিবীর শ্রান্তি তারে ত্যজিল কি একেবারে
> জীবনের জ্বর।

আরো নানা প্রশ্ন তুলে তিনি কবিতাটির শেষ অংশে বলেছেন,

> চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব
> রুদ্ধ-ওষ্ঠাধর।

জন্মান্তরে নবপ্রাতে সে হয়ত আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।

যে চলে গেছে সে হয়ত উত্তর পেয়েছে, হয়ত পায় নি; কিন্তু মৃত্যুশোক তো একান্তই দুর্বিষহ। তাই মনকে এই সংশয়াকুল অবস্থা হতে উদ্ধার করতে এমন একটা নিশ্চিত বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা বলবে, মৃত্যুর অর্থ সব শূন্য হয়ে যাওয়া নয়, নিশ্চয় একটা কিছু থাকে। মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এইরকম বিশ্বাসবোধের প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথও যে তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন তা তাঁর উক্তি হতে সমর্থিত হয়।

এই প্রসঙ্গে 'কণিকার' অন্তর্ভুক্ত 'মৃত্যু' এই ক্ষুদ্র শ্লোকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়
মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।

এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় ভাষায় নিচের কাব্যাংশে ধ্বনিত হয়েছে :

নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
· একি সত্য হতে পারে।
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে।
সে ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাতো না নিখিলতরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হত,......।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ একটা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই মৃত্যুশোকে সান্ত্বনা খোঁজেন নি ; মৃত্যু ব্যাপারখানা কি তা তাঁর প্রজ্ঞার সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর নানা চিন্তা যে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া

২৩. পত্রপুট, মৃত্যু।

যায়। এ-বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি ব্যক্তি বিশেষের বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয়টি সমগ্র সৃষ্টিধারাকে জড়িয়ে নিয়ে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা প্রথমে ব্যক্তিগত বা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব।

'সোনার তরী'র প্রথম কবিতাখানিতেই এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ আছে। সেখানে বর্ণিত নদীর মাঝখানে যে ছোট ক্ষেত, তা ব্যক্তিবিশেষের জীবনের প্রতীক। ব্যক্তিবিশেষ জীবনে শ্রম করে যে সঙ্গতি গড়ে তোলে, তাই হলো সেই ক্ষেতে উৎপাদিত ধান। আর তরী বেয়ে যে এল, সে হল সমাজের প্রতীক। যখন মৃত্যুর আহ্বান আসে, তখন ব্যক্তিবিশেষ যে সম্পদ উৎপাদন করেছে, সমাজ তা নিয়ে নেয়, কিন্তু তাকে নেয় না ; মৃত্যু তাকে হরণ করে নিয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে কবিতাটি হেঁয়ালির মতো ঠেকে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি ভাষণে নিজেই তার এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২৪] অর্থাৎ এখানে একটি রূপকের সাহায্যে তাঁর বক্তব্য বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর এই মন্তব্যটি দেখা যেতে পারে :

"সংসার সবই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন মানুষ বলে 'ওইসঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো', তখন সংসার বলে, 'তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও'।"

এটি একটি রূঢ় সত্য কথা। ব্যক্তিবিশেষের দিক হতে দেখলে তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কিন্তু সমাজের লক্ষ্য হলো সমষ্টিকে দেখা, ব্যক্তি-বিশেষকে তা সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যবহার করে। তারপর যখন তার কাজ ফুরিয়ে যায়, মৃত্যুমুখে সমাজ তাকে ঠেলে দেয়। ব্যক্তি-বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি হতে তিনি তাই উপদেশ দিয়েছেন, এই অবস্থাকে

২৪. শান্তিনিকেতন, তরী বোঝাই।

স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় নাই। ধরে৷নিতে হবে জীবন যে ভোগ করি মৃত্যুর হাতে তাকে তুলে দিতে হবে খাজনা রূপে। তিনি তাই বলেছেন, "এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনা-স্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে দিতে হবে।"

পরবর্তী অবস্থায় দেখি এই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হতে যে বিষাদ বা হতাশা সঞ্জাত হয়, তাকে তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। একটি অভিনব চিন্তাই সেটা সম্ভব করেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন ব্যক্তির জীবনকে সমগ্ররূপে দেখলে মনে হবে, সারাজীবন যেন মরণের প্রস্তুতি। মায়ের কোলে যে মেয়ে জন্মগ্রহণ করে ধীবে ধীরে বড় হয়, শিক্ষা ও সাধনা করে সে নিজেকে নানা গুণে সজ্জিত করে তোলে একদিন পতির সঙ্গে মিলনের জন্য। জীবন যেন সেই বালিকা এবং মরণ যেন সেই আকাঙ্ক্ষার ধন, পতি। এই উপলব্ধি হলে মরণকে আনন্দের সঙ্গেই মন গ্রহণ করতে পারে। কবির ভাষায়:

যা পেয়েছি, যা হয়েছি, যা-কিছু মোর আশা,
না জেনে ধায় তোমার পানে সকল ভালবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে
জীবনবধূ হবে তোমার নিত্য-অনুগতা।[২৫]

তাই তিনি বলেছেন, মরণ যেদিন তাঁর কাছে আসবে তাকে তিনি সমগ্র জীবনের সঞ্চিত ধন দিয়ে স্বাগত জানাবেন; কারণ সারা জীবনটাই ত মরণের জন্য প্রস্তুতি। মরণই ত জীবনের পরিপূর্ণতা সম্পাদন করে:

যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরম দিনে সাজিয়ে দিব উহারে
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।[২৬]

২৫. গীতাঞ্জলি, ১১৬
২৬. গীতাঞ্জলি, ১১৪

পরের স্তরের চিন্তায় দেখি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা আরও পরিণত রূপ পেয়েছে। সেখানে সামগ্রিক বা অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি মৃত্যুকে দেখেছেন। ফলে মৃত্যুর এক নূতন রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি বিশেষের জীবনের ওপর তা যবনিকা টেনে দেয় বলে তা হতে যে শোক উদ্ভূত হয়, তা তখন আর তাঁর মনকে পীড়া দেয় না। তিনি মৃত্যুকে জীবনধারার আবশ্যিক অঙ্গরূপে দেখেছেন। সে পরিকল্পনায় মৃত্যু জীবনকে বিনাশ করে না, জীবনকে ধারণ করে। প্রাণীবিশেষ যায়, প্রাণধারা অব্যাহত থাকে। মৃত্যু প্রাচীনকে সরিয়ে দিয়ে যা 'নিত্যকালের চির পুরাতন' তার নবীন বেশে প্রকাশ হবার সুযোগ এনে দেয়। সুতরাং মৃত্যুই প্রাণের ধারক এবং বাহক। ফলে পরিণত হলে ফুল যখন ঝরে পড়ে, তখন যেন ফুলের মৃত্যু ঘটে ; কিন্তু সেই ফল হতেই নূতন গাছ জন্মলাভ করে নূতন করে ফুল ফোটায়। সুতরাং জীবন হলো ফুল এবং মরণ হলো ফল। জীবনের ফুল ফোটা হলেই মরণের ফল ফলে। প্রাণধারার তারা আবশ্যিক অঙ্গ।

সুতরাং এই ভাবে অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে দেখলে মৃত্যুর শোকের আর দাহিকা শক্তি থাকে না। জীবন ও মৃত্যু দুইই প্রাণধারার অঙ্গ হয়ে যায়। এই কথাটি নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বর্ণাঢ্য এবং চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ফলে কোথাও জন্ম ও মরণকে পা-তোলা ও পা-ফেলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কোথাও সাগরের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কোথাও নদীর তরঙ্গের সঙ্গে কোথাও বাঁশীর স্বরলহরী ও রন্ধ্রের সঙ্গে।

এইবার আমরা এই দুটি চিন্তাকে রবীন্দ্রনাথের বাণী চয়ন করে, তার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করবার প্রস্তাব করি।

প্রাণের ধারাকে যে মৃত্যু নবীন রাখে, এই চিন্তাটি বোধহয় 'গীতাঞ্জলির' কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'গীতাঞ্জলিতে' দেখি খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যুকে জীবনের পরিপূর্ণতা রূপে

কল্পনা করা হয়েছে। এখানে দেখি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হতে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরণ ঘটেছে। এখানে জন্ম ও মৃত্যুকে এক সঙ্গে দেখা হয়েছে প্রাণের ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে। প্রাণধারার ধারাবাহিকতা এবং সজীবতা রক্ষণে উভয়েরই ভূমিকা আছে। জীবন প্রাণধারাকে নবীনরূপে প্রকাশ দেয়। পরে সেই নবীনরূপ কালের স্থূল হস্তাবলেপনের ফলে তার সজীবতা হারায় জরার প্রভাবে। তখন মৃত্যু এসে জরার জড়ত্বকে সরিয়ে দেয়; ব্যক্তিগত জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে নবীনরূপে জীবনের পুনরাবির্ভাবের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ওপর যখন মৃত্যু এসে ছেদ টেনে দেয়, তখন প্রাণের ধারার ছেদ ঘটে না, ব্যক্তিগত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর সেই মৃত্যুর অঁাধার উত্তীর্ণ হয়ে নবীন জীবন নূতন মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলোকের উত্তরণের মতো মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যেন প্রাণধারার উত্তরণ ঘটে। জীবন হল ফুল এবং মরণ হল ফল এবং সেই মরণরূপী ফলের থেকে নূতন জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে—
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে'
মরণে ফল ফলবে।[২৭]

এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ একই কাব্যগ্রন্থে অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। বিশেষ জীবনকে মৃত্যু হরণ করে সত্য; কিন্তু প্রাণের ধারাকে ব্যাহত করে না। উপরে প্রযুক্ত উপমাতেই তা পরিস্ফুট।

২৭. গীতালি, ৩৮

ফুল যখন ঝরে যায় তখন ফল ধরে। তার অর্থ ফুল ফোটার শেষ হওয়া নয়, ফুল ফোটা অব্যাবহত থাকে। ফলের মধ্যে নূতন গাছের বীজ থাকে যা আবার নূতন করে ফুল ফোটাবে। এই অর্থে মৃত্যু প্রাণের ধারাকে ব্যাহত করে না, তাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। তাই তিনি বলেছেন,

মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যে প্রাণ
সেই ত তোমার প্রাণ।[২৮]

ঠিক বলতে এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের মনে অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল এবং পরে তিনি তার বিষয় সচেতন হয়েছিলেন। তাই দেখি তাঁর অনেকগুলি প্রতীকধর্মী নাট্যে তা বার-বার আত্মপ্রকাশ করেছে। তত্ত্বটি হল এই। জরাকে সরিয়ে দিয়ে প্রাণধারার সজীবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে আমাদের মৃত্যুর দ্বারস্থ হতে হবে। মৃত্যুর ভূমিকা হল প্রাণের সজীবতাকে জরা হতে মুক্ত করা, প্রাচীনকে নবীন করে তোলা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিচে উদ্‌ধৃত উক্তিটি প্রণিধান-যোগ্য :

"'শারদোৎসব' হতে 'ফাল্গুনি' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা একই।"[২৯] সেই ধুয়োটা হল জরা যখন ছড়িয়ে বসে 'প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়', তখন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে জরা হতে মুক্ত হয়ে প্রাণ আবার সজীবতা ফিরে পায়। এই তত্ত্বটি সহজ করে বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ বসন্তের কচিপাতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের আগমন সম্ভব হতো না যদি না জরাগ্রস্ত পুরাতন পাতা ঝরে পড়ে তাদের আগমনের পথ প্রস্তুত করে দিত। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

"বসন্তের কচিপাতায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র? যে-সব পাতা

২৮. গীতালি, ৯৯
২৯. আত্মপরিচয়, ৩

ঝরে গিয়েছে, তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তা হলে জরাই অমর হতো—তা হলে পুরাতন পুঁথির তুলোট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার মরমর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন নবীনতাকে প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব।"[৩০]

দ্বিতীয় চিন্তা বলে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে জন্ম এবং মৃত্যু প্রাণধারার অঙ্গ হয়ে যায়। প্রাণধারার মধ্যে যেন একটি ছন্দ আছে। সেই ছন্দের তাল রক্ষা করে জন্ম এবং মৃত্যু। আমাদের এই অনন্যসাধারণ কবি সেই ছন্দের সুষমাকে পরিস্ফুট কববার জন্য নানা উপমা প্রয়োগ করেছেন। তাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

এই আলোচনা 'কণিকার' অন্তর্ভুক্ত একটি চিন্তাকণা দিয়ে শুরু হতে পারে। তাতেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে জন্ম-মৃত্যুর রূপ কেমন পবিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় সংক্ষেপে পাওয়া যেতে পারে। চিন্তাকণাটিতে জীবনকে খেলারূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং চলার ক্ষেত্রে যেমন পা-তোলা ও পা-ফেলা অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, বলা হয়েছে, জন্ম-মৃত্যু তেমন জীবনের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ :

জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনেব খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।[৩১]

বিশ্ব ব্যাপ্ত করে যে প্রাণের ধারা প্রবাহিত তার মধ্যে যে ছন্দ তিনি আবিষ্কার করেছেন, তার সঙ্গে সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার তুলনা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রাণের ধারা যেন সমুদ্র; তা দোলায়িত হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যুর ছন্দে। জন্ম যেন জোয়ার, ভাঁটা যেন মৃত্যু :

৩০. আত্মপরিচয়, ৩
৩১. কণিকা, জীবন

সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে,
বিশ্বব্যাপী জন্ম-মৃত্যু সমুদ্র দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়।[৩২]

'পরিশেষের' দুটি কবিতায় এই চিন্তা একটি নূতন ভঙ্গিতে স্থাপিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সৃষ্টিধারার মধ্যে সত্তার রূপ আছে-আর-নাই ভাবে প্রকটিত। সুতরাং সৃষ্টিধারার মধ্যে প্রলয় নিরন্তর ঘটে চলেছে; কিন্তু সেই প্রলয়ই সৃষ্টিধারাকে বহন করে চলেছে নূতন জীবন এনে দিয়ে। সৃষ্টি যেন নদী, প্রলয় তার তরঙ্গেব ছন্দ:

'নয় নয়' এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে
মহাকাল সমুদ্রের পরে।
সেই স্বরে
রুদ্রের ডম্বরুধ্বনি বাজে
অসীম অম্বর মাঝে—
'নয় নয় নয়'।
ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়।
সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়।[৩৩]

একই কবিতায় তিনি বলেছেন, বিনাশের স্রোতের মাঝেই অস্তিত্বের হাসি ফুটে ওঠে। সুতরাং জীবন যেন গান, তা ফুটে ওঠে মরণের বীণার তারে:

মরণের বীণা তারে উঠে জেগে
জীবনের গান;
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী।

৩২. নৈবেদ্য, ২৬ ৩৩. পরিশেষ, ধাবমান

আর এক জায়গায় দেখি রবীন্দ্রনাথ একটি জটিল উপমা প্রয়োগ করে বোঝাতে চেয়েছেন, মৃত্যুর ভিতর দিয়েই প্রাণের বৈচিত্র্যময় লীলা প্রবাহিত হয়। উপমাটা এই। যে হাওয়া বাঁশির রন্ধ্রে ঢুকে নির্গত হয়, তা নানা সুর ফুটিয়ে তোলে। হাওয়া যেন প্রাণের ধারা, বাঁশীর রন্ধ্র যেন মৃত্যু। এই মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করেই হাওয়া সুরে পরিণত হয়। সেই সুর হল নবজীবনের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি এখন স্থাপন করা যেতে পারে :

রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি
কালের বাঁশির মৃত্যুরন্ধ্রে সেই মত উচ্ছ্বাসি
উৎসারিছে প্রাণের ধারা।
সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার নাই তবু তার নাশ।[৩৪]

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কিন্তু এইখানেই থামেনি। তা আরও এগিয়ে গেছে। উপরের আলোচনায় দেখি, মৃত্যু সম্বন্ধে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপিত হয়েছে : একটি ব্যক্তিবিশেষের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি, অপরটি জীবন-মৃত্যুকে জড়িয়ে নিয়ে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য হল বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে পরিচিতের বা আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোক উপলব্ধি হয়। অপর-পক্ষে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে সেই শোক আনন্দের উপাদান হয়ে যায়। জন্ম ও মৃত্যু দুই জড়িয়ে প্রাণের ধারা। সেদিক থেকে দেখলে মৃত্যুও জন্মের সমান মূল্য, মৃত্যু নবজন্মের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে প্রাণধারাকে সজীব করে তোলে, 'মৃত্যু ম্লান জীবনকে শুচি ক'রে' তোলে। তা হলে কি প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি বর্জনীয় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই কেবল গ্রহণীয় ?

রবীন্দ্রনাথ তা বলেন না। তিনি বলেন উভয় উপলব্ধিই জীবনে

৩৪. আকাশ প্রদীপ, পাখীর ভোজ

সত্য ; উভয়কেই স্বীকার করে নিতে হয়। শোকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তবেই শোকাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে হয়। খণ্ডের মধ্যে একটি অশান্তির সুর লেগে আছে। অশান্তি সেই পরম সত্যে উত্তরণের পথ। তাই তিনি বলেছেন রুদ্রত্বই রুদ্রের চরম পরিচয় নয়, রুদ্রের একটি প্রসন্ন মুখও আছে। তাই তার প্রকৃত রূপ। রুদ্রত্বের স্পর্শ নিয়ে সেই পরম পরিচয়টিকে পেতে হবে। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

"রুদ্রতাই যদি রুদ্রের পরম পরিচয় হত, তা হলে এই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোথাও আশ্রয় পেত না—তা হলে জগৎ রক্ষা পেত কোথাও? তাইতো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে এই প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়।"[৩৫]

একটি সুন্দর কবিতায় তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি বাণী পেয়েছে। তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করে এই আলোচনা শেষ করা যেতে পারে :

সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্ত বীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।[৩৬]

৩৫. আত্মপরিচয়, ৩
৩৬. গীতাঞ্জলি, ৭৪

চার

উভয় চিন্তার তুলনা

উপরে আমরা উপনিষদের এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা পাশাপাশি স্থাপন করেছি। এখন সময় হয়েছে তাদের পরস্পরের তুলনা করবার। সে কাজ ইতিমধ্যেই সহজ হয়ে গেছে; কারণ, আমরা প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য করে থাকব যে এখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা উপনিষদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে এসেছে। কাজেই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে না। সংক্ষেপে উভয় চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে পারি। মূল কথা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এখানে একরকম উপনিষদের চিন্তার অনুসরণ করেছে।

আমরা দেখব মৃত্যু সম্বন্ধে উভয় ক্ষেত্রেই তিনটি মূল চিন্তা আছে। বিষয়টি দুটি স্তব হতে দেখা হয়েছে। একটি স্তরে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে; অন্য স্তরে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথমটিকে উপনিষদ নানার দৃষ্টিভঙ্গি বলেছে এবং রবীন্দ্রনাথ খণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গি বলেছেন। দ্বিতীয়টিকে উপনিষদ একত্বের দৃষ্টিভঙ্গি বলেছে এবং রবীন্দ্রনাথ অখণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গি বলেছেন। উভয়ই সত্য, তারা একই বিষয়কে বিভিন্ন রূপে দেখায়। প্রথমটিতে মৃত্যুর শোক অনুভূত হয়; দ্বিতীয়টিতে সে শোক অনুভূত হয় না, মৃত্যু আনন্দের উপাদানে পরিণত হয়। প্রথমটিতে অশান্তি পাই এবং দ্বিতীয়টিতে শান্তি বিরাজ করে। এ যেন একটি ভূখণ্ডকে দুই স্তরে দেখার মতো। তার মধ্য থেকে দেখলে একরকম দেখি; পাশের পাহাড়ে উঠে উপর থেকে দেখলে আর একরকম দেখি। মধ্যে থেকে দেখি, ভূমি উন্নত, আনত, কোথাও ঢিবি, কোথাও নালা, কোথাও সমতল ভূমি; স্বস্তিতে পদক্ষেপ করা যায় না। আর উপরে উঠলে দেখি সেই উন্নত আনত ভাব তেমন পরিস্ফুট নয়, তারা যেন পাশাপাশি বিরাজ করে এক অখণ্ড সৌন্দর্যের বিস্তার ঘটিয়েছে। দুভাবে দেখলেই বিষয়টির পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

এই দুই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই তিনটি পৃথক চিন্তা গড়ে ওঠে।

(১) খণ্ডবোধের মধ্যে মৃত্যুশোক আছে। সেখানে তা হতে অব্যাহতি নেই।

(২) অখণ্ডবোধের মধ্যেওমৃত্যু আছে, কিন্তু সেখানে তার ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যায়। মৃত্যু সেখানে আনন্দের উপাদান হয়ে যায়।

(৩) তৃতীয় চিন্তা বলে, উভয় চিন্তার মধ্য দিয়েই মানুষের যেতে হবে, কারণ উভয়েই সত্য। সুতরাং খণ্ডবোধের মধ্য দিয়ে মৃত্যুশোক ভোগ করে, অখণ্ড বোধের সাহায্যে আনন্দ বা অমৃতে উত্তীর্ণ হতে হবে।

প্রথম চিন্তাটি আগে ধরা যাক। তা বলে খণ্ডবোধের ফলেই আমরা প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটলে শোক পাই। এই স্তরের দৃষ্টিভঙ্গিতে শোকের আঘাত হতে পরিত্রাণ নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা আর একবার উপনিষদের এই বচনটির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে পারি—

'মৃত্যু হতে সে মৃত্যুর (শোক) অনুভব করে যে বিশ্বকে নানাদ্বারা খণ্ডিত রূপে দেখে।'[৩৭]

এখানে স্পষ্টতই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় যে এই বচনটি দুটি উপনিষদে স্থান পেয়েছে, বৃহদারণ্যকে ও কঠে।

তার অনুরূপ চিন্তা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কিছু মন্তব্য স্থাপন করা যেতে পারে। 'নৈবেদ্য' হতে উদ্‌ধৃত এই কাব্যাংশটি এই প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে—

'মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে স্বতন্ত্র হয়ে আপনার পানে চাই।'[৩৮]

৩৭. মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি (বিকল্পে 'আপ্নোতি') য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ কঠ ২।১।১১ ও বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯

৩৮. নৈবেদ্য, ৯৪

'নৈবেদ্য'-এর আর একটি কবিতার মধ্যে একই চিন্তার প্রতিধ্বনি পাই। প্রাসঙ্গিক অংশটি এই—

'তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু—
আমার ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে নাকি তব পায়?
অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।'[৩৯]

উভয় ক্ষেত্রেই একই দৃষ্টিভঙ্গি: বিচ্ছিন্ন আকারে দেখলে প্রিয়জনকে হারানোর শোক অনুভব করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই অন্য প্রসঙ্গে এইভাবে বলেছেন—

'খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াণ, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেটা একের মধ্যে।'[৪০]

সুতরাং আমরা দেখি, এখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা উপনিষদের চিন্তার অনুসরণ করেছে। উপনিষদে যাকে নানাত্ব বলেছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে খণ্ডতা বলেছেন। এই খণ্ডতা বা নানাত্বের বোধ হতে আমরা মৃত্যুশোক দ্বারা আক্রান্ত হই।

দ্বিতীয় চিন্তা হল, একত্বের বা অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে মৃত্যু আনন্দের উপাদান হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের দুটি বচন প্রণিধানযোগ্য। প্রথমটি বলে—'যে অবস্থায় এই জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছে যে সকল জীবই আত্মাস্বরূপ সেখানে একত্ব অনুভব করবার ফলে, কোথায় শোক, কোথায় মোহ?'[৪১]

একত্ববোধ হলে শোক থাকে না, এই কথা এখানে বলা হয়েছে। নিচের বচনে অতিরিক্ত উল্লেখ হয়েছে যে একত্ববোধ পরিস্ফুট হলে

৩৯. নৈবেদ্য ১৭
৪০. ধর্ম। প্রাচীন ভারতের এক
৪১. যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। ঈশ।৭

মৃত্যুশোকের দাহিকা শক্তি লোপ পায়। এ-বচনটির অংশ পূর্বে স্থাপন করা হয়েছে ; এখানে সমগ্র বচনটি উদ্‌ধৃত করা হচ্ছে। 'মনের দ্বারাই এই কথা উপলব্ধি করতে হবে যে বিশ্বে নানা বলে কিছু নেই। মৃত্যু হতে সে মৃত্যুশোক অনুভব করে যে বিশ্বকে নানা আকারে দেখে।'[৪২]

এই বচন দুটিতে একত্ববোধ পরিস্ফুট হলে মৃত্যুশোক হতে বা সকল শোক হতে পরিত্রাণ ঘটে, এই কথাই বলা হয়েছে। আরও একটি বচন উদ্‌ধৃত করা হবে যেখানে জন্ম ও মৃত্যুর সমান মূল্য দেওয়া হয়েছে ; উভয়কেই আনন্দের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই জন্মের প্রেরণা যেমন আনন্দ, তেমন আনন্দের আকর্ষণে জীব মৃত্যু বরণ করে, এই কথাও বলা হয়েছে। বচনটি এই—

'(বরুণের পুত্র ভৃগু) জানলেন ব্রহ্মই আনন্দ। আনন্দ হতেই এই জীবসকল জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করে আনন্দের জন্য জীবনধারণ করে। (মৃত্যুর পর) আনন্দেই প্রতিগমন করে এবং প্রবেশ করে।'[৪৩]

এই বচনটির তাৎপর্য খুব গভীর। জন্ম ও মৃত্যু এখানে আনন্দের উপাদানরূপে পরিকল্পিত হয়েছে। সৃষ্টির প্রবাহ যেন বিশ্বনাট্য। নাট্যকার, নাট্যের চরিত্র এবং নাট্যে আশ্রিত যে রস সবই ব্রহ্ম। তাই জন্মেও আনন্দ মৃত্যুতেও আনন্দ। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যু আনন্দের উপাদান।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে রবীন্দ্রনাথের মনেও একই চিন্তার উদয় হয়েছিল। তাঁরও ধারণা হয়েছিল যে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে, জন্ম মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আনন্দের উপাদান হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন

৪২. মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিংচন ॥
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ কঠ ২।১।১১
বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯

৪৩. আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ॥ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ॥ আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ৩।৬

ব্যক্তিস্বার্থের সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে, তাদের মনকে আঘাত করবার শক্তি থাকে, কিন্তু অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে থাকে না। উপনিষদে যাকে নানাত্ব বলেছে তাকে তিনি খণ্ডতা বলেছেন। আর উপনিষদে যাকে একত্ব বলেছে তাকে তিনি অখণ্ডতা বলেছেন। একত্ববোধ বা অখণ্ডবোধে উত্তীর্ণ হলে আনন্দলাভ হয়, এই কথা উভয়েই বলেছেন। এই প্রসঙ্গে নিচে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি সংগীতের অংশ লক্ষ্য করা যেতে পারে—

'হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো-মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।'৪৪

এই ভাবনায় হাসি-কান্না, ভালো-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু যেন নৃত্যের উপাদান হয়ে গেছে। আনন্দ উভয়েরই প্রেরণা।

এই প্রসঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে ছয়টি ঋতুর আবর্তনকে কেন্দ্র করে একই চিন্তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কোনও ঋতুর ভাঙার পালা, কোনও ঋতুর গড়ার পালা। গ্রীষ্মের দারুণ দাবদাহের পর আসে বর্ষার জলের প্রাণসঞ্চারী ধারা; তার ফলে শরতে প্রকৃতির বক্ষে ধৃত প্রাণধারার সজীবতা ফুটে ওঠে। তারপর হেমন্তে সে সজীবতা ম্লান হয়ে শীতে তা অন্তর্হিত হয়। তখন গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দিয়ে রিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাও এক প্রস্তুতি বসন্তের পুষ্পপত্রের বর্ণাঢ্য রূপের প্রকাশের জন্য। এইভাবে চলে অবিরাম ধারায় প্রকৃতির বক্ষ জুড়ে হাসি ও কান্না, ধ্বংস ও নবজীবনের গ্রন্থনা। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় তার প্রেরণা হল এই আনন্দ। তারই আকর্ষণে মৃত্যুর দিকে প্রাণপ্রবাহ আকৃষ্ট হয়ে বারবার ফিরে আসে নবজীবনের তথা মৃত্যুর পথে। প্রাসঙ্গিক কাব্যাংশটি এই—

৪৪. অরূপরতন। গীতবিতান-বিচিত্র ৬

'সেই আনন্দ চরণ পাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরণ-গীতে গন্ধেরে—
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দেরে।'[৪৫]

ধ্বংস, মৃত্যু—এরা ত প্রাণধারারই ছন্দ; তারা আনন্দ-ধারারই ছন্দ। তাই তিনি নিজেকে এই কবিতাতেই আহ্বান জানাচ্ছেন সেই আনন্দনৃত্যে যোগ দিতে এই বলে—

'পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।'

এখন আমরা তৃতীয় চিন্তায় আসতে পারি। তা বলে খণ্ডবোধ ও অখণ্ডবোধ—উভয় চিন্তার মধ্য দিয়েই মানুষকে আসতে হবে, কারণ উভয়েই সত্য। প্রথম চিন্তার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় চিন্তায় উত্তীর্ণ হলেই আনন্দের বা অমৃতের পরিপূর্ণ আস্বাদ মেলে।

উপনিষদে খণ্ডবোধ বা নানা বোধকে অবিদ্যাও বলা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে যুক্তি এই অধ্যায়ের প্রথম অংশেই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তা পুনরুল্লেখের এখানে প্রয়োজন নাই। তবে যে প্রসঙ্গে এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার এখানে তুলনামূলক আলোচনার জন্য সংক্ষেপে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বর্তমান আলোচনায় উপনিষদের একটি বাণীর পুনরুল্লেখ করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বচনটি এই—

'যিনি তাঁকে জানেন, তাঁর কাছে অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়েই তিনি।

৪৫. গীতাঞ্জলি ৩৬

অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুর শোক ভোগ করে বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়।'[৪৬]

এখানে অবিদ্যা ও বিদ্যা দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে লব্ধ বিশ্বসম্বন্ধে ধারণা সূচিত করে। একটি নানার দৃষ্টিভঙ্গি, অপরটি একত্বের দৃষ্টিভঙ্গি। নানার দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যুর আঘাত আছে; কিন্তু একত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা অমৃত আস্বাদের বা আনন্দের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এখানে আর একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি আছে। তা বলে অবিদ্যা বিশ্বসম্বন্ধে যে পরিচয় দেয় তাও ব্রহ্মেরই পরিচয়, আবার বিদ্যা বিশ্ব সম্বন্ধে যে পরিচয় দেয় তাও ব্রহ্মেবই পরিচয়। তাই বলা হয়েছে, 'উভয়ং স হ।' সুতরাং তাৎপর্য হল উভয় পরিচয়ের মধ্য দিয়েই মানুষকে যেতে হবে। তবেই বিশ্বের পরিপূর্ণ রূপটির আস্বাদন হবে।

এখানেও আমরা দেখব যে এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গি হতে মৃত্যুকে দেখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও বিশেষ সচেতন হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল মৃত্যুর শোকের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তবেই মৃত্যুর দ্বিতীয় রূপের আস্বাদ সার্থক হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি মৃত্যুর আঘাতে প্রথমে কতখানি ভেঙে পড়েছিলেন এবং পবে ব্যাপক অখণ্ডবোধের মধ্য দিয়ে কেমন করে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরণ ঘটেছিল তাব সুন্দব বর্ণনা পাওয়া যায় ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত একটি চিঠিতে। তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত করে এই আলোচনা শেষ করা যেতে পাবে—'আমার জগৎ শূন্য হল, আমাব জীবনের সব সাধ চলে গেল। এই শূন্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারি নি। কিন্তু তার পর সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ লাভ কবল। আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম, জীবনকে মৃত্যুর জানলার ভিতর থেকে না দেখলে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না।

৪৬. বিদ্যাং চ বিদ্যাং চ যস্তদ্বেদো ভয়ং স হ॥ অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ঈশ ১

মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্ত রূপ প্রকাশ পায়, প্রথমে তা বড়ো দুঃসহ। কিন্তু তারপর তার ঔদার্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাল্কা হয়ে দেখা দেয়।'[৪৭]

৪৭. অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ৮ই আষাঢ় ১৩২৪-এর পত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রেয়তত্ত্ব

এক

প্রাথমিক কথা

মানুষের জীবন খুব ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। সে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং কর্ম করে। চিন্তার প্রেরণা জ্ঞান। তার পরিবেশকে মানুষ ভাল করে জানতে চায়। তার জন্যই তার চিন্তা করতে হয়। সেই চিন্তার আনুষঙ্গিক ফল জ্ঞান। পুরুষাণুক্রমে সঞ্চিত এই জ্ঞান হতেই দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস গড়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যা বিষয়ীভূত হতে পারে না তার অনুসন্ধান করে দর্শন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয় তাই বিজ্ঞান নামে পরিচিত। আর যে জ্ঞানের শাখা মানুষের অতীত সম্বন্ধে নিজেকে নিযুক্ত করে তাকে আমরা বলি ইতিহাস।

মানুষের অনুভূতি দুই স্তরে। একটি ইন্দ্রিয়ের স্তরে, অপরটি হৃদয়ের স্তরে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি সুখের হতে পারে বা যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। প্রথমটির প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয়, কারণ তা সুখকর। তা স্বভাবত কামনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বলে তাকে প্রেয় বলতে পারি। দ্বিতীয় স্তরে যে অনুভূতি তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। মনের মধ্যে তার উদয় হয়। কারও সহিত বিবাদ' হলে তার প্রতি বিদ্বেষের অনুভূতি জাগে। কাউকে ভাল লাগলে তার প্রতি প্রীতির অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। কেউ মহৎ কাজ করলে তার প্রতি শ্রদ্ধার অনুভূতি ফুটে ওঠে। কেউ ঘৃণ্য কাজ করলে তার প্রতি ঘৃণার

অনুভূতি জাগে। অনুরূপভাবে প্রকৃতি ও মানুষের মনে নানা অনুভূতি সঞ্চার করতে পারে। মেঘে আচ্ছন্ন দিনে মনে বিষাদের অনুভূতি জাগে। বসন্তের বাতাসের প্রথম স্পর্শ বা দূর হতে ভেসে আসা ফুলের গন্ধ পুলকের অনুভূতি জাগায়।

তৃতীয়ত মানুষ কাজ করে। তা তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রণোদিত। তার জ্ঞানশক্তি ও অনুভূতিশক্তি ও তার কাজকে প্রভাবান্বিত করে। যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি সুখকর তার স্মৃতি তার পুনরুদ্রেকের জন্য মানুষের কর্মশক্তিকে আকর্ষণ করে। যাকে প্রীতি করি তার কল্যাণের জন্য কষ্টসাধ্য কাজও আমরা করি। আবার একটি মানসিক আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করতেও আমরা কাজ করি। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতি কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর তৃতীয় ক্ষেত্রে জ্ঞান আমাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং জ্ঞান, অনুভূতি ও কর্ম পরস্পর জড়িত। কর্ম ও জ্ঞান অনুভূতিকে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু সে বিষয় এখানে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে না বলে তা অবতারণা করবার প্রয়োজন নাই।

শ্রেয়তত্ত্বের প্রয়োগক্ষেত্র হল মানুষের ইচ্ছাধীন কর্ম। তার লক্ষ্য হল কি ভাবে মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মগুলি নিয়ন্ত্রিত করা উচিত, তা নির্ধারণ করা। অর্থাৎ তা নীতিশাস্ত্রের একটি মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। সে সমস্যা প্রশ্ন উত্থাপন করে: কোন নীতি অনুসারে মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মগুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। কারণ সে লক্ষ্যই তো কোন্ নীতি গৃহীত হবে তা ঠিক করে দেবে। কোথায় যাব ঠিক হলে, তবেই তো পথ বলে দেওয়া সম্ভব হয়। এই লক্ষ্যকে আমাদের দেশের নীতিশাস্ত্রের পরিভাষায় পুরুষার্থ বলে। পশ্চিমে এই প্রসঙ্গে যে পরিভাষিক শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা হল 'সামাম বোনাম'[১]। তারও অর্থ একই।

১. Summum bonum

এখন মানুষ ইচ্ছাধীন কাজগুলি করতে দু'জোড়া দোটানায় পড়ে। একদিকে তার দেহ আছে এবং মন আছে। দেহে ইন্দ্রিয় আছে; তারা ইন্দ্রিয়সুখকর অনুভূতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। অপরদিকে মন অন্য ধরনের তৃপ্তি চায়; তা এমন কাজ চায় যা মনের তৃপ্তি সাধন করে। এই দোটানাকে অবলম্বন করে নীতিশাস্ত্রে দুটি বিপরীত মতের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। একটি মত বলে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই মানুষের পুরুষার্থ হওয়া উচিত। যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। অন্য মতটি বলে ভোগের জীবন ত্যাগ কর, কারণ তাতে সুখের থেকে যন্ত্রণা বেশি। একটি হল ভোগবাদ এবং অপরটি হল ত্যাগবাদ বা সন্ন্যাসবাদ।

অপরদিকে মানুষ সামাজিক জীবও বটে। সে বনে একা বাস করে না, সমাজে বাস করে। তার প্রতিটি ইচ্ছাধীন কর্ম যেমন তার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, তেমন সমাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এমন কাজ আছে যা ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গল সাধন করে। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে বিদ্যা আয়ত্ত করে, তা হলে তার মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হবে এবং তার বিদ্যার সুফল সমাজেরও কল্যাণ সাধন করে। আবাব এমন কর্ম আছে যা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ বর্ধন করে, কিন্তু সমাজের স্বার্থহানি ঘটায়। কেহ যদি অন্যকে বঞ্চিত করে প্রভূত ধন সঞ্চয় করে, তা হলে এমন ঘটে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে: ব্যক্তির স্বার্থ দেখব, না সমাজের স্বার্থ দেখব। এই দোটানাকে ভিত্তি করে দুটি বিপরীত মত গড়ে ওঠে। একটি বলে স্বার্থ বড়, অপরটি বলে পরার্থ বড়। এইভাবে স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্ব এসে পড়ে।

মনে হয়, এই দু'জোড়া বিরোধী মত একটি বিশেষ নীতি প্রয়োগ করে এক জোড়া বিরোধী মতে রূপান্তরিত করা যায়। তার আলোচনা করা এখানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কারণ তা হলে নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পরিচিত হওয়া সহজ হবে। দেহ যা চায় তা হল ইন্দ্রিয় সুখভোগ। আবার ইন্দ্রিয়সুখ অর্থেই ব্যক্তি-বিশেষের ইন্দ্রিয় সুখ; সুতরাং তা ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

কাজেই ব্যক্তিস্বার্থের অন্বেষণ এবং ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ—এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতি একই হয়ে দাঁড়ায়। এই দুটি আদর্শের সংযোগে যে নূতন আদর্শটি পাই তাকে উপনিষদ প্রেয়বাদ বলে। কারণ, যা ইন্দ্রিয়সুখকর তাই হল প্রেয়; তার প্রতি মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। তার সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে স্বার্থপর করে গড়ে তোলে এবং পরার্থ সম্বন্ধে উদাসীন করে।

অপরপক্ষে মনের দেহের প্রতি একটি বিরোধভাব আছে। ইন্দ্রিয়সুখে আকর্ষণ মনকে কাজ করবার অবসর দেয় না। তাই তা ইন্দ্রিয়সংযমের পক্ষপাতী। তা দৈহিক সুখভোগকে স্থূল মনে করে; কারণ, সেখানে মানুষ পশুর সমপর্যায়ে পড়ে। মানসিক সুখ মানুষের স্বভাবের সঙ্গে বেশি সঙ্গতি রক্ষা করে; কারণ, মানুষ জ্ঞানশক্তি-মণ্ডিত জীব। ফলে মনের আকর্ষণ এসে পড়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের প্রতি। মনের এই দৃষ্টিভঙ্গি তাকে সমষ্টিগত কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। তাই দেখি যারা সন্ন্যাসী তারা সহজেই সাধারণের কল্যাণের কাজে আকৃষ্ট হয়। আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং খ্রীস্টান পাদরিদের তাই আমরা সর্বজনীন কল্যাণমূলক কাজে এত উৎসাহভরে যোগ দিতে দেখি। সুতরাং সন্ন্যাসবাদের সহিত পরার্থবাদের একটি প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে।

সুতরাং একদিকে পাই প্রেয়বাদ যা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং অপরদিকে পাই সন্ন্যাসবাদ যা ইন্দ্রিয়নিরোধ করে মানসিক সাধনপথে তৃপ্তি খোঁজে। মোটামুটি দেখা যায় এদের বিরোধ দুই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। প্রথম, দেহের সঙ্গে মনের বিরোধ এবং দ্বিতীয়, স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের বিরোধ। আমরা যদি কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জিনিসটি দেখি, সমস্যাটি আরও সরল রূপ নেয়। মূল প্রশ্ন হল ব্যক্তির সুখ বা তৃপ্তি নয়, গোষ্ঠীর সুখ বা তৃপ্তি নয়, ব্যক্তির কল্যাণ বা গোষ্ঠীর কল্যাণ। দেহ ও মনের সহিত সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে উভয়ের কল্যাণ পরস্পর জড়িত। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে

ভোগ বা ত্যাগের সংঘাতের সমাধান নির্ভর করে সমগ্র ব্যক্তির কল্যাণের ওপর। অনুরূপভাবে বলা যায়, ব্যক্তি সমাজ হতে পৃথক নয়, তার অঙ্গীভূত। ঠিক বলতে কি তাদের মধ্যে মূলত বিরোধ নেই। ব্যক্তির কল্যাণেও সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়; আবার সামগ্রিক কল্যাণ ব্যক্তির কল্যাণের অনুরূপ পরিবেশ রচনা করে। সঙ্কুচিত দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখলেই একটা বিরোধ এসে পড়ে। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই তার সমাধান করতে হয়। তাকে আমরা সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি বলতে পারি। উপনিষদে তাকেই শ্রেয় বলা হয়েছে। তার আদর্শ অনুসারে পুরুষার্থ হল সামগ্রিক কল্যাণ। একধারে দেহ ও মনকে নিয়ে সমগ্র মানুষের; অন্যধারে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে নিয়ে সকল মানুষের।

সুতরাং প্রেয় হল তাই যা সমগ্রের নয়, অংশের তৃপ্তি খোঁজে। যেহেতু তা অংশের স্বার্থ সংরক্ষণে উৎসুক, কল্যাণ তার নাগালের মধ্যে আসে না। কারণ, কল্যাণ সামঞ্জস্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং আমরা দেখব, যাকে প্রেয় বলি তা কি ব্যক্তির ক্ষেত্রে, কি সমাজের ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত দৃষ্টিভঙ্গি হতে প্রেরণা পায়। দেহের স্বার্থ মনের স্বার্থ হতে বেশি আকর্ষণের বস্তু। তাই তা প্রেয়। অনুরূপ-ভাবে সমাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ সামাজিক কল্যাণের থেকে সাধারণত বেশি আকর্ষণের বস্তু। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে সমগ্র ব্যক্তির কল্যাণ এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ—উভয়ের সামঞ্জস্যের মধ্যেই সমাধান পাওয়া যায়। যা সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে তাই শ্রেয়। সেই কারণে শ্রেয় আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষণের বিষয় নয়; বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে তার কল্যাণকরতা উপলব্ধি করলে তবেই তা আকর্ষণের বস্তু হয়।

তাই উপনিষদ বলে—

'শ্রেয় এবং প্রেয় ভিন্ন জিনিস; তারা মানুষকে নানাভাবে আকর্ষণ করে। তাদের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করলে কল্যাণ হয়,

আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে পুরুষার্থ হতে ভ্রষ্ট হয়।[2]

দুই

উপনিষদের শ্রেয়বাদ

এই শ্রেয়বাদের পরিকল্পনা সন্ন্যাসবাদ হতে পৃথক। আবার তা ভোগবাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে পৃথক। ভোগবাদে ব্যক্তিবিশেষের সুখই বড় আকর্ষণ। সন্ন্যাসবাদ ঠিক তার বিপরীত; তা সকল সুখ বর্জন করে কৃচ্ছ্রসাধনের এবং ঐকান্তিক সংযমের উপদেশ দেয়। উপনিষদ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করতে উপদেশ দেয় নি। নিরবচ্ছিন্ন ভোগেরও উপদেশ দেয় নি। তাতে বলা হয়েছে জীবনে ত্যাগেরও প্রয়োজন আছে, ভোগেরও প্রয়োজন আছে; উভয়ের সামঞ্জস্যের মধ্যেই জীবন সার্থকতা মণ্ডিত হয়। ভূমিকে উর্বর করতে হলে, প্রথমে প্রয়োজন তাকে ভালভাবে কর্ষণ করা। সেই কর্ষণ হল জীবনের ত্যাগের দিক। কিন্তু কর্ষণ করে জমি ফেলে রেখে দেবার কোনও অর্থ হয় না। তাতে বীজ বপন করে শস্য উৎপাদন করতে হয়, তবেই তা সার্থক হয়। সেইরূপ জীবনে ত্যাগটাই সর্বস্ব নয়। ত্যাগের পর যে-পথে ভোগ জীবনকে সার্থকতা মণ্ডিত করবে সে-পথে ভোগের প্রয়োজন আছে। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ের প্রতি আসক্তি আছে সত্য; কিন্তু তাই বলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ আমাদের আদর্শ হবে না। আমাদের আদর্শ হবে, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করা, যাতে শ্রেয় লাভ হয়। ইন্দ্রিয়দমনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের।

এই ভাবনাটি কঠ উপনিষদে একটি উপমার সাহায্যে সুন্দর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্বের সহিত তুলনা

২ অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ ॥
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥
কঠ ॥ ১।২।১

করা হয়েছে। অশ্বকে ইচ্ছামতো ছেড়ে দিলে সে গন্তব্যপথে না গিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করে। সেইরকম ইন্দ্রিয়গুলিকে অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে বিচরণ করতে দিলে তারা নানা সুখকর অনুভূতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। শ্রেয়ের পথে তাদের পরিচালিত করতে হলে ভাল সারথির মতো তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নীতিবুদ্ধি এখানে সারথির সঙ্গে তুলনীয়। যার নীতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান নেই তার মনে একাগ্রতা আসে না, লক্ষ্য ঠিক থাকে না। তাই যেমন দুষ্ট অশ্বগুলি সারথির বশে থাকে না, তেমনি ইন্দ্রিয়গুলি তার বশে থাকে না। আর যে বিবেচনাশক্তির সাহায্যে শ্রেয়ের পথ ঠিক করে নেয় এবং তার প্রতি মনকে নিবিষ্ট করে, ইন্দ্রিয়গুলি তার বশে থাকে ; যেমন ভাল অশ্ব সারথির বশে থাকে।[৩]

এই ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্রেয়ের পথে পবিচালিত করতে উপনিষদে দুটি জিনিসের ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিকপথে পরিচালিত করতে প্রথমে প্রয়োজন গন্তব্য-পথ ঠিক করে নেওয়া ; দ্বিতীয়ত প্রয়োজন তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রগ্রহ বা লাগামের। জীবনের পথে ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বগুলিকে পরিচালিত করতে প্রয়োজন বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগের। তা পথ নির্দেশ করবে যেমন রথের ক্ষেত্রে সারথি পথ নির্দেশ করে। আর ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তির। তা প্রগ্রহের মতো তাদের ঠিকপথে চালিত করবে।[৪]

আমরা দেখব শ্রেয়বাদ দেহ ও মনের দ্বন্দ্বের, তথা স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা খুঁজেছে সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শের সাহায্যে। তা যা মনকে আকৃষ্ট করে, অর্থাৎ যা প্রেয়, তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে আর

৩. যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা ॥ তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ॥ তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ কঠ ॥ ১।৩।৫-৬

৪. বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ কঠ ॥ ১।৩।৩

যা মঙ্গল আনে তাকে গ্রহণ করেছে। অর্থের দিক হতেও শ্রেয় কল্যাণ ও মঙ্গলের সমার্থ বোধক। এ কথা যেমন মানুষ-বিশেষের মধ্যে দেহ ও মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে খাটে, তেমন অপরদিকে ব্যক্তির ও সমাজের স্বার্থের যে বিরোধ সে সম্বন্ধেও খাটে। যা একদিকে দেহ ও মনের এবং অপরদিকে স্বার্থের এবং পরার্থের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করবে তাই হল শ্রেয়ের আদর্শ।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উপনিষদ বলে জীবনে ত্যাগেরও প্রয়োজন আছে ভোগেরও প্রয়োজন আছে; উভয়ের সামঞ্জস্যের মধ্যেই জীবন সার্থকতা মণ্ডিত হয়। উপনিষদে যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নয়, ইন্দ্রিয় সংযমের দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়া হত তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত একটি কাহিনীতে। শেক্সপীয়ার প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে উপদেশের বাণী খুঁজে পেয়েছিলেন।[৫] উপনিষদের ঋষিও শুধু মনীষী নয়, কবি ছিলেন। প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে তিনিও ভাবগর্ভ বাণী খুঁজে পেতেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গল্প আছে প্রজাপতি সমাবর্তনের সময় নিজের তিন শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন। দৈত্য শিষ্যকে বলছেন 'দাম্যত' অর্থাৎ আত্মদমন কর; মানুষ শিষ্যকে বলছেন 'দত্ত' অর্থাৎ দান কর; আর দেবতা শিষ্যকে বলছেন 'দয়ধ্বম্' অর্থাৎ দয়া কর। দৈত্য স্বভাবত ক্রোধপরায়ণ: তাই তাকে আত্মদমনের উপদেশ। মানুষ স্বভাবত লোভী; তাই তাকে দান করতে উপদেশ। আর দেবতা অসীম শক্তির আধার; তাই তাকে দয়া করতে উপদেশ যাতে না সেই শক্তির অপপ্রয়োগ ঘটে। এখন সাধারণ মানুষ আমরাও ক্রোধপরায়ণ হই, লোভী হই, ক্ষমতার পদে আসীন হই। সুতরাং এই উপদেশ আমাদের সকলেরই উপর প্রয়োগযোগ্য। ঋষি বলেন, তাই নাকি বর্ষার দিনে আকাশের বুকে যখন বিদ্যুৎ খেলা করে এবং

৫. Finds tongues in trees, books in running brooks, Sermons in stones and good in everything.—As Yon Like It, Act II, Scene I

মেঘ গুরু গুরু গর্জন করে, তখন সেই গুরু গুরু ধ্বনির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রজাপতির সেই উপদেশ বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে দেয়।[৬] যা লক্ষ্য করবার, তা হল এখানে আত্মদমনের কথা বলা হয়েছে, সন্ন্যাসের কথা বলা হয় নি।

সেকালে আত্মদমনের জন্যই শিক্ষাজীবনে ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা ছিল। তা সন্ন্যাসের প্রস্তুতি নয়, গৃহস্থ-জীবনের প্রস্তুতি। এ বিষয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় সমাবর্তনের দিনে আচার্য এই বলে অন্তেবাসী বা শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন—'সত্য কথা বলবে। ধর্ম আচরণ করবে। বেদ পাঠ হতে বিরত হবে না। আচার্যকে প্রিয় উপহার দেবে। বংশধারাকে অব্যাহত রাখবে।[৭] এখানে বংশধারাকে অব্যাহত রাখার উপদেশটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শিষ্য শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থানের পর আদর্শ সংসারী রূপে সংসারধর্ম পালনের উপযুক্ত হয়েছেন। তাই গুরু তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে। পূর্বে কৃচ্ছ্র সাধন করে শিষ্য ভোগের জীবনের উপযুক্ত হয়েছেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আত্মসংযম তাঁর পক্ষে সহজ হবে। ভোগের জন্যই কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন; তা সংযমের সহিত ভোগ সহজসাধ্য করে। জীবনে ত্যাগেরও স্থান আছে, ভোগেরও স্থান আছে। শুধু ভোগ বা শুধু সন্ন্যাস সামগ্রিক কল্যাণের পরিপন্থী।

এখন প্রশ্ন ওঠে সামগ্রিক কল্যাণ কোন্ কর্মদ্বারা সাধিত হয়, কোন কর্ম শ্রেয়ের পথে আমাদের নিয়ে যায়, তা নির্ধারণ করব কি করে। তা নির্ধারণ করবার জন্য উপনিষদে একটি নীতিও স্থাপন করা হয়েছে। সেটিও পাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত সমাবর্তনের দিনে দেওয়া আচার্যের উপদেশ হতে। তিনি বলেছেন, যা অনবদ্য

৬. তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতত্ত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি। বৃহদারণ্যক ॥ ৫॥২॥৩

৭. সত্যং বদ ॥ ধর্মং চর ॥ স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদঃ ॥ আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ১॥২

কর্ম তাই হল কর্তব্য কর্ম।[৮] তাকেই গ্রহণ করতে হবে। এখানে দেহের স্বার্থ বা মনের স্বার্থের প্রশ্ন ওঠে না, বা ব্যক্তিস্বার্থ এবং সমাজের স্বার্থের প্রশ্ন ওঠে না। এখানে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন একটি নীতি স্থাপিত হয়েছে যা সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে। তাই হল অনবদ্য কর্ম যার কোন দৃষ্টিভঙ্গি হতেই দোষ ধরা যায় না। তা একদিকে দেহের ও মনের কল্যাণ-সাধন করবে, অপরদিকে স্বার্থ ও পরার্থের সংঘর্ষের সমাধান করবে, এমন কাজ করতে উপদেশ দেবে যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ-সাধন করে। এই উপদেশ অন্তে-বাসীর উদ্দেশে প্রদত্ত হলেও তা সমাজের সকল মানুষের উপর প্রযোজ্য।

উপনিষদের নৈতিক সমস্যার আলোচনায় কাজেই এমন একটি নির্দেশ পাই যার প্রয়োগে জীবনের নৈতিক সমস্যার সমাধান করা সহজ। জীবনে যখনই কোন বিপরীত আকর্ষণের দোটানায় পড়া যায় তখনই এই নীতির প্রয়োগে কর্তব্যপথ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এই নীতিকে কর্মের অনবদ্যতা নীতি বলতে পারি। একমাত্র কান্ট-এর দর্শনের সঙ্গেই এর তুলনা চলতে পারে। তিনিও এমন একটি নীতি স্থাপন করে দিয়ে গেছেন যা দোটানায় পড়লে পথ নির্দেশ করতে পারে। তিনি নীতির নির্দেশকে 'ক্যাটিগোরিকাল ইমপারেটিভ' বলেছেন।[৯] তাঁর মতে নৈতিক বিচারবুদ্ধি শুধু বলে না, 'এটা করা উচিত'; তা স্পষ্টতই বলে 'এটা করতেই হবে।' এটি একটি নির্দেশ। তার বাধ্যবাধকতা গুণ নির্দেশ করতেই তিনি এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

এখন কোন্‌টা করতে হবে সে বিষয় নির্দেশ খুঁজতে তিনিও উপনিষদের মতো একটি নীতি স্থাপন করেছেন যার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ

৮. যান্যনবদ্যানি কর্মাণি ॥ তানি সেবিতব্যানি ॥ নো ইতরাণি ॥
তৈত্তিরীয় ॥ ১।১১।২

৯. Categorical Imperative

সম্ভব। সে নীতিটি বলে: 'এই কথা মনে রেখে কাজ কর যে প্রতি মানুষের' তোমার নিজের রূপে হক বা অন্যের রূপে হক, স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত এবং কখনও তাকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়।[১০] অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই স্বার্থ শ্রদ্ধার সহিত সংরক্ষিত হওয়া উচিত: নিজের স্বার্থ হতে অন্যের স্বার্থ কম মূল্যবান নয়। সকলেরই ব্যক্তিগত স্বার্থ সমান মূল্য পাবে, কারও স্বার্থের হানি ঘটিয়ে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করা চলবে না।

কাণ্ট-এর প্রস্তাবিত এই রীতির কার্যকারিতার বিষয় কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের দিক থেকে দেখলে প্রশ্ন ওঠে ব্যক্তির স্বার্থ প্রাধান্য পাবে, না অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ স্বার্থ বড় হবে না পরার্থ বড় হবে। কাণ্ট-এর প্রস্তাবিত নীতি বলে তাদের কোনটিই অন্যের ক্ষতি করে প্রাধান্য পাবে না; তারা সকলেই সমান প্রাধান্য পাবে। কার স্বার্থ প্রাধান্য পাবে, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর; তা বলে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে যে কাজ কারও স্বার্থের হানি ঘটাবে না মনে হবে, সেই কাজ করতে হবে।

সামগ্রিক কল্যাণই এখানে লক্ষ্য হওয়া উচিত; কেবল ব্যক্তি-বিশেষের বা কেবল গোষ্ঠীর, কল্যাণ নয়। সুতরাং দেখা যায় এই নীতি ব্যক্তিস্বার্থ এবং গোষ্ঠীস্বার্থ, অর্থাৎ স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধ সমাধানের শক্তি রাখে; এখানে তার প্রযুক্তি সুফলপ্রদ।

কিন্তু মনে হয় আর একটি যে দ্বন্দ্ব আছে সে বিষয়ে কাণ্ট-এর নীতি আলোকপাত করে না। সে দ্বন্দ্ব হল ব্যক্তিমানুষের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব; দেহের স্বার্থের সঙ্গে মনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এ বিষয় সম্ভবত কাণ্ট-এর দৃষ্টি পৃথকভাবে আকৃষ্ট হয় নি। এখানেই উপনিষদের নীতির অতিরিক্ত উৎকর্ষ; কারণ তার নীতি এ দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা

১০. 'So act as to regard humanity, whether in thy own person or in that of another, always as an end, never as a means.'
—Critique of Practical Reason.

করে দিয়েছে। শ্রেয়তত্ত্ব বলে দেহ ও মন—এদের কারও বিশেষ স্বার্থ আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। দেহ-মন জড়িয়ে সমগ্র মানুষটির যা কল্যাণ সাধন করবে তাই শ্রেয়। এমন কাজই করতে হবে। যা দেহের দিক তথা মনের দিক হতে অনবদ্য হবে, সেই কাজ করবে। সুতরাং উপনিষদের শ্রেয়তত্ত্ব কাণ্ট-এর 'ক্যাটিগোরিক্যাল ইম্পারেটিভ' তত্ত্ব হতে আরও ব্যাপক এবং উপনিষদের নীতি দুটি মূল নৈতিকসমস্যারই সমাধান করবার ক্ষমতা রাখে।

উপনিষদের নীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তা নীতির ক্ষেত্রে হৃদয়বৃত্তিকে বর্জন করে না। তা মানুষকে দয়া করতে এবং প্রীতি করতে উৎসাহ দিয়েছে। ঠিক বলতে কি হৃদয়বৃত্তিকে ব্যবহার করে, কর্তব্যকর্মকেও প্রিয় করে নিয়ে নীতির কঠোরতা দূর করতে চেয়েছে। ব্যক্তির স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বে তার প্রয়োগের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রতি মানুষই নিজের স্বার্থের সম্বন্ধে বেশি সচেতন, কাজেই নিজের স্বার্থসংরক্ষণে বেশি তৎপর থাকে। ফলে স্বার্থের সহিত পরার্থের সংঘাত ঘটে।

উপনিষদে এই সমস্যার সমাধান খোঁজা হয়েছে একটি বিচিত্র পথে। এই পরিকল্পনায় বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি—উভয়কেই ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, কোনটিকেই বর্জন করা হয় নি। ঠিক বলতে কি তাদের পরস্পর পরিপূরক ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। মূল ভূমিকা দেওয়া হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিকে, আর তাকে প্রেরণা দেবার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে হৃদয়বৃত্তির ওপর।

কি ভাবে এটা সম্ভব হতে পারে তা বুঝতে হলে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। মোট কথায় উপনিষদে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন চেয়েছে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রসারের সাহায্যে স্বার্থ এবং পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা খুঁজছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত বিকাশ পাই স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসার বিস্তারে। এই ভালবাসাকে বিস্তার করেই স্বার্থ পরিশোধিত হতে পারে। সেটা সম্ভবও বটে। কারণ সকল

মানুষের মধ্যেই স্বার্থ এবং পরার্থবোধ উভয়ই ক্রিয়াশীল। এমন কি একান্ত স্বার্থপর সমাজবিরোধী মানুষও ক্ষেত্রবিশেষে সহজেই স্বার্থ-ত্যাগ করতে পারে এবং পরার্থে আত্মত্যাগ স্বীকার করতে পারে। সন্তানের জন্য যে কোন মা আত্মত্যাগ করতে পারে; ডাকাত পিতাও করতে পারে। প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক সর্বস্ব ত্যাগ করতেও দ্বিধা-বোধ করবে না।

কেন এমন হয়? তার উত্তর হল এ সব জায়গায় ব্যক্তির স্বার্থ সংকুচিত গণ্ডি অতিক্রম করে অন্যের স্বার্থকে নিজের করে নিয়েছে। মা যখন সন্তানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তখন তাঁর কষ্টবোধ হয় না। কারণ, সন্তানের স্বার্থ তাঁর স্বার্থের সহিত একীভূত হয়ে গেছে; কিম্বা বলা যায় মায়ের স্বার্থ বিস্তারলাভ করে সন্তানের স্বার্থকে নিজের করে নিয়েছে। প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদের জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার করে তখন তার কাছে প্রেমাস্পদের স্বার্থ নিজের স্বার্থের অধিক প্রিয় হয়ে উঠেছে। এমন হয়, কারণ এদের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে একটি সচরাচর দৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। একটি ছোট মেয়েকে হয় তো কেউ ভালবেসে কতকগুলি টফি উপহার দিয়েছে। প্রতিবেশী বালক-বালিকা যদি এসে তার ভাগ চেয়ে বসে, সে হয় তো দেবে না। কিন্তু বাড়িতে এসে নিজের ভাই-বোনদের মধ্যে না চাইলেও সে ভাগ করে তাই খেতে দেবে। আচরণের মধ্যে এই ভিন্নতার কারণ হল প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার প্রীতির সম্বন্ধ তত গভীর নয়; আর পরিবারের ছেলেমেয়েদের আপনজন মনে করে বলে তাদের প্রতি তার প্রীতি গভীর হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই তাদের সঙ্গে ভাগ করে একটা ভাল জিনিস ভোগ করতে তার বাধা আসে না।

উপনিষদ এই পথেই স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা খুঁজেছে। তা বলে যখন সকল জীবকে ব্যাপ্ত করে একই মহাসত্তা প্রচ্ছন্নভাবে

বিরাজমান, তখন সকলেই সকলের আত্মীয়। সকল মানুষই একই পরিবারের সন্তানের মতো। এইভাবে ব্রহ্মের প্রকৃতির পরিচয় হতে যখন সকলের মধ্যে একত্ববোধ বিকাশলাভ করবে তখন তা হতে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতাবোধও পরিস্ফুট হবে। তখন সকলেই সকলকে আত্মীয়েব মতো ভালবাসবে এবং ফলে স্বার্থের সংঘাত আর থাকবে না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, জায়ার নিকট যে পতি প্রিয় হয় তা পতির কারণে নয়; পতির কাছে যে জায়া প্রিয় হয় তা জায়ার কারণে নয় ইত্যাদি। তিনি বলেছেন তারা প্রিয় হয়, তার কারণ সকলকে ব্যাপ্ত করে একই আত্মা বর্তমান আছেন।'[১১] এখানে আত্মা কথাটির দ্বারা সব কিছু ব্যাপ্ত করে যে সত্তা আছেন (অর্থাৎ ব্রহ্ম) তাঁকেই সূচিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই সব কিছুই সেই আত্মা,[১২] উপনিষদে সাধারণত আত্মাকে ব্রহ্মের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির মর্ম হল এক অখণ্ড সত্তার অঙ্গীভূত বলেই আমরা পরস্পরের প্রিয় হই।

ঈশ উপনিষদে এই তত্ত্বটি অবলম্বন করে সকল মানুষকে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে অখণ্ডতাবোধ হতে বা একাত্মতা বোধ হতে প্রীতির প্রেরণা দেওয়া এবং প্রীতিবোধ হতে স্বার্থকে পরিশোধিত কররার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সকলেই একই মহাসত্তার প্রকাশ, সকলেই সকলের ভাইবোনের মতো। সুতরাং স্বার্থপরের মতো একাকী সম্পদ ভোগ করবার কোন অর্থ হয় না। তাই সেখানে

১১ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভবত্যাত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪।৫।৬

১২. ইদং সর্বং যদয়মাত্মা॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪।৫।৭

পরস্পর ভাগ করে ভোগ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যুক্তি হল বিশ্বে যা কিছু আছে সবই তো একই মহাসত্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সুতরাং উপদেশ দেওয়া হয়েছে ত্যাগের সহিত ভোগ করতে হবে। কারও ধন অপহরণ করতে নাই। নিজের মানুষের জিনিস কি অপহরণ করা উচিত নাকি?[১৩]

এদিক হতে বিবেচনা করলে উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। তা ভালভাবে বোঝা যাবে গীতা ও কাণ্ট-এর নৈতিক আদর্শের সঙ্গে তুলনা করলে। এ বিষয় অপরপক্ষে গীতা ও কাণ্ট-এর আদর্শ পরস্পরের কাছাকাছি এসে গেছে। সুতরাং এখানে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা দিলে উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমে গীতার কথা ধরা যাক। গীতার আরম্ভই একটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা সকলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁদের সঙ্গে একটি প্রীতির ও মমতার সংযোগ আছে। তাই তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁর মন চাইল না। বিষয়টি হল হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্য-বোধের দ্বন্দ্ব। প্রথম অবস্থায় হৃদয়বৃত্তিই জিতল। অর্জুন বললেন এঁদের হত্যা করতে আমার ইচ্ছে করছে না। পৃথিবী কেন সমগ্র ত্রিলোকের আধিপত্যের জন্যও মারব না।[১৪]

তার পর শুরু হল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। তার তাৎপর্য হল কর্মত্যাগ করতে নেই এবং কর্মফল কি হবে ভেবে কর্তব্য সম্পাদন হতে বিরত হতে নেই। তোমার সম্পর্ক কর্মের সঙ্গে, তার ফলের সঙ্গে নয়।[১৫] সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে কৃষ্ণ উপদেশ দিলেন: অধ্যাত্মচেতনার

১৩. ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ॥ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ ঈশ ॥১

১৪. গীতা॥ ১।৩৫

১৫. গীতা॥ ২।৪৭

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, আমার উপর সকল কর্মের ফল ন্যস্ত করে, ইন্দ্রিয়ের প্রতি অনাসক্ত থেকে এবং মমতাহীন হয়ে বিকার হতে মুক্তিলাভ কর এবং যুদ্ধ কর।[১৬] অর্জুন সেই উপদেশ গ্রহণ করলেন।

সুতরাং গীতায় দুটি জিনিস দেখি। প্রথম, তা সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে বলেছে, কর্মফলে অনাসক্ত থেকে কর্ম করতে বলেছে। দ্বিতীয়, তা মমতাবোধ অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তিকে ত্যাগ করতে বলেছে। অবশ্য তার ব্যতিক্রম আছে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ভক্তি সিদ্ধ বলে গৃহীত হয়েছে ; কিন্তু তাতে আমাদের প্রতিপাদ্যটি ক্ষুণ্ন হয় না। গীতার স্পষ্ট নির্দেশ হল 'কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে হৃদয়বৃত্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে না।' 'নির্মম' হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে।

আমরা দেখি, গীতার এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কাণ্ট-এর দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্য রকম মিল আছে। তিনিও হৃদয়বৃত্তিকে বর্জন করে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর ধারণায় মানুষ দুই জগতের জীব। সে রক্তমাংসের দেহধারী জীব হিসাবে ইন্দ্রিয়সুখকর অনুভূতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। অপরপক্ষে প্রজ্ঞাবান জীব হিসাবে সে বিশুদ্ধ বুদ্ধিশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রজ্ঞাবত্তাই তার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তার কর্তব্য হল ইন্দ্রিয় সুখের আকাঙ্ক্ষা নয়, বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধের দ্বারা কর্মজীবন পরিচালিত করা। প্রজ্ঞার নির্দেশ অনুসারে মানুষ কর্তব্য সম্পাদন করবে, ইন্দ্রিয়সুখের আকর্ষণ সে ত্যাগ করবে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রভাব হতেও সে নিজেকে মুক্ত রাখবে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে গীতা ও কাণ্ট নীতি হতে হৃদয়বৃত্তিকে বর্জন করতে চেয়েছেন। তাঁরা কেবল কর্তব্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্মসম্পাদনের আদর্শকে গ্রহণ করেছেন। অপরপক্ষে

১৬. ময়ি সর্বাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ গীতা॥ ৩।৩০

উপনিষদ, কর্তব্যপথ কি ভাবে নির্ধারিত হবে তার যেমন একটি পথনির্দেশক নীতি দিয়েছে, তেমন কর্তব্য কর্মকে সহজসাধ্য করার জন্ত হৃদয়বৃত্তিরও সহায়তা কামনা করেছে। অখণ্ডবোধ হতে সর্বজনীন প্রীতিসঞ্চার হলে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করা সহজ হয়, এই তার ধারণা। মমতাবোধকে বর্জন করার প্রয়োজন নেই; কারণ তাও একটি শক্তিমান প্রেরণা হয়ে কর্মশক্তিকে পরিবর্ধিত করার ক্ষমতা রাখে। তাই উপনিষদ দয়া প্রীতি মমতা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিগুণকে সাদরে গ্রহণ করেছে।

তিন

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতত্ত্ব

উপনিষদের শ্রেয়তত্ত্বের অনুরূপ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর চিন্তার মধ্যে একটি তত্ত্ব আছে যা শ্রেয়বাদের বেশ কাছাকাছি আসে। তাকে আমরা বিশ্বমানব তত্ত্ব বলতে পারি। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল এই যে সকল মানুষের মধ্যে একটি সত্তা আছেন যিনি মানুষের অন্তরে গোপন থাকেন। তিনিই মানুষের মনে যা-কিছু মহৎ আকৃতি তার প্রেরণা যোগান। তারই ফলশ্রুতি হল মানুষের কীর্তিময় ইতিহাস। তাঁরই আহ্বানে ব্যক্তিমানুষ শিল্পী হয়। তিনি ঠিক প্রত্যেক মানুষের যোগফল নন। তিনি বিশেষ মানুষের মধ্যে থেকে, তাকে অতিক্রম করেন এবং সকল মানুষের মনকে ব্যাপ্ত করে থাকেন। এই তত্ত্বটি দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের নানা লেখার মধ্যে তার সম্বন্ধে মন্তব্য ছড়িয়ে আছে। সেগুলি একত্রিত করে সুসংবদ্ধ আকারে এখানে সাজাবার চেষ্টা হবে।

তার আগে এই তত্ত্বটির নাম নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি। রবীন্দ্রনাথ একই ধারণাকে বোঝাতে যে পরিভাষা প্রয়োগ করেন, অনেক সময় তা একটি নির্দিষ্ট নামে সীমিত থাকে না, অর্থাৎ একই তত্ত্ব বোঝাতে তিনি অনেক শব্দের ব্যবহার করেন।

বর্তমান আলোচনায় দেখব এই বিভ্রাট ঘটেছে অতিমাত্রায়। ফলে একটি জটিল বিষয় জটিলতর হয়ে পড়েছে। সেই কারণে মনে হয় আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমেই যে নামগুলি এই তত্ত্বটিকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হবার প্রয়োজন আছে। তার ফলে পরবর্তী আলোচনায় যখন তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করে স্থাপন করা হবে তখন তাদেব মধ্যে পরস্পরের বৈসাদৃশ্য হেতু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে না। তাতে তাঁকে বোঝা আমাদের সহজ হবে। সুতরাং প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবকে সূচিত করতে যে-সব বিকল্প পরি-ভাষার ব্যবহার করেছেন তাদের একটি তালিকা দেবার প্রস্তাব করি।

সকল মানুষকে ব্যাপ্ত করে এবং তাদের অতিক্রম করে যে অভিনব সত্তার রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা করেছেন তাকে তিনি বিশ্বমানব বলে অভিহিত করেছেন এবং তার সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে 'বড়ো-আমি' কথাটিরও ব্যবহার করেছেন।[১৭] বড়ো-আমি কথাটির তিনি অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে তাঁর 'শান্তিনিকেতন'-এর ভাষণমালায়। তাঁর ধারণায় মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা আছে: একটি ছোট-আমি এবং অপরটি বড়ো আমি। ছোট-আমি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত আর বড়ো-আমি সকল মানুষের কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট।

একেই তিনি অন্যত্র মহামানব বলেছেন।[১৮] তা কোন মহান ও বিশিষ্ট মানুষকে বোঝায় না; যে সত্তা সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করে তাকে সূচিত করে।

তাঁর ইংরাজি আলোচনায় এই বিশ্বমানব সত্তাকে সূচিত করতে তিনি অনুরূপভাবে একাধিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁকে তিনি 'সুপ্রিম ম্যান' বলেছেন।[১৯] তার বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে তাঁরই ব্যবহৃত 'মহামানব' শব্দটিকে ব্যবহার করতে পারি।

১৭. আত্মপরিচয় ৩
১৮. আত্মপরিচয় ৫
১৯. Supreme Man, Religion of Man, Chap. X

একই প্রসঙ্গে তাকে সূচিত করতে তিনি 'ইউনিভার্সাল ম্যান' কথাটির ব্যবহার করেছেন।[২০] তার প্রতিশব্দ হিসাবে তাঁর বিশ্বমানব পারিভাষিক শব্দটিকে ব্যবহার করতে পারি। অন্যত্র তিনি এই সত্তাকে সূচিত করতে 'ম্যান দি ইটারনাল' কথাটির ব্যবহার করেছেন।[২১] তার কোন বাংলা পারিভাষিক শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নি। তাকে সনাতন মানব বলে অনুবাদ করতে পারি। ব্যক্তিমানুষের লয় আছে; কিন্তু এই মানুষের লয় নেই, কারণ তাঁর অবস্থিতি সকল মানুষকে নিয়ে। সকল কালের সকল মানুষের মধ্যে তিনি বিরাজমান।

এখন আমরা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানব তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব। তাঁর ধারণায় প্রতি ব্যক্তিমানুষের মধ্যে দুটি পৃথক কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত সত্তা অবস্থান করে। তাদের একটি দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনধারণ নিয়ে ব্যাপৃত। কাজেই তার দৃষ্টিভঙ্গি সংকুচিত। অতিরিক্তভাবে তার মধ্যে একটি পৃথক মানব সত্তা আছেন, তিনি ব্যক্তিজীবনের সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনা করেন। তাঁকে তিনি মহামানব বলেছেন। দুই অর্থে তিনি মহামানব। প্রথমত তিনি সকল ব্যক্তিমানুষকে ব্যাপ্ত করে আছেন। দ্বিতীয়ত তিনি ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সকল মানুষের কল্যাণসাধন করতে আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে কবি নিজে সাড়া দিয়েছিলেন। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই:

'আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডিকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি।'[২২]

২০. Universal Man, Religion of Man, Chap, X
২১. Man the Eternal, Religion of Man, Chap. IX
২২. আত্মপরিচয় ৩

উপরে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে উপনিষদের বচনের উদ্ধৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস এই মহামানব বা বিশ্বমানব বা নিত্যকালের মানব প্রতি মানুষের মনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। আরও বোঝা যায় এই সত্তা মানুষকে আত্মত্যাগে উৎসাহিত করে। স্পষ্টই স্বীকৃত, রবীন্দ্রনাথ এই সত্তার নিকট আত্মত্যাগের প্রেরণা পেয়েছেন।

এই সত্তাকে তিনি মানব বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ ব্যক্তিমানব হতে তিনি স্বতন্ত্র। তিনি অন্তরে আছেন, কিন্তু ব্যক্তিমানবকে অতিক্রম করে আছেন। তিনি সকল মানুষে আছেন। মানুষ যায়, মানুষ আসে, কিন্তু তিনি নিত্য; তাই তিনি সর্বকালীন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি লক্ষ্য করা যেতে পারে: 'আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন, যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ,' যিনি সর্বকালীন মানব।'[২৩]

এখন প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তিমানব ও বিশ্বমানবের মধ্যে সম্বন্ধটা কি ধরনের? ব্যক্তিমানব মনের যোগফল কি বিশ্বমানব মন? রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, তা নয়। বিশ্বমানব মন ব্যক্তিমানব মনের গাণিতিক সমষ্টিমাত্র নয়। তাঁর ধারণা এদের মধ্যে একটি আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্বন্ধ বর্তমান। বিশ্বমানব মন ব্যাপক এবং তার মধ্যে ব্যক্তিমানব মন আশ্রিত। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই: 'বলব বিশ্বমানব আছে। কিন্তু সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে বিশ্বমানব মনের মহাদেশ সৃষ্ট, এ-কথা বলব না। ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত, কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়।'[২৪]

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাটিকে সহজবোধ্য করতে একটি উপমা ব্যবহার করলে সুবিধা হবে। ব্যক্তির সঙ্গে একটি রাজনৈতিক অর্থে জাতির তুলনা করা যেতে পারে। বহু ব্যক্তি একটি ভৌগোলিক খণ্ড

২৩. মানুষের ধর্ম। ভূমিকা
২৪. মানুষের ধর্ম ২

অধিকার করে একটি জাতি গড়ে তোলে। ব্যক্তির যেমন নিজের স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল, তেমন জাতির ক্ষেত্রে জাতির সামগ্রিক কল্যাণের সহায়ক নানা আশা-আকাঙ্ক্ষাও ক্রিয়াশীল হয়। ওই জাতির অবস্থিতি এক বিশেষ ভূখণ্ডে নয়, সেই ভূখণ্ডে যে মানুষগুলি বাস করে তাদের মনের মধ্যেই। জাতিবোধ-রূপে তা জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অবস্থিত এবং ব্যক্তি-মানুষকে অবলম্বন করেই তা ক্রিয়াশীল। জাতি গড়ে তোলবার এবং জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে আত্মত্যাগ করবার প্রেরণা জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মনে উদয় হয়ে তাকে তার ক্ষুদ্রস্বার্থের গণ্ডি ডিঙিয়ে বৃহত্তর কল্যাণকর্মে প্রণোদিত করে।

আমার মনে হয় বিশ্বমানব ও ব্যক্তিমানবের যে পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন তার সঙ্গে ব্যক্তি ও জাতির সম্বন্ধের তুলনা চলতে পারে। ব্যক্তি অস্থায়ী; সে জন্মায়, মরে যায়; কিন্তু জাতি নিত্য। সেইরূপ ব্যক্তিমানব অনিত্য; সে জন্মায়, চলে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় বিশ্বমানব নিত্য। জাতির মনের কোন স্বতন্ত্র অবস্থিতি নেই। তার ব্যক্তিমনেই অধিষ্ঠান। যাকে জাতীয়তা-বোধ বলি তা জাতিমনের অস্তিত্ব সূচিত করে। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় বিশ্বমানব মনের ব্যক্তির বাহিরে অবস্থিতি নেই। তিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' একটি জাতি তার অন্তর্ভুক্ত মানুষগুলির সমষ্টি নয়, তাদের অতিরিক্ত কিছু। তার কর্মক্ষেত্র ব্যাপকতর, সমগ্র জাতির কল্যাণ তার কামনার বস্তু। এই হিসাবে জাতির মন ব্যক্তির মনকে অতিক্রম করে। অনুরূপভাবে দেখি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় বিশ্বমানব ব্যক্তিমানবের সমষ্টি নয়, তাদের অতিক্রম করে এবং এক ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তা ক্রিয়া করে। ঠিক বলতে কি জাতির কর্মক্ষেত্র এবং আদর্শ হতে বিশ্বমানবের কর্মক্ষেত্র এবং আদর্শ অনেক ব্যাপক। তা বিশেষ ভূখণ্ডের দ্বারা চিহ্নিত জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত গোষ্ঠীর স্বার্থকে অতিক্রম করে

সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে। স্পষ্টতই এটি একটি মহান আদর্শ এবং মানুষ হিসাবেই মানুষের কল্যাণ এখানে উদ্দেশ্য বলে স্থাপিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ধারণায় যদিও এই বিশ্বমানব প্রতি মানুষের মনের মধ্যেই অবস্থান করেন, সাধারণ ব্যক্তিমানুষ তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করে না। তাঁর অস্তিত্ব অনুভূত হয় আকস্মিকভাবে যখন কোন মহৎ প্রেরণা এসে ব্যক্তিমানুষকে মহৎ কর্ম-সাধনের জন্য আত্মত্যাগে উদ্‌বুদ্ধ করে। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই:

'একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। অকস্মাৎ মানুষ সত্যের জন্য প্রাণ দিতে উৎসুক হয়।' [২৫]

রবীন্দ্রনাথের ধারণায় এই মহামানব বা বিশ্বমানব কল্পনা নয়, একান্তই বাস্তবভাবে সত্য। অবশ্য স্বীকার্য, কল্পনার সাহায্যে তাঁর প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে; কারণ তাঁর ব্যক্তিমানুষের মন ভিন্ন পৃথক অবস্থিতি নেই। তবে তার অর্থ এই নয় যে তিনি মানুষের মনের সৃষ্টি। ঠিক বলতে কি তিনি ব্যক্তিমানুষ হতেও বেশি বাস্তব; কারণ তাঁর অবস্থিতি আরও ব্যাপকক্ষেত্রে, ব্যক্তিমানুষের মনকে অতিক্রম করে সকল মানুষের মনে পরিব্যাপ্ত। এই কথাগুলি পাই তাঁর 'রিলিজিয়ন অফ ম্যান' গ্রন্থে। তার প্রাসঙ্গিক অংশের বাংলা অনুবাদ এখানে স্থাপিত হল; 'মহামানবের ধারণা আমাদের কল্পনা-শক্তির সাহায্যে গড়ে নিতে হয়; তবে তা আমাদের মনের সৃষ্ট পদার্থ নয়। তিনি ব্যক্তিমানুষ হতে বেশি বাস্তব; তাঁর ব্যাপক ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিমনকে অতিক্রম করে আমাদের প্রত্যেককে ছাড়িয়ে যায়।' [২৬]

এখন প্রশ্ন ওঠে, এই বিশ্বমানব মনের ভূমিকা কি? রবীন্দ্রনাথ তারও একটি উত্তর দিয়েছেন। তাঁর ধারণায় এই বিশ্বমানব মনের

২৫ মানুষের ধর্ম। সংযোজন, মানব সত্য
২৬ Religion of Man, Chap XI, Man's Nature

কাজ হল সকল ব্যক্তিমানুষের মধ্যে অবস্থান করে তাদের মহৎ কর্মে প্রেরণা দিয়ে নিজের চরিতার্থতা খোঁজা। তিনি মানবজাতির সামগ্রিক-ভাবে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন চান। এবং তাঁরই প্রেরণায় ব্যক্তিমানুষ জ্ঞান বা প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষের উৎকর্ষসাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করে। মানুষের সকল মহৎ কর্ম তথা কীর্তির তিনি প্রেরণা। মানুষের এই সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি ব্যক্তিমানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। যে ব্যক্তিমানুষের মন তাঁর এই প্রেরণায় সাড়া দেয় সে মহামানবের তৃপ্তিসাধন করে। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই: 'বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের সাধনা, কর্মের সাধনা মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।'[২৭]

তিনি আরও বলেছেন যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্মে মহৎ প্রেরণা দেওয়া ছাড়া অতিরিক্তভাবে এই' বিশ্বমানব মন ব্যক্তিমানুষকে শিল্পসৃষ্টি ও সাহিত্যরচনায় উৎসাহিত করে। সুতরাং তাঁর ধারণায় বিশ্বমানব মনের চরিতার্থতা সাধনের জন্যই ব্যক্তিমানুষ সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করে। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটির বাংলা অনুবাদ এই:

'বিশ্বমানবকে প্রকাশ করবার আকূতি হতেই আমরা শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করি।'[২৮]

সুতরাং এই বিশ্বমানবের স্রষ্টার ভূমিকাও আছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের ধারণায় মানুষের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাতেই সেই নিত্যকালের বিশ্বমানব, ব্যক্তিমানব—অতিক্রামী মানবের প্রকাশ সংঘটিত হচ্ছে। যিনি শিল্পী তাঁর কর্তব্য হল তাঁর শিল্পকর্মে সেই বিশ্বমানবরূপী শিল্পীকে আবিষ্কার করা, অনুভব করা এবং প্রকাশ করা। তাঁর মূল মন্তব্যটির বাংলা অনুবাদ এই দাঁড়ায়:

'মানুষের উচিত তার সকল শিল্পকর্মে সেই বিশ্বমানবরূপী শিল্পীকে

২৭ শান্তিনিকেতন। নববর্ষ'
২৮ Religion of Man, Chap XI, Man's Nature

আবিষ্কার করা, অনুভব করা এবং প্রকাশ করা। মানুষের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা হয়ে দাঁড়ায় অতিক্রামী মানবের বিরামহীন আবিষ্কার।'[২৯]

মনে হয় এই বিশ্বমানব-সত্তার পরিকল্পনাটির অঙ্কুর আকারে তাঁর প্রথম জীবনে প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করবার আগেই আবির্ভাব ঘটেছিল। পরে শেষ জীবনে তা পরিণত রূপও পায়। যখন তিনি 'হিবার্ট বক্তৃতা' দেন তখন তা পরিণতি লাভ করেছিল। তার প্রমাণ হিসাবে আমরা 'চিত্রা'র অন্তর্ভুক্ত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি। তার মর্মকথা হল—সংসারে যখন নানা অভাব-অনটন, তখন কল্পনার অধীনতা স্বীকার করে কাব্যচর্চা শোভা পায় না। তাই কল্পনার কাছে আবেদন সর্বজনীন কল্যাণের কাজে আত্ম-নিবেদনের জন্য তাঁকে যেন সংসারে ফিরতে দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গেই তিনি অনুভব করেছেন মানুষের মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যার আহ্বানে সকল মহৎ মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ অতিক্রম করে মহৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে। 'তারি লাগি রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা, বিষয়ে বিরাগী পথের ভিক্ষুক।' শুধু তাই নয়—

'তারি পদে মানি সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে।'

পরে এই সত্তাকে তিনি বিশ্বমানব বলেছেন, সনাতন মানব বলেছেন, মহামানব বলেছেন এবং তাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দেয় এমন মন্তব্যও তাঁর সম্বন্ধে করেছেন। আমাদের আগের আলোচনায় তার সমর্থন পাওয়া যাবে। তবে যখন এই কবিতা লেখেন তখন এই সত্তার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা তাঁর মনে গড়ে ওঠে নি।

২৯ Religion of Man, Chap IX, The Artist

তা না হলে তিনি বলবেন কেন—

'কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তার লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।'

এখন আমরা ছোট করে এক জায়গায় বিশ্বমানব-তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা স্থাপন করতে পারি! মোটামুটি মনে হয় তাঁর ধারণায় মানুষের মধ্যেই দুটি পৃথক সত্তা আছে: একটি ব্যক্তিমানব, অপরটি বিশ্বমানব। ব্যক্তিমানব সংসারে নিজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অনটন নিয়ে ব্যস্ত। তার দৃষ্টিভঙ্গি খুব সংকুচিত। নিজের স্বার্থ তার কর্তব্যকে নির্ধারণ করে। তাব অতিরিক্ত আর একটি সত্তা মানুষের মনের মধ্যেই আছে। তা প্রতি মানুষে থেকেও ব্যক্তিমানুষকে অতিক্রম করে। তার দৃষ্টিভঙ্গি খুব ব্যাপক। তার আকৃতি হল মানুষকে প্রেরণা দিয়ে সর্বজনীন কল্যাণের কাজে, সাহিত্যে এবং শিল্পসৃষ্টিতে উৎসাহিত করা। তাই মানুষকে উন্নততর জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাকে ব্যক্তিমানুষ হঠাৎ আবিষ্কাব করে যখন কোন মহৎ কর্মের প্রতি সে দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে। একেই তিনি বিশ্বমানব, মহামানব, সনাতন-মানব, বড়ো-আমি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তায় একটি অনুরূপ তত্ত্ব আছে, যাকে জীবনদেবতাতত্ত্ব বলা যায়। তার সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য পরিষ্কার জানা না থাকলে আমাদের জ্ঞানে অস্পষ্টতা এসে পড়বে। সেটি এখানে তাই সংক্ষেপে পরিষ্কার করে নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

জীবনদেবতাতত্ত্বের বিষয় ঈশ্বর, মানুষ নয়। ঈশ্বরের দুই ভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ আছে বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। একটি হল কাজের

প্রকাশ; সেখানে তিনি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন। সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা এবং অসীম। তাঁর আর একটি প্রকাশ আছে যাকে তিনি প্রেমের প্রকাশ বা আনন্দের প্রকাশ বলেছেন। তাঁর ধারণায় নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বসত্তাই ব্যক্তিরূপী হয়ে প্রতি মানুষের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে উৎসুক। যে এই আহ্বানে সাড়া দেয় তিনি ব্যক্তিরূপে নিজেকে সীমিত করে তার হৃদয়ে অধিষ্ঠান নেন। তাই হল 'সীমার মাঝে অসীমের' প্রকাশ। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের দুটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বিধান' শীর্ষক ভাষণে তিনি বলেছেন: 'কিন্তু তিনি ত শুধু বিধাতা নন, 'স এব বন্ধুঃ', তিনিই যে বন্ধু। বিধাতার প্রকাশ ত বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোনখানে? বন্ধুর প্রকাশ ত নিয়মের ক্ষেত্রে নয়, সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে, প্রেমের ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথায় হবে?'

তাঁর 'হিবার্ট' বক্তৃতামালায় তিনি বলেছেন: 'আমার মনে হল আমি অবশেষে আমার নিজের ধর্ম, মানুষের ধর্মকে পেয়েছি; যেখানে যিনি অসীম তিনি ব্যক্তিরূপে সীমিত হয়ে আমার প্রেম ও সহযোগিতা লাভের জন্য আমার কাছে আসেন।

'আমার এই চিন্তা পরবর্তীকালে যাঁকে জীবনদেবতা বলেছি তাঁকে উদ্দেশ করে রচিত কতকগুলি কবিতায় প্রকাশ করেছি।'[৩০]

চার

উভয় চিন্তার তুলনা

এখন আমরা শ্রেয়বাদের সঙ্গে বিশ্বমানব-তত্ত্বের তুলনা করতে পারি। স্পষ্টই বোঝা যায় তারা ভিন্ন জিনিস। তবে তারা কাছাকাছি আসে এবং এক জায়গায় একরকম পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়। শ্রেয়বাদের

৩০ The Religion of Man, The Vision

আদর্শ হল সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। সে কল্যাণ ব্যক্তি-বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি হতে একদিকে যেমন মনের ও দেহের কল্যাণ খোঁজে, তেমন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হতে ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণ খোঁজে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে তার একটি নির্দেশক নীতি তা স্থাপন করেছে। তা হল কর্মের অনবস্থতা। তার উপদেশ, সকল দৃষ্টিভঙ্গি হতে যা অনুমোদনযোগ্য হবে তাই করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানব-তত্ত্ব খানিকটা ভিন্ন মহলের জিনিস। তা কেবল কল্যাণের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়। তা মানুষের সর্বাঙ্গীণ আত্ম-বিকাশের প্রেরণা কোথা হতে আসে, তাই নির্দেশ করছে। তা বলে মানুষের একটি সংকুচিত জীবন আছে এবং একটি ব্যাপকতর জীবন আছে। সেই সংকুচিত জীবনই সাধারণ ব্যক্তিবিশেষের আকাঙ্ক্ষিত জীবন। তাকে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের মধ্যে যে ছোটো-আমি আছে তাই। আর তার অতিরিক্তভাবে তার মধ্যে একটি বড়ো-আমি আছে। তা ব্যক্তিমনকে অতিক্রম করে সকল মানুষের মনে আছে। তাই মানুষকে সকল মহৎকর্মে প্রণোদিত করে। তার আহ্বানে সাড়া দিয়েই ব্যক্তিমানুষ তার সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

সুতরাং বলতে পারি যে জীবনদেবতা ও বিশ্বমানব ভিন্ন সত্তা। একটির সঙ্গে সংযোগ ঈশ্বরের, অপরটির সঙ্গে সংযোগ মানুষের। দ্বিতীয়ত, বিশ্বমানব-তত্ত্ব কেবল নৈতিক সমস্যা নিয়ে জড়িত নয়, মানুষের সকল পথে বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে জড়িত। কেবল আনুষঙ্গিকভাবে সর্বজনীন কল্যাণ ও তার আলোচনার বিষয়। সামগ্রিক স্বার্থের জন্য ব্যক্তিস্বার্থের বিসর্জনেও বিশ্বমানব প্রেরণা দেয়। শুধু এখানেই মনে হয় শ্রেয়বাদের সঙ্গে তার সংস্পর্শ ঘটেছে।

তবে উপনিষদের নৈতিক চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার দুটি ক্ষেত্রে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে উপনিষদ

সংযমের উপদেশ দিয়েছে, কিন্তু সন্ন্যাসের উপদেশ দেয় নি, সংসার-জীবনকে পরিহার করতে বলে নি। দ্বিতীয়ত, আমরা লক্ষ্য করেছি, স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বে উপনিষদ হৃদয়বৃত্তির ব্যবহার করেছে। উভয়ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা উপনিষদের অনুগামী। তিনিও সংযম শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু বৈরাগ্য অনুমোদন করেন নি। তিনিও স্বার্থপরতা বোধ পরিশোধিত করে পরার্থ বোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। উভয়েই অখণ্ডবোধ হতে সকল মানুষের প্রতি প্রীতির সঞ্চার করা যায় বিশ্বাস করেন এবং তাই, প্রীতির সাহায্যে স্বার্থবোধকে পরিশোধিত করতে উপদেশ দেন। রবীন্দ্রনাথ স্বার্থকে বিস্তার করে পরার্থে সঞ্চারিত করতে বলেছেন। তাঁর ধারণা তাতে ব্যক্তিগত সুখের বাসনা ছড়িয়ে গিয়ে লয় হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গত পরবর্তী অধ্যায়ে মানবিকতার বিষয় আলোচনা সূত্রে আপনি এসে পড়বে। সুতরাং এ বিষয় বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে না। এখানে উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসকে যে গ্রহণ করা হয় নি সে বিষয়টির আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে।

এখানে সন্ন্যাস অর্থে হবে কর্মসন্ন্যাস এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করে, ভোগসুখ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া। এর পিছনে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল থাকে। তা বলে, সংসার অসার, সংসার মায়া, সংসার দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলেন, এই মায়াময় সংসার ছেড়ে ব্রহ্মে মনোনিবেশ কর। 'মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।' যোগবাদী সন্ন্যাসী বলেন, সংসারে সুখ নেই; কাজেই নারীকে বর্জন কর; নারীকে বর্জন করলে সংসারকে ত্যাগ করা হবে; এবং সংসারকে ত্যাগ করতে পারলে সুখী হবে। 'স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং. জগৎ ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।' এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন উপনিষদও গ্রহণ করে নি, রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেন নি।

এই সম্পর্কে উপনিষদের চিন্তা এই গ্রন্থের প্রথম অংশে ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। তবু তুলনার প্রস্তুতি হিসাবে কিছু পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হবে। ঈশ উপনিষদের প্রথম অংশের দুটি কথার উল্লেখ করলেই আমাদের চলবে। তাতে আছে, 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। এই তাৎপর্যপূর্ণ বচনটি একেশ্বরবাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে ব্যাখ্যা করা হয়, ঈশ্বর যা দেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদ ত একেশ্বরবাদ গ্রহণ করে নি; তা প্রচার করেছে যাকে বলা হয় সর্বেশ্বরবাদ; অর্থাৎ সেখানে ঐশী শক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী সত্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে। কাজেই সঙ্গত অর্থ হবে ত্যাগের সহিত ভোগ করা উচিত; ভাগ করে ভোগ করা উচিত। কারণ সকলেই এক অখণ্ড মহাসত্তার অঙ্গ। তার অব্যবহিত পরেই যে বচনটি পাই তা বলে: 'কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'। অর্থাৎ সংসারে থেকেই কর্ম করতে হবে শত বৎসর জীবনধারণের ইচ্ছা পোষণ করে। সন্ন্যাস নয়, কর্মকেই এখানে গ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে ভোগ করতেও নিষেধ করা হয় নি; অন্যের স্বার্থ দলিত করে ভোগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই উপনিষদে সংযমের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, বিশুদ্ধ সন্ন্যাসের নয়।

এ বিষয় আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তার অনুসরণ করেছে। উভয়ের চিন্তায় আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ দেখি সংযমকে গ্রহণ করেছেন সন্ন্যাসকে করেন নি। তিনি একথা বলেন না যে ত্যাগের মোটেই প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন সন্ন্যাসের জন্যই সন্ন্যাস আকর্ষণের বিষয় নয়। তিনি স্বীকার করেন শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে সংযমের প্রয়োজন আছে। তা মনকে সংযত হতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু তার ভূমিকা মুখ্য নয়, গৌণ। তাঁর ধারণায় সন্ন্যাসকে মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলে তা হয়ে দাঁড়ায় আত্মবঞ্চনার সাধনা। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই: 'আত্মহত্যা ত সাধনার বিষয় হইতে পারে না, আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। বস্তুত শিক্ষাকালে

ব্রহ্মচর্য পালন শুষ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না। রসের জন্যই এই নীরসতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।' ৩১

তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি 'নৈবেদ্য'-এর একটি কবিতায় বেশ দৃপ্তভাষায় ঘোষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ দিয়ে গড়া এই ধূলিময় ধরণী মায়া নয়, প্রপঞ্চ নয়; এর মধ্যেই বিশ্বসত্তার প্রকাশ। সংসারই সেই অখণ্ড সত্তার সহিত মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সুতরাং ইন্দ্রিয় নিরোধ করে তার সহিত সংযোগ ছিন্ন করা আত্মপ্রবঞ্চনা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি সংসার হতে পালিয়ে যাবার উপদেশের পিছনে কোন যুক্তি দেখেন নি।

তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন এইভাবে—

'ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।'

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নিজের মতিগতির পথে গড়ে উঠেছিল। কারণ এই চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে দেখা যায় তাঁর একান্ত তরুণ বয়সে রচিত একটি নাট্যে। তাকে অবলম্বন করে তাঁর এই চিন্তাটি তিনি পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন। নাটকটির নাম 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', রচনাকাল ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ। কাহিনীতে আছে, এক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী সংসারকে মায়া জ্ঞান করে ত্যাগ করে সিদ্ধিলাভ করলেন। তিনি পরিভ্রমণে রত অবস্থায় একটি অনাথা অস্পৃশ্যা বালিকাকে দেখতে পেয়ে তাকে আশ্রয় দিলেন। ফলে তার সহিত একটি স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠল। তখন একটি অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত

৩১. সাহিত্য, সৌন্দর্য

ইনী। তাকে মায়াজ্ঞানে ত্যাগ করলেন; কিন্তু হৃদয়বৃত্তি আবার প্রবল হয়ে তাকে তাঁর কাছে টেনে আনল। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে; বালিকা তখন নিদারুণ শোকের আঘাতে মারা গিয়েছে। মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা না করে অধ্যাত্মসাধনা করতে যাওয়ায় প্রকৃতি এমন ভাবেই প্রতিশোধ নিয়েছিল। এ যেন অদ্বৈতবাদ আশ্রিত দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নাটকটির তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন:

'শেষ কথাটা এই দাঁড়ালো শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ; বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায়, সেই যথার্থ পায়।'

সপ্তম অধ্যায়

মানবিকতা

এক

উপনিষদের মানবিকতা

মানবিকতা কথাটি দর্শনের পরিভাষা হিসাবে নূতন সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু তা এত বিভিন্ন রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে আমরা তাকে কোন্ অর্থে ব্যবহার করব সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা না হলে চিন্তায় অস্বচ্ছতা এসে পড়বে। রিউমস সঙ্কলিত দর্শনের অভিধানে তার সাতটি অর্থ দেওয়া হয়েছে।[১] তাদের কোনোটি পাঠনের প্রসঙ্গে, কোনোটি নীতিশাস্ত্রের, কোনোটি দর্শনশাস্ত্রের, কোনোটি ধর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের সব ক'টির বর্তমান ক্ষেত্রে বিস্তারিত পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। আমরা বর্তমান আলোচনায় তাকে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করব। মানবিকতার এই প্রসঙ্গে অর্থ দাঁড়ায়, তা সেই চিন্তাকে বোঝায় যা মানুষের কল্যাণকেই ধর্ম-আচরণের মূল অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত করে। বর্তমান আলোচনায় সেই অর্থেই এই পারিভাষিক শব্দটিকে ব্যবহার করব।

এই ধরনের মানবিকতা দুই শ্রেণীর হতে পারে। মানবজাতির কল্যাণ ও সেবা ঈশ্বরচিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে, নাও পারে। ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিয়ে মানবিকতা প্রচার করা যেতে পারে; আবার ঈশ্বরকে বর্জন করেও মানবিকতা প্রচার করা যেতে পারে। আমাদের দেশের চিন্তায় ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে মানবিকতা প্রচারের একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। মনুসংহিতায় পাঁচ শ্রেণীর যজ্ঞ

১. D. D, Rumes—Dictionary of Philosophy.

সম্পাদন করতে গৃহীকে উপদেশ দেওয়া হত: দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ।[২] অর্থাৎ সেখানে মানুষের কল্যাণমূলক কাজকেও ধর্মাচরণের অঙ্গ বলে পরিগণিত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মানুষের চিন্তায়ও অনুপ্রবেশ করেছিল। মানুষকে নরনারায়ণ বলা হয়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে এই সংস্কার বর্তমান যে মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। গরীব মানুষকে দরিদ্রনারায়ণ বলা হয়। অর্থাৎ অবহেলিত মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ সে সংস্কারও তাদের মধ্যে বর্তমান। এখানে মানবিকতা ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল।

আর এক শ্রেণীর মানবিকতা আছে যা ঈশ্বরকে বর্জন করে গড়ে উঠেছিল। তার ভালো দৃষ্টান্ত ফরাসী দার্শনিক কোঁত-স্থাপিত মানবিকতা। তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছিল একটি হতাশার মনোভাব থেকে। তিনি ধর্ম—তথা দর্শনের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন এই ধারণায় যে তারা নিশ্চিত নির্ভরযোগ্য জ্ঞান পরিবেশন করতে অক্ষম। তাঁর ধারণায় তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান দিতে পারে না। সেইজন্য যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি সেই মানুষকেই তিনি ঈশ্বরের আসনে বসাবার প্রস্তাব করেছিলেন এবং ঈশ্বরের উপাসনার পরিবর্তে মহামানবকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সর্বমানবের সেবাকেই ধর্মাচরণের প্রকৃষ্ট রীতি বলে প্রচার করেছিলেন।[৩]

প্রাচীন উপনিষদের চিন্তায় যে মানবিকতার বিকাশ ঘটেছিল তাকে এই দুই শ্রেণীর কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; কারণ উপনিষদের চিন্তা অনন্যসাধারণ। তা একদিকে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে যেমন গ্রহণ করে নি, তেমন ঈশ্বরকে মানবিকতার আদর্শ হতে বর্জনও করে নি। কারণ উপনিষদের ঋষির প্রেরণা ছিল হৃদয়বৃত্তি নয়, বুদ্ধিবৃত্তি, ভক্তি নয় জ্ঞান-পিপাসা। ব্রহ্মকে জানবার দুর্বার কৌতূহল

২. মনুসংহিতা—।৪।২১
৩. Auguste Counte—Positive Philosophy.

তাঁদের, মনীষা দিয়ে বিশ্বের মৌলিকসত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে উৎসাহিত করেছিল। সত্যকে জানবার জন্য তাঁরা উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই তাঁদের প্রার্থনা-বাণীতে ভক্তির স্পর্শ আদৌ নেই। তাঁরা এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে বিশ্বসত্তা যেন তাঁদের এমন ধীশক্তি দেন যাতে তাঁরা তাঁর বরেণ্য ভর্গ ধীশক্তি দ্বারা গ্রহণ করতে পারেন। তাঁরা বলেছিলেন, 'তিনি ধীশক্তির সহিত আমাদের যুক্ত করুন' (ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ)।[৪]

এই পথে অগ্রসর হয়ে তাঁরা ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ঈশ্বরকে খুঁজে পান নি। তাঁরা পেয়েছিলেন এক অব্যক্ত শক্তির পরিচয় যাঁর পৃথক সত্তারূপে কোনো প্রকাশ নেই। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান, বিশ্বে যা-কিছু আছে সবই তাঁকে আশ্রয় করে আছে। তিনি সব-কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন। তিনি যোগসূত্ররূপে বিশ্বকে অখণ্ডতা মণ্ডিত করেছেন। তাঁকে তাই ব্রহ্ম বলা হয়েছে। যিনি সব থেকে বিরাট, সবকিছু ব্যাপ্ত করে আছেন তিনিই তো ব্রহ্ম। কিন্তু সেই জন্যই তিনি নৈর্ব্যক্তিক-সত্তা। সুতরাং উপনিষদের পরিকল্পনায় ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট নন, তিনি বিশ্বের ধারক এবং নিয়ন্ত্রক মহাশক্তি।

উপনিষদের মানবিকতা এই সর্বেশ্বরবাদের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। সকল বস্তু যে একই মহাসত্তার প্রকাশ এই বোধই উপনিষদের মানবিকতার মূল প্রেরণা। যেহেতু সেখানে হৃদয়বৃত্তি প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল না, জ্ঞানপিপাসাই চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেখানে ঈশ্বরকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা-নিবেদনের বা সেবা করবার কোন ইচ্ছাই লক্ষিত হয় না। ভক্তিতত্ত্ব থেকে পরমাত্মার প্রকৃতি আলোচনাই সেখানে বড় আকর্ষণ। কাজেই তার মধ্যে আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি কোনো অনুরাগ লক্ষ্য করা যায় না। এখানেই বেদের সংহিতা অংশের সঙ্গে তার পার্থক্য। সেই কারণে বেদের সংহিতা অংশকে

৪ বৃহদারণ্যক। ৬।৩।৬ প্রার্থনাটি ঋগ্‌বেদ হতে নেওয়া।

কর্মকাণ্ড বলা হয় এবং উপনিষদ অংশকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়।

এখানেই বলা হয়েছে যে উপনিষদকে অবলম্বন করে যে মানবিকতা গড়ে উঠেছে তার ভিত্তি বিশ্বের অখণ্ডতাবোধ। বিশ্বসত্তা শুধু সকল বস্তুতে নয়, সকল জীবের মধ্যেই অন্তর্যামী রূপে বর্তমান। তিনি শুধু বর্তমান থাকেন না, নিজে অপ্রকট থেকে তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করেন। এই জন্য তাঁর আর এক নাম অন্তর্যামী। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই বচনটি উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে, 'যিনি সকল জীবের মধ্যে অবস্থিত থেকেও তাদের থেকে পৃথক, যাঁর উপস্থিতি বিভিন্ন জীবেরা লক্ষ্য করে না, যাঁর সকল জীব শরীরস্বরূপ, যিনি সকল জীবের অভ্যন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি হলেন তোমার সেই অন্তর্যামী অমৃত-আত্মা।' ৫

এখানে সকল জীবকে ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ কল্পনা করা হয়েছে। তিনিই যে সকল জীবের অজানিত থেকে তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদের বিভিন্ন প্রাণক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন সে-কথা আর এক জায়গায় আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ব্রহ্ম নিজে অখণ্ড থেকেও বিভিন্ন জীবের মধ্যে ক্রিয়া করে বিভিন্ন রূপ নেন। নিশ্বাস-প্রশ্বাস রূপে তিনি প্রাণ হন, কথা বলে তিনি বাক্য হন, দেখে চক্ষু হন, শুনে কর্ণ হন, চিন্তা করে মন হন। মানুষ ভাবে এগুলি বিভিন্ন ক্রিয়া; কিন্তু এগুলি একই প্রাণশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই:

'খণ্ড আকারে তিনি প্রাণধারণ করে প্রাণ হন, কথা বলে বাক্ হন, দেখে চক্ষু হন, শুনে শ্রোত্র হন, মনন করে মন হন। এগুলি তাঁর কর্ম সম্পর্কিত নাম। এই কারণে যে তাঁর পৃথক্ পৃথক ভাবে উপাসনা করে সে তাঁকে (ঠিক) বোঝে না। খণ্ড আকারেই তিনি

৫. যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বানি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৩।৭।১৫

পৃথকভাবে এঁদের মধ্যে অভিব্যক্ত হন। তাঁকে আত্মারূপেই উপাসনা করতে হয়; এখানেই তারা সব এক হয়ে যায়। অতএব এই সব অধিগত করতে হবে এই বুঝে যে (এরা সব) আত্মা। এর দ্বারাই সব কিছু জানা যায়।'[৬]

ব্রহ্মের এই প্রাণক্রিয়া রূপে আবির্ভাবের পরিকল্পনার সহিত বের্গসঁ পরিকল্পিত প্রাণশক্তির[৭] সুন্দর তুলনা চলে। বের্গসঁ-এর পরিকল্পনায় একই বিরাট প্রাণশক্তি সকল প্রাণীদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে প্রাণধারাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাকেই তিনি ঈশ্বর বলেছেন। উপরের মন্তব্যে ব্রহ্মের প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশকে অখণ্ড আত্মারূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রাণশক্তিই সকল জীবকে যুক্ত করে অখণ্ড রূপ দান করছে।

মনে হয় এই অখণ্ডতা বোধ হতেই উপনিষদে জীবহিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়ে ভারতীয় চিন্তায় অহিংসাতত্ত্বের জন্মলাভ হয়েছে। এই অহিংসাতত্ত্বই ভগবান বুদ্ধের চিন্তায় একটি মূলনীতি হিসাবে পরবর্তীকালে গৃহীত হয়েছিল। এই তত্ত্বটি উপনিষদে একটি সুন্দর চিন্তার মধ্যে গড়ে উঠেছে। তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক তত্ত্বটি ঘোর আঙ্গিরস দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে বলেছিলেন বলা হয়েছে। কাহিনীটি এইরূপ: মানুষের জীবনকে সোমযাগের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সোমযাগ পাঁচদিন ধরে হত। প্রথম দিন দীক্ষা, পরের তিন দিন উপসৎ। শেষের দিনটি প্রধান। তার তিনটি অংশ—প্রাতঃ সবন, মধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। এই দিনই

৬. অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো ভবতি বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্বে একং ভবন্তি তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য যদয়মাত্মানেন হ্যেতৎ সর্বং বেদ। বৃহদারণ্যক ।১।৪।৭

৭. Elan Vital.

স্তোত্রগান ও শাস্ত্রপাঠ করতে হয়। তার সঙ্গে তুলনা করে মানুষের জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জীবনের প্রথম চব্বিশ বছর—প্রাতঃ সবনের সহিত, দ্বিতীয় চুয়াল্লিশ বছর মধ্যন্দিন সবনের সহিত এবং শেষের আটচল্লিশ বছর তৃতীয় সবনের সহিত তুলনীয়। মানুষের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ করে ধরা হয়েছে।

সুতরাং এখানে আশ্রমের চারটি অংশকে তিনটি সবনের সঙ্গে সংযুক্ত করে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ দীক্ষা। সংযত, কৃচ্ছ্র_সাধনের জীবনই দীক্ষা। তা ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সহিত তুলনীয়। উপসৎ ভোগের জীবনকে সূচিত করে। অর্থাৎ তা সংসার আশ্রমের সমস্থানীয়। তৃতীয় অংশে স্তোত্র ও শাস্ত্রপাঠের ব্যবস্থা হয়েছে; অর্থাৎ তাকে বানপ্রস্থ ও যতি আশ্রমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তখন শাস্ত্রচর্চাই অবলম্বন হয়। যজ্ঞ করলে দক্ষিণাও দিতে হয়। তারও এখানে ব্যবস্থা আছে। এই যজ্ঞেব শেষে সোমলতা ছেঁচবার পাত্রগুলিকে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। তাকে অবভৃথ বলা হত। মৃত্যুকে অবভৃথ বলে কল্পনা করা হয়েছে। তা জীবন-যজ্ঞের সমাপ্তি সূচিত করে।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদেব বিশেষ সম্পর্ক মানুষের জীবন-যজ্ঞের জন্য যে দক্ষিণার ব্যবস্থা হয়েছে তার সঙ্গে। এই দক্ষিণার ব্যবস্থা আজীবন স্থায়ী। মানুষের নীতিনিয়ন্ত্রিত জীবনই দক্ষিণা; তার অঙ্গ হল তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যভাষণ।[৮]

এখানে অহিংসার উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বে যে প্রাণের ধারা প্রবাহিত তার মধ্যে যে বিশ্ব-সত্তারই বিশেষ প্রকাশ আছে এই বোধ হতেই অহিংসা প্রচারে ঋষি প্রেরণা পেয়েছিলেন মনে হয়। প্রাণী ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ, কাজেই তাকে হনন করতে নেই—এই ধরনের একটা বোধ তাঁদের মনে উদয় হয়ে থাকবে। সুতরাং

৮. প্রাসঙ্গিক বচনটি এই—অথ যত্তপো দান মার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ। ছান্দোগ্য। ৩।১৭।৪

অখণ্ডতা বা বিশ্ববোধ হতেই অহিংসাতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে।

ভগবান বুদ্ধের মধ্যে এই চিন্তা বিশেষ বলবতী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার কারণ কারুণ্যই তাঁর চরিত্রেব বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত এই ঔপনিষদিক চিন্তাদ্বারাও তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ব্রহ্ম-তত্ত্বের সঙ্গেও যে তাঁর পরিচয় ছিল, তার প্রমাণ তাঁর বচন হতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি বহুল-প্রচারিত-বাণীর মূল পালি হতে অনুবাদ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

'মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীর প্রতি তার অনুরূপ অপরিমিত মনোভাব পোষণ করবে। ঊর্ধ্বে, অধে, চতুর্দিকে, সর্বলোকে বাধাহীন, হিংসাহীন, বৈরভাবহীন অপরিমিত অনুরূপ মনোভাব এবং মৈত্রী পোষণ করবে। দণ্ডায়মান, চলমান, উপবিষ্ট এবং শয়ান অবস্থায় যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে এইরূপ স্মৃতি অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।'[১]

এখানে দুটি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম মায়ের সন্তানের প্রতি মমতার দৃষ্টান্তের প্রয়োগ এবং সর্বজীবের প্রতি মমতা বহনকে ব্রহ্মবিহার বলা। মা সন্তানকে এত ভালোবাসেন সন্তান ও তিনি একই বলে। সন্তানকে তিনি নিজেব থেকে পৃথক জ্ঞান করেন না। সুতরাং অপৃথকজ্ঞানেই বুদ্ধ বিশ্বের সকল প্রাণীকে দেখতে বলেছেন। সেই জন্যই তাকে ব্রহ্মবিহার বলেছেন। সকল জীব ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ; সুতরাং এই অখণ্ডবোধ হতেই মমতাবোধ প্রণোদিত আচরণকে ব্রহ্মবিহার বলা যায়। অন্যের প্রতি কল্যাণচিন্তা বহন

১. মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে এবম্পি
সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসাম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবৎ স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।
—সুত্তনিপাত / মেত্তাসুত্ত

এবং কল্যাণকর আচরণ ব্রহ্মের মধ্যে বিচরণের সমস্থানীয় হয়ে দাঁড়ায়। এ-হতে প্রমাণ হয় যে উপনিষদের ভাবধারার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন এবং অখণ্ডবোধ হতে সম্ভবত তিনি মমতাপূর্ণ আচরণের উপদেশ দিয়েছিলেন।

নীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বার্থের সহিত অন্য ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর স্বার্থের যে সংঘর্ষ দেখা যায় তা একটি সমস্যা উত্থাপন করে। প্রতি মানুষই নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে বেশি সচেতন: কাজেই স্বভাবতই নিজের স্বার্থসংরক্ষণের প্রতি বেশি নজর দেয়। এইভাবে স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের সংঘাত নীতিশাস্ত্রে একটি মৌলিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

উপনিষদে এই সমস্যার সমাধান খোঁজা হয়েছে এই অখণ্ডবোধ হতে যে প্রীতি সঞ্জাত হয় তাকে ভিত্তি করে। এই পরিকল্পনায় বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি উভয়কেই পরস্পর পরিপূরক ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়েছে হৃদয়বৃত্তিকে আর তাকে প্রেরণা দেবার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিকে। এই পরিকল্পনাটি সত্যই অভিনব। সুতরাং এই তত্ত্বটিকে সহজবোধ্য করবার জন্য একটু আলোচনার প্রয়োজন।

সংক্ষেপে বলা যায়, উপনিষদ্ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্ধন চেয়েছে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রসারের সাহায্যেই স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ পাই স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসার বিস্তারে। এই ভালোবাসাকে বিস্তার করেই স্বার্থ পরিশোধন হতে পারে, সেটা সম্ভবও বটে; কারণ সকল মানুষের মধ্যেই স্বার্থ ও পরার্থবোধ উভয়ই ক্রিয়াশীল। এমন কি সাধারণ মানুষও বিশেষ ক্ষেত্রে স্বার্থত্যাগ সহজেই করতে পারে এবং পরার্থে অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করতে পারে। সন্তানের জন্য এমন ত্যাগ নেই যা তার মা করতে প্রস্তুত নয়; প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক সর্বস্ব-ত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

কেন এমন হয়? তার উত্তর হল, এসব জায়গায় ব্যক্তি-বিশেষের

স্বার্থ সঙ্কুচিত ক্ষেত্র অতিক্রম করে অন্যের স্বার্থকে নিজের করে নিয়েছে। মা যখন সন্তানের জন্য ত্যাগস্বীকার করেন, তাঁর কষ্টবোধ হয় না। কারণ, সন্তানের স্বার্থ তাঁর স্বার্থের সহিত একীভূত হয়ে গেছে। প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদের জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার করে তখন তার কাছে প্রেমাস্পদের স্বার্থ নিজের স্বার্থের অধিক প্রিয় হয়ে ওঠে। এমন হয়, তার কারণ এদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে।

আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে একটি সচরাচর দৃষ্ট উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। ধরা যাক, একটি ছোট মেয়েকে কেউ ভালোবেসে কতকগুলি টফি উপহার দিয়েছেন। প্রতিবেশী বালক-বালিকারা যদি এসে তার ভাগ চায়, বলে, 'আমায় একটা দে না' সে হয় তো দেবে না। কিন্তু বাড়িতে এসে ভাই-বোনেরা না চাইলেও সে তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে। তার আচরণের এই বিভিন্নতার কারণ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে নি, তাদের সে আপনজন বলে মনে করে না, আর পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ আছে বলে তাদের আপনজন মনে করে। সেই কারণেই তাদের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে তার কোন কষ্ট হয় না।

উপনিষদ্ এই পথেই স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। তা বলে, যখন বিশ্বের সকল জীব, সকল বস্তুকে ব্যাপ্ত করে একই মহাসত্তা প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান, তখন সকলেই সকলের আত্মীয়। সকল মানুষই একই পরিবারের সন্তানের মতো। কাজেই সকলকেই ভালোবাসবে এবং সকলকেই প্রীতি করবে। এই অখণ্ডবোধ বা একত্ববোধ হতেই এইভাবে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাবোধ উপলব্ধি হবে; তখন সকলের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠবে। ফলে স্বার্থের সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

এখন আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে উপনিষদ্ হতে কিছু সমর্থক-বচন উদ্ধৃত করবার প্রস্তাব করি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলছেন, জায়ার নিকট যে পতি প্রিয় হয় তা পতির কারণে নয়, মায়ের নিকট যে পুত্র প্রিয় হয় তা পুত্রের কারণে নয়। তিনি বলছেন, তারা প্রিয় হয় তার কারণ সকলকে ব্যাপ্ত করে একই আত্মা বর্তমান আছে বলে।[১০]

ঈশ উপনিষদে এই তত্ত্বটিকে আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে এই তত্ত্বটি প্রথমে ঘোষিত হয়েছে যে ঈশ্বর কর্তৃক সব-কিছু আচ্ছাদিত, অর্থাৎ তিনি বিশ্বের সব-কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। এই যুক্তির ভিত্তিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে ত্যাগের সহিত ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ অন্যকে বঞ্চিত করে ভোগ করবে না, সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করবে। আরও বলা হয়েছে যে সেই কারণেই অন্যের সম্পদ অপহরণ করতে নেই। ব্রহ্মের সর্বব্যাপকতার ভিত্তিতে এই যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার মাঝখানে আর-একটি যুক্তি উহ্য রয়ে গেছে। ধ্বন্যর্থের সাহায্যে সেটি সূচিত হয়েছে। তা বলে যেহেতু সকলেই একই অখণ্ড ঈশ্বরের অঙ্গীভূত সেহেতু সকলেই পরস্পরের একান্ত আপনজন। তা যদি হয়, স্বার্থপরের মতো একা-একা কোনও ভোগ্যবস্তু ভোগ করতে নেই, ভাগ করে ভোগ করতে হয়। একই কারণে কারও সম্পদ অপহরণ করার অর্থ হয় না। আপনার মানুষের সম্পদ কি কেউ অপহরণ করে নাকি?[১১] অর্থাৎ

১০. ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ন বা অরে পুত্রানাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥৪॥৫৩ ও ৪॥৫॥৬

এখানে 'আত্মনঃ'—এর অর্থ 'নিজের' নয়; তা ব্রহ্মের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে ব্রহ্মকেই নির্দেশ করে। তা স্পষ্ট হয়ে যায় পরের উক্তিতে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা' অর্থাৎ এই সব কিছু জড়িয়ে যিনি আছেন তিনি আত্মা।

১১ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। ঈশ। ১

এখানে অখণ্ডজ্ঞান হতে পরস্পরের প্রীতি সঞ্চারের চেষ্টা হয়েছে। সেই প্রীতি সঞ্চার হলে মানুষের মন স্বার্থপরতা দোষ হতে মুক্ত হতে পারে। সুতরাং এখানে পাই অখণ্ডতাজ্ঞান হতে প্রীতির সঞ্চার এবং প্রীতিহেতু পরার্থপরতার উদ্রেক।

একই প্রসঙ্গে এখানে আর-একটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বলা হয়েছে, সংসারে কাজ করতে করতে শতবর্ষ জীবন ধারণ করতে মনে ইচ্ছা পোষণ করতে হবে।[১২] সুতরাং দেখা যায় এই বচনে সংসার হতে সরে যেতে বলা হয় নি; বরং কর্মময় দীর্ঘজীবন যাপন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নিজেকে স্বার্থপরতা দোষ হতে মুক্ত রেখে, সকলের কল্যাণ সংরক্ষিত হয় এমন কর্ম করে সংসারজীবন যাপন করতে হবে। সুতরাং এই দুটি উপদেশকে অবলম্বন করে যে-তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে তা বলে অখণ্ডবোধ হতে প্রীতি, প্রীতি হতে পরার্থবোধের উদ্রেক এবং এই পরার্থবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মময় জীবন—এই হল আদর্শ জীবনের চারটি উপাদান।

এই হল উপনিষদে প্রচারিত মানবিকতা। তার পরিণত রূপে তা বলে মানুষের তিনটি মৌলিক কর্তব্য পালন করা উচিৎ: দম, দান এবং দয়া। বিষয়টি বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি সুন্দর গল্পকে অবলম্বন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বললেই হবে যে সেখানে পাই, গুরু সমাবর্তনের দিনে শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন—আত্মদমন করবে, দান করবে এবং দয়া করবে। এই গুরু হলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। তাই একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি কাব্যময় ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে এই মহান উপদেশের সকল কালে, সকল দেশে প্রয়োগ আছে বলে নাকি প্রতি বৎসর মেঘে ঢাকা দিনে স্তনয়িত্নু বজ্ররূপে ঘোষণা করে

১২. কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। ঈশ।২

'দ দ দ'।[১৩] তা যেন বিশ্ববাসীকে বলতে চায় স্বার্থকে, বিদ্বেষকে, ক্রোধকে সংহত কর, নিজের সম্পদ অন্যকে দান করে ভাগ করে ভোগ কর আর অবহেলিতকে দয়া কর।

এই হল সংক্ষেপে উপনিষদের মানবিকতা। ব্যক্তিরূপী জ্ঞান করে এখানে ঈশ্বরকে সেবা করবার প্রশ্ন ওঠে নি। কারণ, তখনও ভারতীয় দর্শনে একেশ্বরবাদের বিকাশ ঘটে নি। ব্রহ্ম সেখানে সর্বব্যাপী, প্রচ্ছন্ন, নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে পরিকল্পিত। তিনি মনীষা দ্বারা অধিগম্য ব্রহ্ম, তিনি ভক্তিমার্গে লভ্য ঈশ্বর নন। তবু এই নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের এখানে একটি ভূমিকা আছে। তিনি মানুষে মানুষে সম্বন্ধসূত্র হিসাবে বর্তমান। এই অখণ্ডবোধকে অবলম্বন করে যে পারস্পরিক প্রীতি গড়ে উঠতে পাবে তাকে ভিত্তি করে এই মানবিকতার পরিকল্পনা। তার আদর্শ হল সকলের প্রতি প্রীতি বহন করে, স্বার্থপরায়ণ না হয়ে, সামগ্রিক কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা তাঁর নিজস্ব মতিগতির পথে গড়ে উঠেছে। দেখা যায় দুটি চিন্তা তাঁর মনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং তাদের প্রভাবে তাঁর নিজস্ব মানবিকতা গড়ে উঠেছিল। তাদের একটি হল— তাঁর এই ধারণা যে সংসার হতে সরে গিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করে মুক্তি পাওয়া যায় না, সংসারের মধ্যে থেকেই মুক্তি সাধনা করতে হবে। দ্বিতীয় চিন্তা হল—ঈশ্বরকে সেবার পাত্র হিসাবে না পেলে ঈশ্বরের

১৩. তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নু র্দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতত্রয়ং শিক্ষেদ্‌ দমং দানং দয়ামিতি॥

—বৃহদারণ্যক ॥৫।২।৩

সহিত মিলন পরিপূর্ণ হয় না। শুধু প্রীতির সম্বন্ধে নয়, কর্মের সম্বন্ধেও তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। প্রথম চিন্তা তাঁকে সন্ন্যাসবাদের প্রতি বিমুখ করেছিল। দ্বিতীয় চিন্তা তাঁকে জীবনদেবতা হতে দূরে সরিয়ে এনেছিল। ঈশ্বরকে সেবার সম্বন্ধে পেতে চেয়ে তিনি তাঁকে বিশ্বমানবের সেবার ভিতর দিয়ে পেতে চেয়েছেন। এইভাবে নিজস্ব চিন্তার পথে তাঁর মানবিকতা-তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছিল। সুতরাং আমরা প্রথম এই দুটি চিন্তার সহিত পরিচিত হয়ে নেব।

'নৈবেদ্য'এর একটি কবিতার আরম্ভ হয়েছে এইভাবে—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

তার মর্মবাণী হল সংসার ত্যাগ করে, কর্ম ত্যাগ করে সংসার হতে পলাতক হয়ে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাতে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া হয়। মুক্তি আসে নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে।

এই প্রসঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র একটি কবিতার অংশ স্থাপন করা যেতে পারে—

মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে।

এ হতে প্রমাণ হয় বিশ্বধারায় প্রকৃতিই হল বন্ধনের মধ্য দিয়ে মুক্তি খোঁজা। তাঁর ধারণায় বিশ্বসত্তা নিজেই কর্ম ত্যাগ করেন নি; তিনি মুক্তিলাভের জন্য নিজেকে সৃষ্টির বন্ধনে বেঁধেছেন। তিনি তাই বলেছেন—'একদিকে বন্ধন না মানলে অন্যদিকে মুক্তি পাবার জো নেই। ব্রহ্ম একদিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ, আর একদিকে আপনার আনন্দ দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি, তখনি মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।'[১৪]

১৪ শান্তিনিকেতন। কর্মযোগ

এখানে সত্যের বন্ধন মানে সংসারের বন্ধন। ব্রহ্ম নিজেকে নিয়মে বেঁধে সৃষ্টিধারার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে মুক্তি খুঁজেছেন। সেই মুক্তিই তার আনন্দরূপটি পরিস্ফুট করছে। আত্মস্থ হয়ে, আত্মসমাহিত হয়ে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে যদি তিনি অবস্থান করতেন, তা হলে সেটাই তো হত বন্ধন। নিজেকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে, সৃষ্টির প্রবাহের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তবেই তো তিনি আনন্দের আস্বাদ পেলেন। সুতরাং সৃষ্টির অন্তর্নিহিত তত্ত্বই হল বন্ধনের মধ্যে মুক্তির অন্বেষণ।

এখন প্রশ্ন হল, ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে সেটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে। তিনি তার সম্ভাব্যতা বোঝাবার জন্য একটি উপমা ব্যবহার করেছেন। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

'আমাদের জীবনের বীণাতেও কর্মের সব মোটা তারগুলো ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন, যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না তুলতে পারি। কিন্তু তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে, ব্যর্থতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তালাভকে মুক্তি বলে না।'[১৫]

বীণার তার বাঁধলে তবেই তা সুরের ঝঙ্কার তুলতে পারে, তাতেই তার সার্থকতা, তাতেই তার মুক্তি। তারগুলো খুলে রেখে দিলে তা প্রকাশের মুক্তি হতে বঞ্চিত থেকে যায়। ঠিক সেইভাবে সংসার হতে সরে গেলে মুক্তিলাভ হবে না, নিজেকে প্রকাশের আনন্দ হতে বঞ্চিত করার তা সামিল হবে। মুক্তি মিলবে সংসারে থেকে কর্ম করে। তাতেই মুক্তি, তাতেই আনন্দের আস্বাদন। কর্মসন্ন্যাস মানে নিষ্ক্রিয়তা, তা শূন্যতার সাধনা।

এখন সকল কর্মই যে মুক্তি এনে দেবে সে কথা তিনি বলেন না। তিনি বলেন, যে কর্ম সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করবে সেই কর্মই বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদন এনে দিতে সমর্থ; অন্য কর্ম নয়।

১৫. একই।

স্বার্থবোধ প্রণোদিত কর্ম সে-শ্রেণীর কর্ম নয়; তা মানুষের জীবনকে সঙ্কুচিত করে তোলে। যে-কর্ম সর্বজনীন কল্যাণ আনে সেই কর্মই মুক্তির কর্ম। একেই তিনি কর্মযোগে বিশ্বসত্তার সঙ্গে এক হবার সাধনা বলেছেন এবং বিশ্বতানে তান মিলাবার সাধনা বলেছেন। তাঁর চিন্তায় সেটি কিভাবে সম্ভব হয় তার এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের ধারণায়, মানুষের মধ্যে দুটি আমি আছে—একটি 'ছোটো-আমি' এবং অপরটি 'বড়ো-আমি'। এই ছোটো-আমিকে তিনি অহং বলেছেন এবং বড়ো-আমিকে তিনি আত্মা বলেছেন। তাদের অতিরিক্ত আরও একটি 'আমি' আছেন। তাঁকে তিনি 'সবার চেয়ে-বড়ো-আমি' বলেছেন। তিনিই বিশ্বসত্তা। 'ছোটো-আমি' হল আত্মকেন্দ্রিক; সে কেবল নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের আরাম, নিজের সম্পদ এদের চিন্তাই তার মনকে ভরে রেখে দিয়েছে। মানুষের আর একটি দিকও আছে যা তাকে বাহিরের দিকে টানে। সে বিশ্বের সঙ্গে কর্মের যোগ, প্রীতির যোগ স্থাপন করতে চায়। তাই জন্যই তা বড়ো-আমি। একটি স্বার্থান্ধ, অপরটি পরার্থে আত্ম-নিয়োগে উৎসুক।

রবীন্দ্রনাথ 'ছোটো-আমি'র পরিচয় দিতে এই বলেছেন:

'আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোটো, আর একদিকে অত্যন্ত বড়ো। যেদিকটাতে আমি কেবলমাত্র আমি·· কেবল আমার সুখ-দুঃখ, আমার আরাম, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা—সে দিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই—সে দিকটাতে আমি বিন্দুমাত্র; সেদিকটাতে আমার মতো ছোটো আর কে আছে?'[১৬]

একই ভাষণে 'বড়ো-আমি' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

১৬. শান্তিনিকেতন। জাগরণ

'আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা যে দিকে সমস্ত জগত আমাকে প্রার্থনা করে—সেইখানে আমার চেয়ে বড়ো আর কে আছে?'

তাদের অতিরিক্ত যে একটি সত্তা আছেন তাঁকে তিনি কোথাও 'মহা-আমি' বলেছেন, কোথাও 'সবার-চেয়ে-বড়ো-আমি' বলেছেন। তিনিই বিশ্বসত্তা বা পরমাত্মা। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই—'আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা-আমিতেই সার্থক।'[১৭]

এই সার্থকতা লাভ হতে পারে মহা-আমির ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সংযুক্ত করে সেই ইচ্ছাসাধনে আত্মনিয়োগ করে। তাকেই তিনি বলেছেন, বিশ্বতানে যে সুর বাজে নিজের বীণাকে সেই সুরে বাঁধা। বিশ্বসত্তা সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করছেন এবং পোষণ করছেন। তিনি অবিরাম বিশ্বজনীন মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত। তাই তো তাঁকে বলা হয় 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা'। এখন মানুষের সার্থকতা তার ছোটো-আমি, ছোটো আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করে না-রেখে, নিজের মধ্যে যে বড়ো-আমি আছে তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বজনীন মঙ্গলকর্মে আত্ম-নিয়োগ করায়। সেখানেই তাব মুক্তি, সেখানেই তার সার্থকতা। যেদিন মানুষ তা পারে সেদিন তার জীবনে 'বড়ো-দিন' আসে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সকল স্বার্থের, সকল অহঙ্কারের অতীত সেই আমার বড়ো-আমিকে সকলের চেয়ে বড়ো-আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্ছে আমাদের বড়ো দিন।'[১৮]

এখন এই 'ছোটো-আমিকে' 'বড়ো আমি'র মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে নিজের আত্মাকে 'মহা-আমি'র সহিত যুক্ত করে নিজেকে সার্থক করবার কৌশলটা কি? রবীন্দ্রনাথ বলেন, তা হল, নিজের 'ছোট-আমি'কে ঘিরে যে ক্ষুদ্র বাসনাগুলি আছে তাদের বিস্তার করে দিতে হবে।

১৭. শান্তিনিকেতন। বৈরাগ্য
১৮. শান্তিনিকেতন। জাগরণ

অর্থাৎ বিশ্বজনীন কল্যাণ কামনাই নিজের ব্যক্তিগত কামনার স্থান নেবে। সকলের কল্যাণ যদি নিজের কল্যাণের মতো প্রিয় হয়ে ওঠে, তা হলে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত কর্ম বলে কিছু থাকবে না। তা বিস্তারলাভ করে বিলয় প্রাপ্ত হবে। তখন মানুষের মন স্বার্থ-প্রণোদিত বাসনা হতে মুক্ত হয়ে বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগ করে সার্থক হবে। তাকেই তিনি বলেছেন 'বিশ্বতালে নাচা' এবং 'বিপুল প্রাণে বাঁচা।' তাঁর প্রাসঙ্গিক বচনটি এই—

রক্ত আমার বিশ্বতলে নাচবে যে,
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাঁচবে যে,
কাঁপবে তোমার আলো বীণার তারে সে,
দুলবে তোমার তারামণির হারে সে,
বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে।[১৯]

এই চিন্তা থেকে রবীন্দ্রনাথের মনে জ্ঞান-প্রেম-কর্ম-আনন্দের আদর্শ গড়ে উঠেছিল। নিজের স্বার্থবোধ প্রণোদিত বাসনাকে ত্যাগ করে সাধারণ মানুষ তো সুখ পায় না; তার পক্ষে এইভাবে আত্মত্যাগ করাও কষ্টকর হয়। কারণ, সবার চেয়ে নিজেকেই সে ভালোবাসে। রবীন্দ্রনাথ বলেন আত্মত্যাগ সম্ভব হয় যদি আমাদের প্রীতির ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটাই। যাকে প্রীতি করি তার জন্য স্বার্থত্যাগ করতে কষ্ট হয় না, বরং ভালো লাগে। মা সন্তানের জন্য কত পরিশ্রম স্বীকার করেন, কিন্তু তাতে কষ্টবোধ হয় না; কারণ, সন্তানকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করেন। সুতরাং এ আত্মত্যাগে কষ্ট নেই, আনন্দ আছে। এ হতে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে পড়ে। আত্মীয়তাজ্ঞান প্রীতির উদ্রেক করবার সামর্থ্য রাখে।

সুতরাং দেখা যায় প্রীতি এবং কল্যাণকর্মের মধ্যে একটা পরস্পর সংযোগ আছে; একটি অপরের সহায়তা করে। তাই রবীন্দ্রনাথ

১৯. গীতালি, ৭১

বলেন বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি এবং কর্মবৃত্তি পরস্পর সহায়ক। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যদি সকল মানুষের সহিত একটি একাত্মতাবোধ মনে পরিস্ফুট হয়, তা হলে বিশ্বের মানুষের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ সঞ্চারিত হবে, আমাদের প্রীতিব ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করবে। ফলে বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা আপনি আসবে। তাতে কষ্টবোধ তো থাকবেই না, বরং আনন্দ আসবে। সুতরাং পাই অখণ্ডবোধ হতে প্রীতি, প্রীতি হতে বিশ্বজনীন কর্মে আকর্ষণ এবং সেই কর্ম সাধনে আনন্দ। এই হল সংক্ষেপে জ্ঞান-প্রেম-কর্ম-আনন্দ তত্ত্ব। এখন রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁর প্রতিপাদ্যটি স্থাপন করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত পবিচয় দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, মানুষেব নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে তৃপ্তি নেই। বিশ্বেব মধ্যে নিজেকে নানাভাবে ছড়িয়ে দেবার তার একটি স্বাভাবিক আকুতি আছে। সেই জন্যই সে তার তিনটি মূল বৃত্তিব সাহায্যে নানাভাবে বিশ্বের সহিত সংযোগ স্থাপনে উৎসুক হয়। তাঁর নিজস্ব মন্তব্য এই—

'আমাদের যথার্থ তাৎপর্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতে সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই জন্য আমবা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে ও কর্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি, কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছি; নইলে যে নিজেকে পাইনে। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করব, এই হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।'[২০]

তাঁর এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, নিজেকে ব্যাপক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবার জন্যই মানুষ নানা গোষ্ঠী স্থাপন করেছে। এ ইচ্ছা হতেই পরিবার গড়ে উঠেছে, সমাজ গড়ে উঠেছে, রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। এই গোষ্ঠীগুলি বৃহৎ হতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ক্রমশ মানুষকে প্রীতির মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্য দিয়ে, সেবার মধ্য দিয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ নেয়। তাঁর

২০. শান্তিনিকেতন। দিন

ভাষায় : 'এই কারণেই মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, যা-কিছু সৃষ্টি করেছে, তার ভিতরকার একটিমাত্র মূল তাৎপর্য এই যে মানুষ একাকিত্ব পরিহার করে বহুর মধ্যে, বিচিত্রের মধ্যে আপনার নানা শক্তিকে নানা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎ ক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে—এই তার যথার্থ সুখ।'[২১]

মানুষের এই স্বাভাবিক আকৃতিকে ভিত্তি করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্ঞান-প্রেম-কর্ম-আনন্দ তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। সুতরাং মানবজীবনের সার্থকতা, ক্ষুদ্র অহংবোধ প্রণোদিত হয়ে কেবল নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বাহিরের জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করায়। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে নিজের সহিত বিশ্বের মানুষের সঙ্গে একাত্মতাবোধ উপলব্ধি করা তার প্রথম সোপান। তা হতেই অন্যের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হবে এবং সেই প্রীতির ভিত্তিতে যে মমত্ববোধ সঞ্জাত হবে তা সর্বজনীন কল্যাণকর্মে শুধু প্রেরণা দেবে না, তাকে সহজসাধ্য করে তুলবে।

এইভাবে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সহিত যোগ স্থাপিত হলে শুধু তার স্বাভাবিক ইচ্ছা চরিতার্থ হয় না, একটি অতিরিক্ত লাভ এসে পড়ে। সর্বজনীন কাজ করে সে আনন্দ অনুভব করে। তাতে শুধু তার সার্থকতা নয় আনন্দও আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

আমাদের দেশের সমাজের সমস্ত ক্ষুদ্রতা বিচ্ছিন্নতা দূর করে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে মানবাত্মা কখনোই বলিষ্ঠ ও আনন্দিত হতে পারে না।[২২]

এখন প্রশ্ন ওঠে পরার্থে আত্মনিয়োগ করলে নিজের স্বার্থকে অবহেলা করা হয়। তাতে আনন্দ আসবে কি করে? রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে বলেছেন, এমনটি ঘটে, তার কারণ সেব্য ও সেবকের মধ্যে

২১. শান্তিনিকেতন। দিন
২২. শান্তিনিকেতন। দিন

একটি প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে বলে। মা সন্তানের সেবা করে আনন্দ পায়, প্রেমিক প্রেমাস্পদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে আনন্দ পায়, তার কারণ এখানে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হেতু ঘনিষ্ঠ মমত্ববোধ গড়ে উঠেছে। প্রীতি আছে বলেই স্বার্থত্যাগে আনন্দ আছে। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

'স্নেহ, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য আমাদের পরস্পরের যোগকে স্বেচ্ছাকৃত, আনন্দময় অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমময় যোগরূপে জাগিয়ে তুলছে। আমরা দায়ে পড়ে নয়, আনন্দের সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জন করছি। মা ইচ্ছা করেই সন্তানের সেবা করছে, মানুষ অন্ধভাবে নয়, সজ্ঞানে প্রেমের দ্বারাই সমাজের হিত করেছে।'[২৩]

সুতরাং এই আদর্শে কার্যকারণ সম্বন্ধে গ্রথিত কয়েকটি জিনিস পাই। বিশ্বের সহিত অখণ্ডতাবোধ হতে সকলের প্রতি প্রীতি আসে। প্রীতির সঞ্চার হলে স্বার্থকে উপেক্ষা করে পরের কল্যাণসাধনে উৎসাহ আসে। এই প্রকৃতির সর্বজনীন কল্যাণকর্মে আত্মপ্রয়োগে কষ্টবোধ থাকে না, বরং আনন্দবোধ জাগে। সুতরাং জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের সংযুক্ত সাধনাই আনন্দলোকে উত্তরণের পথ। নিজেকে স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্যই সুখ-দুঃখ বোধ। তার বাইরে এসে নিজেকে সর্বজনীন কল্যাণকর্মে ছড়িয়ে দিতে পারলে আমরা আনন্দ-আস্বাদনের অধিকারী হই। তাই তিনি বলেন, 'সমগ্রতার মধ্যেই এত আনন্দ ; বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই দুঃখ দুর্বলতা।'[২৪]

দ্বিতীয় যে চিন্তাটি রবীন্দ্রনাথকে মানবিকতার আদর্শে আকৃষ্ট করেছিল তার জন্ম হয়েছিল তাঁর সাধনজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে জ্ঞানের পথে তিনি প্রকৃতির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সত্তার উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁকে জেনেছিলেন, একান্ত আপন করে, ব্যক্তিগত

২৩. শান্তিনিকেতন। দিন
২৪. শান্তিনিকেতন। সমগ্র এক

সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে পান নি। তাই সাধনজীবনে এল জীবনদেবতা-তত্ত্ব। সেখানে প্রীতির সম্বন্ধে প্রচুর আনন্দ তিনি পেলেন; কিন্তু একটা অভাব রয়ে গেল। জীবনদেবতা হৃদয়বৃত্তিকে তৃপ্তি দেন, কিন্তু ধর্মসাধনায় কর্মবৃত্তিকে প্রয়োগের সুযোগ দেন না; কারণ তাঁর তো কোনো পৃথক সত্তা নেই, তিনি 'অরূপরতন'। অথচ যাকে ভালোবাসি, প্রীতি করি তাকে সেবা করতেও ইচ্ছা করে।

এই অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল, আদর্শ ধর্ম হবে তাই যা মানুষের তিনটি মূলবৃত্তিকে প্রয়োগ করবার যুগপৎ সুযোগ এনে দেবে। বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তি দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যে মিলন সম্ভব তাই আদর্শ মিলন। সেই কারণে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ঈশ্বরের সঙ্গে সেবার সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে তাঁর কোনো মূর্ত প্রকাশকে সেবার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন ওঠে, তাঁর কোন প্রকাশকে সেবার পাত্ররূপে নির্বাচন করা হবে। বিশ্বসত্তার মূর্ত প্রকাশ দুই রূপে। এক জড়রূপে—যেমন জল, স্থল, গ্রহ, নক্ষত্র। আর এক জীবরূপে—যেমন ইতর প্রাণী ও মানুষ। যা জড় তার সঙ্গে আমাদের সেবার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। কারণ—'জল, স্থল, আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান চলে না, তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই।'[২৫]

সুতরাং বাকি থাকে জীব। কিন্তু সকল জীবের সঙ্গে ত প্রীতি আদান-প্রদানের সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা যায় না। তা যায় কেবল মানুষের সঙ্গে। তাই রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্ত করলেন যে মানুষের নিকট বিশ্বসত্তার সব থেকে ঘনিষ্ঠ প্রকাশ মানুষরূপে। সুতরাং মানুষের মধ্য দিয়ে জ্ঞান, প্রীতি ও সেবায় ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

২৫. ধর্ম। ধর্মপ্রচার

তাঁর এই প্রতিপাদ্যটি সহজ করে বোঝাবার জন্য তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। নারীর সঙ্গে সন্তানের মাতৃসম্বন্ধের সহিত ঈশ্বরের ভক্তের নিকট মানবরূপে প্রকাশের তুলনা করেছেন। কোন বিশেষ নারীর নানারূপে প্রকাশ থাকে; কোথাও তিনি কন্যা, কোথাও পত্নী, কোথাও মা। তাঁর সন্তানের নিকট যে প্রকাশ ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ তা হল মাতৃরূপে; অন্য প্রকাশ তার কাছে অর্থহীন। সেইরূপ ঈশ্বরের প্রকাশ নানাভাবে। জড়ে তাঁর প্রকাশ আছে, ভক্তের হৃদয়ে জীবনদেবতারূপে তাঁর প্রকাশ আছে, নানা জীবরূপে তাঁর প্রকাশ আছে। কিন্তু মানুষের নিকট যে-প্রকাশ ঘনিষ্ঠ এবং তাৎপর্যপূর্ণ তা হল মাতৃরূপে প্রকাশ। সেই জন্য তাঁর ধারণায় মানুষের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জ্ঞান দ্বারা, প্রীতি দ্বারা, সেবার দ্বারা একসঙ্গে পাওয়া যায়। তাঁর যুক্তি তিনি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন:

'মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর সর্বাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি।'[২৬]

মানুষরূপে ঈশ্বরের যে প্রকাশ তাকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ রবীন্দ্রনাথের ধারণায় পরিপূর্ণতম হয়, কারণ তার মধ্যে দিয়ে একসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তির যুগপৎ প্রয়োগ সম্ভব হয়। ফলে সবগুলি বৃত্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ঘনিষ্ঠরূপে পাওয়া যায়। সেটা সম্ভব হয় এইভাবে: প্রথমত, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেই এই উপলব্ধি সম্ভব যে মানুষের নিকট ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ মানুষরূপে। এইভাবে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ এসে পড়ে। দ্বিতীয়ত, মানুষ আকাশ, বাতাস,

২৬. ধর্ম। ধর্মপ্রচার

জলের মতো জড় বস্তু নয়; সে হৃদয়বৃত্তি-বিশিষ্ট জীব। কাজেই তার সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির আদান-প্রদান সম্ভব। এইভাবে যখন মানুষকে একান্ত আপনজন জ্ঞানে প্রীতি করি, তখন হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগ সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, মানুষরূপেই তাঁকে বিশ্বজনীন কর্মের মধ্য দিয়ে সেবা করবার সুযোগ মেলে, অন্যভাবে মেলে না। এখানে কর্মবৃত্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র মিলে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ঈশ্বরকে পরিপূর্ণরূপে সকল মৌলিক বৃত্তি দিয়ে পাওয়া যায় মানুষের মধ্য দিয়েই। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

'আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, কর্মবৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রকাশ করিলে, তবে আমাদের পক্ষে আমাদের অধিকার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এই জন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মদ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই।'[২৭]

এই উপলব্ধির ফলে যেন সাধনজীবনে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন দুজনের সঙ্গে মিলন, তাতে হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি আছে প্রচুর, কিন্তু সেবাবৃত্তির প্রয়োগের সুযোগ নেই, কারণ তিনি অরূপ সত্তা। ধর্মসাধনায় কর্মের কল্যাণরূপ বিশ্বমানবের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করলেই পরিস্ফুট হয়, সীমার মাঝে অসীমের মিলনে হয় না। তাই দেখি সাধন-জীবনে এক সময় একাকী বসে বা বিজনে বসে ঈশ্বরের ধ্যানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমে গেল, মনের মন্দিরে জীবনদেবতার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাও শিথিল হয়ে গেল। পরিবর্তে তিনি চাইলেন বিশ্ব-মানবের মধ্যে তাঁর যে প্রকাশ সেইখানেই তাঁর সঙ্গে মিলতে। আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে এই কাব্যাংশটি স্থাপন করা হল :

২৭. ধর্ম। ধর্মপ্রচার

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।[২৮]

এখন প্রশ্ন ওঠে, বিশ্বমানবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সহিত মিলন কি ভাবে সংঘঠিত হবে। তাঁর ধারণায় সেটা সম্ভব হবে কর্মবৃত্তির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। বিশ্বের মানুষকে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ-রূপে উপলব্ধি করতে হবে, তাদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে এবং বিশ্বজনীন কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করে বিশ্বমানবের সেবা করতে হবে। তিনি এই প্রসঙ্গে উপনিষদে ব্যবহৃত একটি শব্দ প্রয়োগ করে বলেছেন, ভক্তকে 'বিশ্বকর্মা' হতে হবে। তাঁর ধারণায়, যে কেবল ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণসাধন না করে সাধারণভাবে মানুষের কল্যাণসাধন করবে সেই বিশ্বকর্মা হবে। অর্থাৎ যা বিশ্বজনীন কল্যাণ আনে তা করাই হল বিশ্বকর্মা হওয়া। যে কাজ সাধারণের কল্যাণ আনে তা সামান্য হলেও বিশ্বজনীন। এমন কাজই বিশ্বকর্মার আদর্শকে রূপায়িত করে: কারণ তিনি বিশ্বের মানুষের জন্য কাজ করেন।[২৯]

সুতরাং দেখা যায়, এই চিন্তার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তাঁর মানবিকতাতত্ত্ব স্থাপন করেছেন। সংসারে থেকেই মুক্তিসাধনার অন্বেষণে তিনি জ্ঞান-প্রীতি-কর্ম-আনন্দ তত্ত্বকে পেয়েছেন।

২৮ গীতাঞ্জলি। ৯৮

২৯. All work that is good, however small in extent is universal in character. Such work makes for realisations of a *Viswakarma*, the world-worker who works for all. ***Religion of Man***, Spiritual Union.

অপরদিকে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে সব কটি বৃত্তি দিয়ে পরিপূর্ণরূপে পাবার চেষ্টা হতে তিনি বিশ্ব-সাথে যোগের তত্ত্ব বা বিশ্বকর্মাতত্ত্ব স্থাপন করেছেন। মূলত উভয়ে একই তত্ত্ব। তা বলে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে হবে বিশ্বমানবের মাঝে, তাঁকে প্রীতি করতে হবে মানুষকে প্রীতি করে এবং তাঁকে সেবা করতে হবে মানুষের সেবা করে। ঈশ্বর জ্ঞানে বিশ্বমানবের সেবা, বিশ্বমানবের কল্যাণে আত্মনিয়োগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার পরিণত রূপে মানবিকতাকে পাই।

তিন

উভয় চিন্তার তুলনা

মানবিকতা সম্বন্ধে উপনিষদের ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে উভয় চিন্তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। সে-সাদৃশ্য কতখানি গভীর তা ভালো করে বোঝবার জন্য একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। মানবিকতা সম্বন্ধে এই দুই চিন্তার অন্তর্ভুক্ত যে বিষয়গুলি আছে তাদের পৃথক করে নিয়ে প্রত্যেকটি সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা করলে এ বিষয় আমাদের ধারণা আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

মানবিকতা সম্পর্কিত মূল চিন্তাগুলি হল এই :

(ক) সন্ন্যাসবাদকে প্রত্যাখ্যান করে কর্মময় জীবনকে বেশি মূল্য দান ;

(খ) অখণ্ডতাবোধের প্রয়োজনীয়তা ;

(গ) অখণ্ডজ্ঞান থেকে অন্য মানুষের প্রতি প্রীতি সঞ্চার ;

(ঘ) প্রীতি হতে অন্যের কল্যাণকর্মে আকর্ষণ ;

(ঙ) আত্মত্যাগে আনন্দবোধ।

এখন এদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমরা পৃথক তুলনামূলক আলোচনা করব।

(ক) প্রথমে সন্ন্যাসবাদকে গ্রহণ না করে কর্মময় সংসারজীবনের কথা ধরা যাক। এই আলোচনা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার অংশ উদ্‌ধৃত করে আরম্ভ হতে পারে। পূর্বের অনুচ্ছেদে তার উল্লেখ হয়েছে। তবু বর্তমান প্রসঙ্গে তার একটু বিস্তারিত উদ্‌ধৃতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে:

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলা-বালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।[৩০]

বক্তব্য হল, বিশ্বসত্তা নিজেই কর্মের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন, কর্ম করেই তিনি মুক্তি খুঁজছেন। সুতরাং মানুষেরও তাঁকে অনুসরণ করতে হবে, সংসার থেকে পলাতক হলে চলবে না, সংসারে থেকে কর্মময় জীবন যাপন করতে হবে।

আমরা দেখব উপনিষদে উভয় ধরনের চিন্তাই আছে। সৃষ্টির কর্মে যে ব্রহ্ম নিত্য লিপ্ত আছেন, তাই যে তাঁকে বিশ্বে আত্মপ্রকাশে আকর্ষণ করে, সে-কথা সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। একটি শ্লোক বলছে, 'তিনি বিশ্বকৃৎ, তিনি এই সবকিছুর স্রষ্টা, বিশ্ব তাঁরই এবং তিনিই বিশ্ব।'[৩১] আর একটি বচন আছে, 'এই মহাত্মা দেবতা বিশ্বকর্মা এবং সর্বদা বিভিন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন।'[৩২]

৩০. গীতাঞ্জলি ।১১৯
৩১. স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা তস্য লোকঃ স উ লোক এব।
—বৃহদারণ্যক ।৪।৪।১৩
৩২. এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
—শ্বেতাশ্বতর ।৪।১৭

উভয়ের অর্থই এক। ব্রহ্ম সব সময় সৃষ্টিকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তিনি বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন বলে বিশ্বকৃৎ এবং বিশ্বকে সংরক্ষণ করবার জন্য নিয়ত কাজ করে যান বলে তিনি বিশ্বকর্মা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিশ্বকর্মা শব্দটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভালো লেগেছিল। তাই মানুষকে কর্মযোগী হতে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি তাকে 'বিশ্বকর্মা' হবার উপদেশ দিয়েছেন। বিষয়টি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তাঁর অনুসরণে মানুষকে কর্মময় জীবনযাপন করতে হবে। একেই তিনি বলেছেন কর্মযোগে বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়া। সন্ন্যাসগ্রহণ না করে কর্মময় জীবনগ্রহণের আদর্শ যে উপনিষদে গৃহীত হয়েছিল সে বিষয় প্রথম অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখানে শুধু উদাহরণস্বরূপ ঈশ উপনিষদের সেই বচনটির আর একবার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে: 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।' এই সংসারেই কর্মরত অবস্থায় থেকে শত বৎসর আয়ু কামনা করতে হয়।

(খ) পরের কথা হচ্ছে, বিশ্ববোধের প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বসত্তা যে সবাইকে নিয়ে সবার মধ্যে ছড়িয়ে আছেন এ উপলব্ধি উপনিষদের চিন্তার মূলকথা। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছেন: 'এই সব কিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই তাদের উৎপত্তি, পরিপোষণ এবং লয়।'[৩৩] রবীন্দ্রনাথ নিজে এ-বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিচের মন্তব্যটি লক্ষ্য করা যেতে পারে:

'পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিলেন।'[৩৪]

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি কথা উত্থাপন করেছেন যা বর্তমান

৩৩. ছান্দোগ্য ।।৩।১৪।১

৩৪. শান্তিনিকেতন। বিশ্ববোধ

আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়ে। কথাটি উপনিষদের একটি প্রসিদ্ধ বাণী থেকে তাঁর মনে জেগেছিল। বাণীটির বাংলা অনুবাদ এই দাঁড়ায়:

'এঁকে (ব্রহ্মকে) পেয়ে ঋষিগণ জ্ঞানতৃপ্ত ও কৃতার্থ হয়ে বাসনামুক্ত হন এবং প্রশান্ত হন। সেই ধীরগণ সেই সর্বগতকে (ব্রহ্মকে) সর্বত্র পেয়ে ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়ে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।'[৩৫]

এই বচনটির তাৎপর্য খুব গভীর। তা বলে জ্ঞানের পথে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিতা উপলব্ধি করে এই ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদের মনে যে অখণ্ডতা বোধের উদয় হয়, তা তাঁদের মনকে একটি ব্যাপকতর মহত্তর জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। তাঁরা স্বার্থপ্রণোদিত বাসনা হতে মুক্ত হন এবং সর্বত্র ব্রহ্মের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব করেন।

তাই রবীন্দ্রনাথের ধারণায় এই বিশ্ববোধ প্রস্ফুটিত হলে মানুষ 'যুক্তাত্মা' হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বত্র অবস্থিতি অনুভব করে। তা তিনি যাকে 'বিশ্ব সাথে যোগের' জীবন বলেছেন, সেই জীবনের উপযুক্ত করে মানুষকে গড়ে তোলে। সুতরাং জ্ঞান-প্রেম-কর্ম-আনন্দের সাধনায় এই বিশ্ববোধ একটি প্রস্তুতিপর্ব। তা মানুষকে বিশ্বমানবকে প্রীতি করতে এবং সর্বজনীন কর্ম করতে প্রস্তুত করে তোলে। তাই তিনি বলেছেন, 'সেই সকল ধীর, সেই সকল যুক্তাত্মাদের প্রণাম করে তাঁদেরই পথ আমরা অনুসরণ করব। সেই হচ্ছে একের সঙ্গে যোগের পথ, সেই হচ্ছে সকলের মধ্যেই প্রবেশের পথ, জ্ঞান, প্রেম এবং কর্মের চরম পরিতৃপ্তির পথ।'[৩৬]

সুতরাং দেখা যায় বিশ্ববোধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে

৩৫. সম্প্রাপ্যৈনং ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানো সর্বমেবাবিশন্তি।
—মুণ্ডক ।৩।২।৫

৩৬. শান্তিনিকেতন। ধীরযুক্তাত্মা

চিন্তা রেখে গেছেন তা স্পষ্টতই উপনিষদের বাণী থেকে লব্ধ। এর প্রেরণা উপনিষদই। এখানে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের চিন্তা সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন এবং সে-কথা উপরে উদ্‌ধৃত বচনে স্বীকারও করেছেন।

(গ) তার পরের কথা হল, অখণ্ডজ্ঞান বা বিশ্ববোধ থেকে মানুষের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হয়। এ-বিষয়েও উভয় চিন্তা একই পথ ধরে চলেছে। এই প্রসঙ্গে একটু আগে উপনিষদের যে বাণীটি আমরা উল্লেখ করেছি তার আর একবার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে বলা হয়েছে জ্ঞানতৃপ্ত হয়ে ঋষিগণ ব্রহ্মের সহিত একত্ব উপলব্ধি করে সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন 'যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।' তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সকলের সহিত একত্ব অনুভব করে সকলের সহিত প্রীতির সম্পর্ক অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথও সেই অর্থেই তাকে গ্রহণ করেছেন। এ-বিষয় আরও স্পষ্ট ঘোষণা রবীন্দ্রনাথের নিজের বচনে পাই। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিচে উদ্‌ধৃত উক্তিটি লক্ষ্য করা যেতে পারে:

'এই যে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি, স্বাদেশিক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জোর এত যে এই চৈতন্য যাকে যথার্থভাবে অধিকার করে সে এই বৃহতের প্রেমে নিজের ক্ষুদ্র-আমির সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে।' ৩৭

(ঘ) তার পরের কথা হল, প্রীতি থেকে কল্যাণকর্মে আকর্ষণ আসে। যে আমার অত্যন্ত আপনজন, তার কল্যাণ আমার নিজের কল্যাণেরই সামিল হয়ে গেছে। সুতরাং অন্যের কল্যাণ সাধনের প্রতি আকর্ষণ সহজ হয়ে ওঠে। ঈশ উপনিষদে যে ত্যাগের সহিত ভোগ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার প্রেরণা হল সমগ্র বিশ্বের সহিত একত্ববোধ, কারণ একই মহান সত্তা সকলের মধ্যেই বিরাজমান, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্।'

৩৭. শান্তিনিকেতন। সমগ্র এক

রবীন্দ্রনাথের ধারণা, মনে বিশ্ববোধ জাগ্রত হলে সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করবার ইচ্ছা আসা এবং অন্যকে বঞ্চিত করে ভোগ করবার ইচ্ছা না আসাই স্বাভাবিক। মনের এক অবস্থায় উপনিষদের এই অনুশাসনকে জীবনে প্রতিফলিত করতে পারছেন না বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই বলে :

তাই যে তুমি ভাইয়ের মাঝে, প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভায়ের সাথে ভাগ করে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরি নে।[৩৮]

(ঙ) শেষ কথা হল, বিশ্ববোধ জাগ্রত হলে সর্বজনীন কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করে আনন্দ পাওয়া যায়। পরার্থকে স্বার্থের সহিত এক করে নেওয়াকেই উপনিষদে শ্রেয়কে গ্রহণ করার সমস্থানীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বড়ো-আমির আহ্বান বলেছেন এ হল তাই। কঠ উপনিষদে যম প্রথমে নচিকেতাকে বিশ্বতত্ত্বের জ্ঞানলাভের আকূতি হতে নিরস্ত করবার জন্য অনেক ভোগ-সুখের প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। নচিকেতা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাই যম অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, প্রেয়কে ত্যাগ করে তুমি ধীর বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো শ্রেয়কে গ্রহণ করেছ। ভোগ-সুখ সে তো সুবর্ণময় শৃঙ্খলস্বরূপ। তুমি সেই 'বিত্তময়ী সৃঙ্কা'কে প্রত্যাখ্যান করেছ।

উপনিষদে স্বার্থান্ধভাবে ইন্দ্রিয়-সেবাকে এখানে নিন্দা করা হয়েছে; কিন্তু পরকে প্রীতি করে নিঃস্বার্থ-সেবায় যে আনন্দলাভ হয় সে-কথা বলা হয় নি। অবশ্য উপনিষদের ভাবধারা এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। তাই মনে হয়, এ-চিন্তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব।

৩৮. গীতাঞ্জলি।৩৭

এখন প্রশ্ন ওঠে, এই আনন্দের উৎস কোথায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তার উৎস শিল্প। যিনি শিল্পরচনা করেন আর যিনি রসিক হিসাবে তার রসগ্রহণ করবার উপযুক্ত সংবেদনশীল মন রাখেন উভয়েই এই আনন্দের অধিকারী হন। কিন্তু মনে হয়, আনন্দের অধিষ্ঠান আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে। মানুষের যে কটি মূল বৃত্তি আছে তাদের সকলকে অবলম্বন করেই আনন্দের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষের মূল বৃত্তি তিনটি: কৌতূহল বৃত্তি, অনুভূতি-বৃত্তি ও ইচ্ছা-বৃত্তি। কৌতূহল-বৃত্তি দিয়ে আমরা জানি, অনুভূতি-বৃত্তি দিয়ে প্রীতি করি, ভক্তি করি, ইচ্ছা-বৃত্তি দিয়ে কর্ম করি। এই তিন পথেই আমরা আনন্দের সন্ধান পাই। কেমন করে পাই সেটা সংক্ষেপে দেখাতে চেষ্টা করব।

কোনও রহস্য-ভেদ করবার চেষ্টায় হঠাৎ কিছু একটা তথ্যকে আবিষ্কার করতে পারলে আমরা আনন্দ পাই। আর্কিমিডিস যখন চিন্তা করতে করতে হঠাৎ পদার্থ বিশেষের নিজস্ব ভার[৩১] সম্পর্কে রহস্য-ভেদ করলেন তখন তিনি আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠলেন, 'ইউরেকা।' অহৈতুক প্রীতিকে অবলম্বন করেও এই আনন্দের উপলব্ধি আসে। এই পথে আনন্দের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাই ঈশ্বরে অহৈতুক ভক্তির মধ্যে। মীরা বা শ্রীরামকৃষ্ণ এই পথের পথিক ছিলেন। কর্মের মধ্য দিয়েও এইভাবে আনন্দলাভ করা যায়। স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে নয়, কেবল পরার্থপরতা বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোনও মহৎ কর্ম করলে এই আনন্দবোধ সঞ্চারিত হয়। একটি ভাল কাজ করলে যিনি তা করেন তাঁর মধ্যে একটি গভীর তৃপ্তির অনুভূতি আসে। সেই কর্মের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে উল্লাসবোধ আসে তা যেন 'বিবেকচূড়ামণি'র ভাষায় অনুসরণে ব্যক্ত করা যায় এই বলে, 'ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহম্।'

সুতরাং আমরা দেখি মানবিকতার চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের

৩১. Specific gravity

দূর থেকে কাছে এসে পড়েছেন। উভয় চিন্তাই একই পথে প্রবাহিত। তত্ত্বজ্ঞান থেকে একাত্মতাবোধ আসে; একাত্মতাবোধ থেকে বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হয়। এই প্রীতিবোধ থেকে পরার্থে স্বার্থত্যাগের প্রেরণা পাওয়া যায় এবং ফলে আসে আনন্দ। অতিরিক্তভাবে উভয় চিন্তাই সন্ন্যাসবাদ গ্রহণ করে নি; উভয়েই বিশ্বসত্তাকে সংসারের মধ্যেই আবিষ্কার করেছে। এইভাবে এখানে উপনিষদের চিন্তা এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যেন হাত ধরাধরি করে একই পথে এগিয়ে গিয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

আলোচনা

এক

পূর্বের সিদ্ধান্তের গ্রন্থন

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উপনিষদের মূল চিন্তাগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের সমস্থানীয় চিন্তার তুলনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে সে-সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক আলোচনা করবার প্রস্তাব করি।

যে মৌলিক চিন্তাগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে সেগুলি হল এই :

ব্রহ্মবাদ, দ্বৈতভাবতত্ত্ব, আনন্দ ও অমৃততত্ত্ব,
মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে চিন্তা, শ্রেয়তত্ত্ব ও মানবিকতা।

বিভিন্ন অধ্যায়ে এই পৃথক চিন্তাগুলি সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে; তাদের সিদ্ধান্তগুলির এখানে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান আলোচনার সুবিধার জন্য তাদের সবগুলিকে একত্র পাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রথম হল ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে চিন্তা। আমরা দেখেছি প্রাচীন উপনিষদের চিন্তায় সমগ্র বিশ্বকে একটি অখণ্ড সত্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে। সেই অখণ্ড সত্তাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, কারণ তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন; ভূমা বলা হয়েছে, কারণ তিনি বিরাট; আত্মা বলা হয়েছে, কারণ তিনি সকলের অন্তরে প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজমান। তিনি একাধারে বিশ্বের উপাদান-কারণ, নিমিত্ত-কারণ এবং রূপ-কারণ। উপনিষদের ঋষির পরিকল্পনায় তিনি নিজেকে দৃশ্যমান বিশ্বে পরিবর্তিত করেন বলে উপাদান-কারণ; নিজেই এই পরিবর্তন নিজ শক্তি দিয়ে সংঘটন করেন বলে তিনি নিমিত্ত-কারণ; যে রূপে তিনি প্রকাশ নেন

তাও নিজের সৃষ্ট বলে তিনি রূপ-কারণ। তিনি অতিরিক্তভাবে উদ্দেশ্য কারণও বটে; কারণ তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেকে বিশ্বে রূপান্তরিত করেন। কোনও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য তাঁর নেই; কারণ যাঁর সব আছে তাঁর কোনও অভাব তো নেই। সে উদ্দেশ্য আনন্দ আস্বাদন। সুতরাং বিশ্বের মধ্যে উপনিষদের ঋষি এক আনন্দ-অভিসারী মহাসত্তার প্রকাশ দেখেছেন। তাই বিশ্বকে তিনি 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' বলে বর্ণনা করেছেন।

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা গতিশীল। তার বার বার পালা-বদল ঘটেছে। পারিবারিক প্রভাব, নিজের মতিগতি এবং মতিগতির পথে ঔপনিষদিক চিন্তার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁকে আঁকা-বাঁকা-পথে তাঁর সাধনজীবনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম জীবনে পারিবারিক ধর্মচর্চারীতি যে পরিবেশ গড়ে তুলেছিল তার প্রভাবে তিনি একেশ্বরবাদের নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু সেই সাধনরীতি তাঁর মনকে তৃপ্তি দিতে পারে নি; কারণ তিনি স্বাধীন-পথে এগিয়ে যেতে ভালোবাসতেন। তবে তা তাঁর মনকে পৌরাণিক হিন্দুধর্মে প্রচলিত বিগ্রহ-পূজার প্রতি বিরূপ করে দিয়েছিল। তাঁর ধারণায় তা ঈশ্বরকে নিয়ে ছেলেখেলার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। মতি-গতির পথে এগিয়ে গিয়ে তিনি প্রকৃতির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন শক্তির উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আছেন, বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। তাঁকে তিনি রাখাল বালকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সে যখন দুপুরে ছায়াঘন স্থানে বিশ্রাম নেয় তখন তাকে দেখা যায় না, কিন্তু তার বাঁশি শোনা যায়। বিশ্বের মধ্যে এই সত্তা আনন্দ আস্বাদনের জন্য প্রকাশ নিয়েছেন, নিজের ওপর দ্বৈতভাব আরোপ করে বহু ও বিচিত্র হয়েছেন। এইভাবে তিনি এই অবস্থায় ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের অতি নিকটে এসে গেছেন।

কিন্তু তাঁর মতিগতির পথে তিনি পরে ব্রহ্মবাদের থেকে সরে

এসেছেন। উপনিষদের ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, তাঁকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে গ্রহণ করে তৃপ্তি আছে; কিন্তু এ পরিকল্পনায় হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগের কোনও অবকাশ নেই। শুধু জানায় তৃপ্তি নেই, বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। এই ধরনের একটি আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের মনকে পীড়িত করত। তিনি বিশ্বসত্তাকে শুধু জানতে চান নি, প্রীতির সূত্রে পেতে চেয়েছিলেন, শুধু মনীষা দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। এই পথে চিন্তা তাঁকে তাঁর অভিনব পরিকল্পনা জীবনদেবতাতত্ত্ব এনে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় ইনিই বিশ্বদেবতারই ব্যক্তিরূপী সংস্করণ। তিনি অশরীরী, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রণয়ের ভিখারী। বিশ্বের চারিদিকে যে এত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি তা ব্যক্তি মানুষের কাছে তাঁর প্রেমলিপি। যে তাতে সাড়া দেয় তার হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত হয়ে তার সঙ্গে প্রীতির আদান-প্রদান করেন। বিশ্বসত্তার মধ্যে তিনি দুটি প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। একটি কাজের প্রকাশ, অন্যটি আনন্দের প্রকাশ। তাই তিনি বলেছেন, বিশ্বদেবতা আছেন লোকে লোকে আর জীবনদেবতা আছেন মানুষের হৃদয়ে।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে তাঁর বৈদিক পূর্বপুরুষদের অনুসরণে প্রকৃতির কবি হয়ে প্রকৃতির মধ্যে এক সর্বব্যাপী সত্তার আবিষ্কার করেছিলেন, তেমন পরবর্তীকালে তাঁর মতিগতির পথে জীবনদেবতাকে পেয়েছিলেন। সুতরাং উপনিষদের অনুবর্তী হয়ে তিনি ব্রহ্মবাদের কাছে এসেও আবার জীবনদেবতার আকর্ষণে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তবু উপনিষদের ব্রহ্মকে একেবারেই ঠেলতে পারেন নি। তিনি বিশ্বসত্তার কাজের প্রকাশরূপে তখনও সঙ্কুচিত ক্ষেত্রে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় কথা হল—দ্বৈতভাবতত্ত্ব। উপনিষদের মূল চিন্তাধারা বলে বিশ্বসত্তা রসের জন্য, অর্থাৎ আনন্দ উপলব্ধির জন্য নিজের বিশুদ্ধ একত্বকে বর্জন করে আপনার উপর দ্বৈতভাব আরোপ করে বিশ্বে

রূপান্তরিত হলেন। বিশ্বের বৈচিত্র্যময় রূপ প্রকট হতে দুটি পক্ষ দরকার। একটি পক্ষ তার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি দিয়ে অপর একটি পক্ষের সঙ্গে পরিচিত হবে তবেই ত বিশ্বের শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-রসমণ্ডিত প্রকট রূপটি ধরা পড়বে। একটি জ্ঞাতা, অপরটি জ্ঞেয়, একটি ঘ্রাতা, অপরটি ঘ্রেয়, একটি শ্রোতা অপরটি শ্রোতব্য, একটি রসয়িতা অপরটি রসিতব্য। এইরূপে দ্বৈতভাবের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বৈচিত্র্যময় রূপটি ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথও এই তত্ত্বটি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনিও উপনিষদের অনুবর্তী হয়ে বলেছেন যে যা ছিল একক সত্তা, তা আপনাকে দুই করেছে এই বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রকট হতে। একদিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় সমন্বিত মন ও অপর দিকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকট ধরা দেয় এমন পদার্থ, এই দুয়ের মিলনের মধ্যেই বিশ্বের রূপটি ধরা পড়ে। তিনি তাই বলেছেন, দুয়ের মিলনের আঘাতের মধ্য দিয়েই বর্ণ-গন্ধ-গীতময় বিশ্ব রচিত হয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ এইখানেই থামেন নি। বিশ্বের বৈচিত্র্যময় প্রকাশে মানুষের মন এইভাবে যে একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, সে বিষয় তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই তিনি মানুষের মন পেয়েছেন বলে একটি বিশেষ উল্লাস বোধ করছেন। সেই অহংকারবোধ তাঁর কবিতায় ভাষা পেয়েছে। তিনি বলেছেন তাঁরই চেতনার পটে চুনি রাঙা দেখায় এবং পান্না সবুজ হয়। সুতরাং আবিষ্কার করেছেন বিশ্ব রচনায় বিশ্বশিল্পী মানুষের চেতনাকেই পটরূপে ব্যবহার করেছেন। সকল মানুষের হয়ে তাই তাঁর অহংকার যে বিশ্বশিল্প রচনায় মানুষের চেতনা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

এগুলি নূতন কথা। উপনিষদে তা বলা হয় নি। কারণ উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি। এক রকম বলা চলে বিশ্বসত্তার দৃষ্টিভঙ্গি। তাই বিশেষ দুটি সত্তার একটি সত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। বিশ্বশিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনটির ভূমিকা গৌণ, কোনটির মুখ্য সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ

ব্রহ্মের আনন্দময় রূপের প্রকাশে উভয়েই সমান সহায়ক। যিনি শিল্পী তাঁর কাছে তুলির ভূমিকা বড়, কি পটের ভূমিকা বড়, সে প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, উভয়েই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে সমান প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাত্র বিষয়টি দেখেছেন বলে মানুষের জন্য তাঁর অহংকার বোধ হয়েছে।

সে যাই হোক, একথা নিশ্চিত বলা যায় যে এ-বিষয় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও উপনিষদের চিন্তা মূলত একই। উভয়েরই প্রতিপাদ্য হল যে দ্বৈতভাব আরোপ না হলে বিশ্বের বৈচিত্র্যময় রূপ ধরা পড়ে না। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এই তত্ত্বটি উভয় চিন্তাতেই স্বীকৃত।

তৃতীয় কথা—আনন্দ বা অমৃততত্ত্ব। সম্পর্কিত অধ্যায়ে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে উপনিষদে এই দুটি কথা সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যা আনন্দরূপ তাই অমৃত। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।' বিশ্বে বহুরূপে আত্মপ্রকাশের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল আনন্দ আস্বাদন। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ হতেই নানা জীব জন্মগ্রহণ করে, তারপর জীবনধারণ করে এবং মৃত্যুর পর আনন্দেই ফিরে যায়। এখানে যা লক্ষ্য করবার তা হল জন্ম ও মৃত্যু দুটিকেই আনন্দের উপাদান বলে স্বীকার করা হয়েছে। তারা আনন্দের উপাদান হয়ে যায় যখন বিশ্বকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি। যখন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি তখন মৃত্যু হতে আমরা আঘাত পাই। কিন্তু জীবন-মরণকে জড়িয়ে নিয়ে তাকে আনন্দলীলা রূপে দেখলে মরণ আনন্দের উপাদান হয়ে যায়। তাই কঠ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, যে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে সেই মৃত্যু হতে শোক পায়; কিন্তু যে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে সে শোক পায় না। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।'

ঈশ উপনিষদে এই কথাটি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

সেখানে খণ্ডজ্ঞানকে অবিদ্যা বলা হয়েছে। আর যে জ্ঞান বিশ্বকে সামগ্রিকভাবে ঐক্যমণ্ডিত বলে উপলব্ধি করে, অর্থাৎ এক বিরাট আনন্দ-অভিসারী সত্তার অভিলাষে জন্ম-মৃত্যুকে জড়িয়ে নিয়ে এই বিপুল সৃষ্টি প্রবাহিত হয়েছে এইরূপ উপলব্ধি করে তাকে বিদ্যা বলা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, অবিদ্যার অবস্থায় আমরা মৃত্যুর শোক অনুভব করি এবং তারপর বিদ্যার সাহায্যে আমরা অমৃতকে লাভ করি। 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।' এই অমৃত হল আনন্দ; বিশ্ব তালে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে আমরা জন্ম-মৃত্যুর দোলায় দোলানো এই প্রাণের হিন্দোল খেলার আনন্দের অধিকারী হতে পারি।

আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আনন্দতত্ত্বকে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করেছেন। তিনিও বলেছেন, যে সত্তার বিশ্বে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ দেখি তিনি আনন্দ-অভিসারী। এ আনন্দ সৃষ্টির ধারার মধ্যে প্রবাহিত। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ তার অঙ্গ। উপনিষদ বলে, বিশ্বের মধ্যে আনন্দরূপে বিশ্বসত্তার প্রকাশ। তিনি 'আনন্দরূপমৃতম্।' তিনি বলেন, বিশ্ব জুড়ে 'আনন্দ-যজ্ঞ' চলেছে। মানবজীবন দুর্লভ বস্তু, তা আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণস্বরূপ। তার অধিকারী হতে, দরকার অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া। বিশ্বের মধ্যে আনন্দ-অভিসারী মহাসত্তার যে প্রকাশ তাকে তিনি 'বিশ্বরূপের খেলাঘর' বলে বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয় দুই চিন্তা একই পথের অনুসরণ করেছে। তবে যা লক্ষ্য করবার তা হল এই যে রবীন্দ্রনাথের অনন্য-সাধারণ কাব্যশক্তি যেন এই চিন্তাকে আরও সুন্দরভাবে কল্পনার রং মিশিয়ে আরও বর্ণাঢ্য ভাষায় প্রকাশ করে আরও চিত্তাকর্ষকরূপে স্থাপন করেছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে আনন্দতত্ত্বটি বোঝবার জন্য তিনি দুটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি প্রথমত সৃষ্টিধারাকে খেলারূপে অভিহিত করেছেন। খেলার উদ্দেশ্য অহৈতুক আনন্দ,

তা কোনও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত নয়। প্রাসঙ্গিক কাব্যাংশটি পূর্বে উল্লিখিত হলেও আবার উল্লেখ করা যেতে পারে :

এই জন্ম-মরণ খেলায় মোরা মিলি তাঁরই মেলায়,
এই দুঃখ-সুখের জীবন মোদের তাঁরই খেলার সঙ্গী।

দ্বিতীয়ত তিনি সৃষ্টিপ্রবাহকে এক মহানৃত্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিশ্বসত্তা যেন নটরাজ, বিশ্বে বিধৃত সৃষ্টিপ্রবাহ যেন তাঁর আনন্দনৃত্য। সেই নৃত্যের সংঘাতে যা জড় তার মাঝে প্রাণ প্রস্ফুটিত হয়ে চেতনার উদয় হয়; তখন সুখ-দুঃখে তরঙ্গায়িত জীবনপ্রবাহ মধুময় হয়ে ওঠে। এখানেও প্রাসঙ্গিক একটি কাব্যাংশের পুনরুল্লেখের লোভ সংবরণ করা গেল না :

তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।

তারপরের কথা হলো মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা। আমরা সম্পর্কিত অধ্যায়ে দেখেছি যে উপনিষদে মৃত্যু সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন চিন্তা আছে। প্রথম চিন্তাটি বলে ব্রহ্মের সৃষ্টিপূর্ব বা স্বরূপে অধিষ্ঠিত অবস্থায় সৃষ্টিপ্রবাহ নেই; কাজেই প্রাণধারাও নেই, জন্ম-মৃত্যুও নেই। এটি স্থান-কাল-অতীত অবস্থা; তাই সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণের স্পর্শ তাতে লাগে না। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে এই অবস্থায় আত্মা অহো-রাত্র দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, জরা-মৃত্যু, শোক, সুকৃতি-দুষ্কৃতি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।[১]

বাকি দুটি চিন্তা বিশ্বরূপে প্রকট ব্রহ্মের সম্পর্কে মৃত্যুর বিষয় চিন্তা। তারা বলে, মানুষ দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মৃত্যুকে দেখতে পারে। একটি হল খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি। তা হল ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব স্বার্থবোধ দ্বারা সঙ্কুচিত দৃষ্টিভঙ্গি। একে রবীন্দ্রনাথের ছোটো-আমির দৃষ্টিভঙ্গির

১. ছান্দোগ্য। ৮।৪।১

সঙ্গে তুলনা করা যায়। উপনিষদ একে বলে নানার দৃষ্টিভঙ্গি বা অবিদ্যা-প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে মানুষ নিজের জীবন, নিজের স্বার্থকে পৃথক করে দেখে বলে তা নানার দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্বের সামগ্রিক একত্ববোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় বলে তা অবিদ্যা। এই অবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি হেতু মানুষের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থেকে শোকবোধ আসে। তাই বলা হয়েছে, মৃত্যু হতে সে মৃত্যুর আঘাত পায় যে নানাত্ববোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।'

দ্বিতীয় চিন্তাটি বিশ্বের সামগ্রিক ঐক্যবোধ বা সৃষ্টির অখণ্ডতা-বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত। একে উপনিষদের বচনে একত্বের দৃষ্টিভঙ্গি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তা একত্বের দৃষ্টিভঙ্গি এই কারণে যে সমগ্র সৃষ্টিপ্রবাহকে একটি আনন্দ-অভিসারী মহাসত্তার অখণ্ড প্রকাশ বলে কল্পনা করা হয়েছে। এখানে সুখ আছে, দুঃখ আছে, তারুণ্য আছে, জরা আছে, জন্ম আছে, মরণ আছে; কিন্তু সব জড়িয়ে একটি আনন্দময় প্রকাশ আছে। একে বিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়েছে, কারণ তা সামগ্রিক অখণ্ডতা বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তা বিদ্যা, কারণ তা সমগ্র সত্যকে প্রকাশ করে, সত্যের অংশকে প্রকাশ করে না। অবিদ্যাকে সম্পূর্ণতামণ্ডিত করে বিদ্যায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। একে রবীন্দ্রনাথের সবার-চেয়ে-বড়ো-আমির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিশ্ব যে মহাসত্তার আনন্দলীলার প্রকাশ, এ তাঁরই দৃষ্টিভঙ্গি। এ-দৃষ্টিভঙ্গিতে জন্ম ও মরণ উভয়েই আনন্দের উপাদান হয়ে যায়। তাই ঈশ উপনিষদে বলা হয়েছে, যে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে তার কাছে সকল জীবকে, অর্থাৎ জীবনধারাকে জড়িয়ে নিয়ে এই বিশ্ব একই মহাসত্তার প্রকাশ বলে প্রতিভাত হবে। প্রাণের ধারার জন্ম-মরণ উপাদান। কাজেই একত্বের উপলব্ধি হলে শোক থাকে না, মোহ থাকে না। সম্পর্কিত বচনটি এই প্রসঙ্গে আর-একবার উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে: 'যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ॥ তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোক একত্ব-মনুপশ্যতঃ॥'

এই কথাটির ব্যাখ্যা করে ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে যিনি সামগ্রিকভাবে বিশ্বকে দেখেন, তিনি বিশ্বে শুধু মৃত্যু বা শোক বা দুঃখ দেখেন না; তিনি মৃত্যুর সঙ্গে জন্ম, শোকের সঙ্গে প্রফুল্লতা এবং দুঃখের সঙ্গে সুখকে দেখেন; তাই তিনি তাদের জড়িয়ে নিয়ে সৃষ্টিধারার মধ্যে যে আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তাকে দেখেন। 'ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোতং দুঃখতাং সর্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি।' [২]

ঈশ উপনিষদ এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির কোনটিকেই প্রত্যাখ্যান করে নি। তা বলে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে মৃত্যুশোক ভোগ করে তারপর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে অমৃত বা আনন্দের অধিকারী হতে হয়। এ বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই তা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে বলা হয়েছে, বিশ্বরূপে প্রকট ব্রহ্মে, অর্থাৎ সৃষ্টিধারায় সম্ভূতি বা জন্ম এবং বিনাশ বা মৃত্যু উভয়ই আছে। খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে গিয়ে, মৃত্যুর দাহিকাশক্তি অনুভব করে তারপর অখণ্ডদৃষ্টির মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে, মৃত্যু যে প্রাণের ধারাকে বহন করে এই উপলব্ধি করে অমৃতকে আস্বাদ করা যায়। 'বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে' [১]

আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসম্পর্কিত চিন্তা কয়েকটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তার পরিণত রূপটি পেয়েছিল। প্রথমে তিনি মৃত্যু সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলেছেন, উত্তর খুঁজে পান নি। তাই গীতার অনুসরণে তাকে একান্ত রহস্যময় বলে অনুভব করেছেন। তবু তিনি হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়েন নি; তাঁর একটি দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে মৃত্যু শূন্য নয়। তাই তিনি 'পুনশ্চ'-এর একটি কবিতায় বলেছেন:

নিবিড় সে সমস্তের মাঝে অকস্মাৎ আমি নেই।
একি সত্য হতে পারে?

২. ছান্দোগ্য। ৭।২৬।২

পরবর্তীকালে দেখি তাঁর সাধনজীবনের 'গীতাঞ্জলি'র যুগে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছে মৃত্যু জীবনকে পূর্ণতা প্রদান করে। একটি গ্রন্থের শেষ অধ্যায় যেমন সমাপ্তির সঙ্গে তাকে পরিপূর্ণতা দেয়, তেমন মৃত্যু জীবনের ওপর ছেদ টেনে দিয়ে তাকে পরিপূর্ণতামণ্ডিত করে। কাজেই মৃত্যুকে বর্ণনা করেছেন তাঁর 'জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা' বলে এবং ঐকান্তিক আগ্রহ ভরে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

পরবর্তী চিন্তায় তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণাটি পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। এখানে তাঁর ধারণা, বিশ্বসত্তা বিশ্বে প্রকাশ নিয়েছেন আনন্দ আস্বাদের জন্য এবং প্রাণের ধারা তাঁর আনন্দের লীলা। সে ধারায় জন্ম আছে, মৃত্যু আছে; কিন্তু উভয়কে জড়িয়ে নিয়ে আনন্দ আছে। খেলায় যেমন হারজিত আছে, চলায় যেমন পা-তোলা এবং পা-ফেলা আছে, জীবনধারায় তেমন জন্ম এবং মৃত্যু দুই-ই আছে। উভয়েই আনন্দলীলার উপাদান। 'কণিকা'য় তাই তিনি জীবনধারাকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা, পা-ফেলা।

সুতরাং তাঁর এই চিন্তার সঙ্গে উপনিষদের চিন্তার এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় চিন্তাই বলে সৃষ্টিধারার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু উপাদান। খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যুতে শোক আছে, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শোকের দাহিকা শক্তি থাকে না। তা এক আনন্দখেলার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। উপনিষদ যেমন বলেছে 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি,' রবীন্দ্রনাথ তেমনি তার অনুসরণে বলেছেন, 'আমরা অল্প লইয়া থাকি, তাই যাহা যায় তাহা যায়।

তারপর আসে উপনিষদের শ্রেয়তত্ত্ব। আমরা দেখেছি উপনিষদের শ্রেয়তত্ত্ব আমাদের ইচ্ছাধীন কর্ম সম্পাদনে আমরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হই তার সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম সমস্যা হল দেহের দাবিকে

বেশি মূল্য দেব, না মনের দাবীকে বেশি মূল্য দেব। দেহ স্থূল ভোগের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সুখ চায়। মন মানসিক তৃপ্তি খোঁজে। অপরদিকে আরও এক জোড়া পরস্পরবিরোধী দাবি এসে পড়ে। একদিকে আছে ব্যক্তি-মানুষ, অপরদিকে আছে সমাজ; কারণ মানুষ সামাজিক জীব। ব্যক্তিবিশেষের নিজের স্বার্থ সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ থেকে তার কাছে বেশি প্রিয়। তাই সে স্বার্থ ত্যাগ করতে কুণ্ঠা বোধ করে। এই মতিগতিকে ভিত্তি করে সমস্যা দাঁড়ায়, ব্যক্তির স্বার্থকে বেশি মূল্য দেব, না সমাজের স্বার্থকে বেশি মূল্য দেব?

এইভাবে দু'জোড়া বিরোধী দাবি এসে পড়ে; বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে তার দেহের সঙ্গে মনের দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে স্বার্থের সঙ্গে পদার্থের দ্বন্দ্ব। উপনিষদ এই দুজোড়া সমস্যার সমাধান খুঁজেছে তার শ্রেয়তত্ত্বের ভেতর দিয়ে। তা বলে, সঙ্কুচিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়গুলি দেখলে দেহের সুখ মনের সুখ হতে বেশি আকর্ষণ করে এবং নিজের স্বার্থ পরার্থ থেকে বেশি লোভনীয় বলে মনে হয়। যা ব্যক্তি-বিশেষের কাছে বেশি আকর্ষণের তাকে উপনিষদ প্রেয় বলে। তাই যে সমগ্র ব্যক্তি-মানবের কল্যাণ না চেয়ে, কেবল তার দেহের সুখ চায় সে প্রেয়কে বরণ করে। অনুরূপভাবে যে নিজের স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র সমাজের কল্যাণের বিরোধ বাধলে, নিজের স্বার্থকেই গ্রহণ করে সে প্রেয়কেই বরণ করে।

কিন্তু তাতে কি ব্যক্তি-মানুষ, কি সমাজ, কারও কল্যাণ হয় না, উভয়েরই ক্ষতি হয়। অপর পক্ষে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে যা উভয় বিরোধী পক্ষের কল্যাণ সাধন করে, তাকে উপনিষদ শ্রেয় বলেছে। শ্রেয় আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষণের বস্তু নয়; কিন্তু পরিণতিতে তা উভয়পক্ষেরই কল্যাণকর। তাই কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে শ্রেয়কে গ্রহণ করলে কল্যাণ হয়, আর যে প্রেয়কে বরণ করে সে সিদ্ধিলাভ করে না। 'তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্ত সাধু ভবতি হীয়তে

অর্থাদ্ ব উ প্রেয়ো বৃণীতে।' তাই উপনিষদ ভোগ বর্জন করতে বলে নি, উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি হতে যা গ্রহণ করতে বাধা নেই, তাকে গ্রহণ করতে বলেছে। যে কর্মে এই লক্ষণ আছে তাকে অনবদ্য কর্ম বলা হয়েছে। তাকেই গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তাই ত্যাগ করতে উপদেশ দেওয়া হয় নি, সংযতভাবে ভোগ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আত্মত্যাগ করতে বলা হয় নি, আত্মদমন করতে বলা হয়েছে।

অতিরিক্তভাবে স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের যে দ্বন্দ্ব তার সমাধান ও উভয়ের যা কল্যাণ সাধন করে তাই, অর্থাৎ প্রেয় নয়, শ্রেয়কে গ্রহণ করে। তবে স্বার্থকে ত্যাগ করা অনেক সময়ে কষ্টসাধ্য হয়। তাকে সহজ করবার জন্যে উপনিষদ হৃদয়বৃত্তির সাহায্য নিয়েছে। হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ প্রীতিবোধে, মমতাবোধে। অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকলকে আপন জ্ঞান করলে প্রীতি সঞ্চার হয়। অন্যের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হলে তার কল্যাণে স্বার্থত্যাগ করা সহজ হয়। ঈশ উপনিষদ তাই বলেছে, বিশ্বের সকলে একই মহাসত্তার অঙ্গস্বরূপ, কাজেই কাউকে বঞ্চিত করে ভোগ করতে নেই। যুক্তি হল, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্।' তার ভিত্তিতে উপদেশ দেওয়া হল, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।'

আমরা প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখি যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় উপনিষদের শ্রেয়তত্ত্ব দাগ কাটে নি। তার অনুরূপ তত্ত্ব তাঁর চিন্তায় ঠিক পাওয়া যায় না। তবে তার খানিকটা কাছে যায় এমন একটি তত্ত্ব তাঁর চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করছে, তাকে আমরা বিশ্বমানব তত্ত্ব বলেছি। এই বিশ্বমানব কে, তাঁর প্রকৃতি কি—এ বিষয় আমরা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে তা স্থাপন করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বিশ্বমানব বলেছেন তাঁকে মহামানব বলেছেন, সনাতন মানব বলেছেন এবং বড়ো-আমিও বলেছেন। তাঁর পরিকল্পনায় ব্যক্তি-মানবের মধ্যে দুটি মানব আছে। একটি ব্যক্তিবিশেষের আশা-

আকাঙ্ক্ষা পূরণে, তার স্বার্থ-সংরক্ষণে ব্যস্ত। অপরটি তার মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। ঠিক বলতে কি তিনি সকল মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। তিনিই মানুষকে সকল মহৎ কর্মে প্রেরণা দেন। তাঁরই প্রেরণায় মানুষ শিল্পী হয়, স্থপতি হয়, কবি হয়, দেশনেতা হয়, চিন্তানায়ক হয় এবং আত্মত্যাগের প্রেরণা পায়। তিনি ব্যক্তিবিশেষকে ব্যাপ্ত করে কিন্তু তাকে অতিক্রম করে আছেন। তিনি স্থানের ঊর্ধ্বে, কারণ তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। তিনি কালকে অতিক্রম করে আছেন, কারণ তিনি মানবজাতির মধ্যে বিধৃত; ব্যক্তিমানুষের বিনাশ তাঁকে স্পর্শ করে না। মানুষের যা কিছু কীর্তি সবই তাঁর প্রেরণা থেকে ব্যক্তি মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি মানুষকে কল্যাণের পথেও আকৃষ্ট করেন।

এখন আমরা বুঝতে পারব তাঁর এই পরিকল্পিত সত্তাকে রবীন্দ্রনাথ এতগুলি নাম দিয়ে চিহ্নিত করেছেন কেন। তিনি বিশ্বমানব, কারণ সকল মানুষের মধ্যেই তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করেন। তিনি মহামানব, কারণ তিনি সকল মানুষের যোগসমষ্টিকে অতিক্রম করেন। তিনি সকল মানুষের গাণিতিক যোগফল নন; তিনি নিজে একটি শক্তি এবং সেই শক্তি ব্যক্তি মানুষের মনে ক্রিয়াশীল হয়। তিনি সনাতন-মানব, কারণ তিনি সমগ্র মানবজাতির প্রাণশক্তিস্বরূপ। মানুষ জন্মায়, মানুষ মরে: কিন্তু মানবজাতির প্রাণের ধারার মধ্যে তিনি নিত্য বিরাজিত। তিনি বড়ো-আমি, কারণ তিনি ব্যক্তিমানুষের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থের সঙ্কুচিত বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ নন; তিনি ব্যক্তিমানুষকে সকল মহৎ কর্মে প্রেরণা দেন। তিনিই মানুষকে সামগ্রিক কল্যাণের পথে আকর্ষণ করেন।

এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় উপনিষদের শ্রেয়তত্ত্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতত্ত্ব পৃথক। শ্রেয়তত্ত্ব কেবল ইচ্ছাধীন কর্ম কি নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে সে বিষয় উপদেশ দেয়। তার ক্ষেত্র খুব সঙ্কুচিত। বিশ্বমানবতত্ত্ব একটি অপ্রকট প্রচ্ছন্ন শক্তির কথা বলে,

যা সমগ্র মানবজাতিকে তার মহৎ কীর্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই তা প্রসঙ্গত শ্রেয়ের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করে। একজন বিপদে পড়লে অন্যে যখন নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়, তখন রবীন্দ্রনাথ বলবেন এই মহামানব থেকেই সে তা করবার প্রেরণা লাভ করে। সুতরাং বলতে পারা যায় এই তত্ত্ব শ্রেয়তত্ত্বের পাশ ঘেঁষে চলে যায়, তার অনুসরণ করে না।

তবে উপনিষদের শ্রেয়তত্ত্ব সম্পর্কিত অন্য দুটি তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রথম হল সন্ন্যাসকে উপনিষদ গ্রহণ করে নি, তবে সংযমকে গ্রহণ করেছে। সংসারে থেকে, শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করে জীবনধারণ করতে তা উপদেশ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও সন্ন্যাসকে গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন, সংসারে থেকেই মুক্তির সাধনা করতে হবে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব হল স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বে হৃদয়বৃত্তির ব্যবহার। উপনিষদ বিশ্বের সঙ্গে একত্ববোধের ভিত্তিতে সকলের সঙ্গে প্রীতি-প্রণোদিত আচরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তার অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, অখণ্ডবোধ থেকে অপরের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হয়; প্রীতির সঞ্চার হলে অপরের জন্যে আত্মত্যাগ করা শুধু সহজ হয় না, আনন্দের হয়। তাঁর জ্ঞান-প্রীতি-কর্মতত্ত্বের মধ্যে এই সুরটি বিশেষভাবে সরব হয়ে উঠেছে।

বাকি রইল মানবিকতা-তত্ত্ব। উপনিষদের মানবিকতা এসেছে তার অখণ্ডবোধ হতে। উপনিষদ অনুভব করেছে, একই সত্তা নানা বেশ ধরে বিশ্বরূপ হয়েছে; একই মহাশক্তি প্রাণশক্তি হয়ে বিভিন্ন জীবরূপে প্রকাশ নিয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর দেহে কথা বলে সেই শক্তি বাক্য হয়, দেখে চক্ষু হয়, শুনে শ্রোত্র হয়, মনন করে মন হয়। এদের প্রত্যেককে পৃথক ভাবলে ভুল হবে। তাদের একই আত্মার প্রকাশ বলে জানলে তারা সব এক হয়ে যাবে। 'আত্মেত্যুপাসীত অত্র হ্যেতে সর্বে একং ভবন্তি।' এই একত্ববোধে সকল মানুষের প্রতি

প্রীতিবোধ সঞ্চারিত হয়। তাই দান এবং অহিংসা অভ্যাস করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং উপনিষদে পাই অখণ্ডবোধ থেকে একত্ববোধ, একত্ববোধ থেকে প্রীতিহেতু সর্বজনীন কল্যাণ-কর্মের প্রতি আকর্ষণ।

এখানে যেটি বিশেষ লক্ষ্য করবার তা হল উপনিষদে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের পরিকল্পনা নেই। ঈশ্বর এখানে ব্রহ্ম বা আত্মা। তিনি সর্বব্যাপী সত্তা এবং বিশ্বের মধ্যে বিশ্বরূপেই প্রকট। তাঁর কোনও পৃথক অস্তিত্ব পরিকল্পিত হয় নি। তিনি বিশ্বকে যেমনটি যেখানে সাজে সেইভাবে সৃষ্টি করেছেন একথা উপনিষদে স্বীকৃত; কিন্তু অতিরিক্তভাবে একথা বলা হয়েছে তিনি বিশ্বকে সৃষ্টি করে তাতে নিজেই প্রবেশ করলেন। 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' সুতরাং তিনি এক নৈর্বক্তিক সত্তা হয়ে দাঁড়ান। যিনি আদিত্যে এবং যিনি মানুষে উভয়েই এক সত্তা। তাই দেখি প্রাচীন উপনিষদে ভক্তির অনুরূপ কোনও অনুভূতি স্থান পায় নি। বিশ্বশিল্পরচনায় ঋষি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। রহস্য-ঘেরা বিশ্বকে জানবার জন্য তীব্র আকূতি প্রকাশ করেছেন। সেই রহস্যকে ভেদ করবার অদম্য কৌতূহল উচ্চারিত হয়েছে; কিন্তু ভক্তিনিবেদনের কোনও আকূতি ফুটে ওঠে নি।

তার কারণ, উপনিষদের ঋষি কবি ছিলেন, মনীষী ছিলেন কিন্তু ভক্ত ছিলেন না। তাঁর হৃদয়বৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তি ছিল প্রবলতর। তাই তাঁরা বলতেন, দেখ, জান, জেনে আনন্দ পাও। জানার পুরস্কারই আনন্দ। তাই তাঁদের প্রার্থনা-বাণীতে কোনও ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের স্তুতি রচিত হয় নি। কামনা পূরণের জন্যে অর্থার্থী মনোভাব নিয়ে কোনও প্রার্থনা নিবেদিত হয় নি। তাঁদের যে প্রার্থনা-বাণী পাই তা পরমশক্তির কাছে এমন ধীশক্তি প্রার্থনা করে যাতে ঋষি তাঁকে বুঝতে পারেন। সবার বড় আকাঙ্ক্ষা, জানব, 'ধীমহি।' কাজেই একমাত্র প্রার্থনা আমি যেন ধীশক্তি লাভ করি, 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' সেকালের ঋষির সব থেকে বড় অহঙ্কারের বিষয়,

আমি সেই পরমসত্তাকে জেনেছি, 'বেদাহমেতম্।' সুতরাং উপনিষদে ব্যক্তিরূপী ভগবানের উপর ভক্তি থেকে মানবিকতায় আকর্ষণ আসে নি ; এসেছে সমগ্র বিশ্বকে জুড়ে অখণ্ড ঐক্যবোধ থেকে।

অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা-তত্ত্ব গড়ে উঠেছে দুটি বিভিন্ন তত্ত্ব থেকে : একটি হল অখণ্ডবোধ বা ঐক্যতত্ত্ব থেকে। অপরটি হল ধর্ম আচরণের আদর্শরূপের আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে। সুতরাং তিনি দুই ভিন্ন পথ ধরে গিয়ে মানবিকতার সন্ধান পেয়েছেন। প্রথম পথটি উপনিষদের পথের সঙ্গে তুলনীয়। দ্বিতীয় পথটি স্বতন্ত্র ; তার সঙ্গে উপনিষদের মানবিকতার কোনও সংযোগ নেই।

এই দ্বিতীয় পথ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পথ। তাঁর মতিগতির নির্দেশেই তিনি সেই পথকে অবলম্বন করেছিলেন। কারণ, রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, ঐকান্তিকভাবে ঈশ্বরভক্ত কবি ছিলেন। সেই জন্যেই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণতম মিলনের পথ আবিষ্কার করতে উৎসুক হয়েছিলেন এবং ফলে মানবিকতাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

মোটামুটি তাঁর নিজের কথায় বলা যায় বিশ্বসত্তাকে তিনি শুধু জেনে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি অতিরিক্তভাবে তাঁকে প্রীতির সূত্রে এবং সেবার-পাত্ররূপে পেতেও চেয়েছিলেন। অর্থাৎ আমাদের যে তিনটি মূল বৃত্তি আছে তাদের সব কটির সাহায্যে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের অনুরূপ তত্ত্ব তিনি প্রথম জীবনে আবিষ্কার করেছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী সত্তার উপস্থিতি তিনি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু এ হল তাঁর মতে শুধু তাঁকে জানা ; অতিরিক্তভাবে তাঁকে তিনি পেতে চেয়েছিলেন। এই পথেই তিনি তাঁর জীবনদেবতাকে পেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, ইনি বিশ্বসত্তার ব্যক্তিরূপী প্রকাশ। এখানে তিনি ব্যক্তিবিশেষের প্রীতির কামনায় তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠান নিতে উৎসুক।

এই পথে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি পেয়েছিলেন 'অন্তরের মধ্যে তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ অনুভব করে।' কিন্তু তাতেও তাঁর পরিপূর্ণ

তৃপ্তিবোধ আসে নি। কারণ, জীবনদেবতা ব্যক্তিরূপী হলেও তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রকাশ নেই। কাজেই সেবার মধ্যে দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। শেষে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন সেবার পাত্ররূপে তাঁকে পেতে হলে মানুষের মধ্যে তাঁর যে প্রকাশ সেই প্রকাশকে প্রীতি করতে হবে, সেই প্রকাশকে সেবা করতে হবে। তাই তিনি জীবনদেবতাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, যেখানে তিনি বিশ্বমানবের মধ্যে বিরাজিত সেইখানেই প্রীতির মধ্যে দিয়ে, সেবার মধ্যে দিয়ে বিশ্বনাথের সহিত মিলিত হবেন। 'বিশ্বসাথে যোগে যেথা বিহারো, সেইখানে যোগ তোমাব সাথে আমারো।'

দুই

সিদ্ধান্ত

সুতরাং আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ এক অবস্থায়, উপনিষদেব অতি কাছে এসেছেন, পবেব অবস্থায় দূবে সবে গেছেন, আবাব নিজস্ব চিন্তার পরিণত রূপেব মধ্যে দিয়ে কাছে চলে এসেছেন। প্রথম জীবনে প্রকৃতির কবি হিসাবে তিনি সমগ্র বিশ্বেব মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। তার বহু দ্বারা বিখণ্ডিত বিচিত্র রূপের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যেব আবিষ্কাব করে যে শক্তি এই ঐক্য বিধান কবেছেন তিনি তাঁকে বিশ্বরূপ বলে বর্ণনা কবেছেন। উপনিষদ তাঁকেই ব্রহ্ম বলেছে এবং তাঁব বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে 'আনন্দরূপমমৃতম্' বলেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈদিক পূর্বপুরুষ যে-পথে গিয়েছিলেন সেই পথেরই অনুসরণ কবেছেন।

দ্বিতীয় অবস্থায় দেখি ববীন্দ্রনাথ নিজের মতিগতির পথে এই ব্রহ্মবাদ থেকে দূরে সবে এসেছেন। তিনি বিশ্বসত্তাকে শুধু জানতে চান নি, তাঁকে প্রীতির সূত্রে পেতে চেয়েছেন। তাঁর এই আকুতি থেকেই তিনি 'জীবনদেবতা'কে তাঁর হৃদয়ের মধ্যে আবিষ্কার

করেছেন। বিশ্বদেবতা নৈর্ব্যক্তিক-সত্তা। তিনি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বৃত্তিকে তৃপ্তি দিতে পারেন নি। জীবনদেবতা ব্যক্তিরূপী সত্তা, তাঁর স্বতন্ত্র প্রকাশ না থাকলেও তিনি ভক্তের মনে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর সঙ্গে প্রীতির আদান-প্রদান করতে পারেন। যিনি অসীম তিনি আনন্দ-আস্বাদনের জন্য সীমার মাঝে ধরা দেন। যিনি বিধাতা হিসাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি বন্ধু হয়ে হৃদয়মন্দিরে ধরা দেন। এইভাবে তিনি উপনিষদের ব্রহ্মবাদ থেকে দূরে সরে এসেছেন। ব্রহ্মবাদের ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক-সত্তা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপর একটি বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রথম প্রকাশটি কাজের প্রকাশ এবং দ্বিতীয়টি আনন্দের প্রকাশ। কাজের প্রকাশের মধ্যে বিশ্বদেবতাকে পাই; আনন্দের প্রকাশেব মধ্যে জীবনদেবতাকে পাই। এই জীবনদেবতা-তত্ত্ব একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব। উপনিষদে তার স্বীকৃতি নেই।

তৃতীয় অবস্থায় দেখি তাঁর মানবিকাতত্ত্বেব মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার উপনিষদের কাছে সরে এসেছেন। দুই পথে তিনি তাঁর মানবিকতাকে লাভ করেছিলেন। একটি হল ধর্মসাধনার পথ; অপরটি হল অখণ্ডবোধের পথ। এ বিষয় এখনই আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পথটিতে তিনি স্পষ্টতই উপনিষদের চিন্তার অনুসরণ করেছেন। উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্বের উপলব্ধি থেকে মানুষে মানুষে একত্ববোধ পরিস্ফুট হলে পরার্থে স্বার্থত্যাগ করা সহজ হয়। কাজেই এখানে পাই অখণ্ড জ্ঞান থেকে সকল মানুষের প্রতি প্রীতি সঞ্চার এবং প্রীতিবোধহেতু সর্বজনীন কল্যাণকর্মে উৎসাহ। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান-প্রেম-কর্মতত্ত্ব এই পথের অনুসরণ করেছে। এই-ভাবে পরিণত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আবার উপনিষদের খুব কাছে ফিরে এসেছে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের চিন্তার অন্ধ অনুগামী ছিলেন না। তিনি স্বাধীনপথে চিন্তা করে, সাধনা

করে, তাঁর নিজস্ব তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। এইভাবে অজানিতে তিনি কোথাও উপনিষদের অনুবর্তী হয়েছেন, কোথাও উপনিষদের চিন্তা থেকে দূরে সরে গেছেন। তবে একথা সত্য যে তিনি উপনিষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

প্রশ্ন ওঠে কেন এমন হল? কেন এত মিল, কেনই বা অমিল? মোটামুটি আমরা দেখি মিলই বেশি, অমিল সামান্য। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ তিনি অংশত গ্রহণ করেছেন, অংশত গ্রহণ করেন নি। কিন্তু উপনিষদের অন্য তত্ত্বগুলির তিনি অনুবর্তী হয়েছেন। এইভাবে দেখি উপনিষদের দ্বৈতভাব তত্ত্ব, আনন্দবাদ, মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা এবং মানবিকতার তিনি অনুগামী হয়েছেন। কেবল দেখি উপনিষদের শ্রেয়বাদের অনুরূপ তত্ত্ব তাঁর চিন্তায় গড়ে ওঠে নি। তার কারণ সম্ভবত নৈতিক সমস্যাগুলির বিভিন্ন দিক তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্ব তাঁর নজরে এসেছে। তার সমাধান তিনি খুঁজেছেন সর্বজনীন প্রীতির মধ্যে দিয়ে। সুতরাং দেখা যায়, জীবনদেবতা-তত্ত্বই একমাত্র অতিরিক্ত তত্ত্ব। এখানে যেন উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের উপর একেশ্বরবাদের ভক্তিতত্ত্ব আরোপিত হয়েছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ঔপনিষদিক চিন্তা থেকে দূরে সরে এসেছে।

এই বিশ্লেষণের পর কেন রবীন্দ্রনাথ সরে এসেছিলেন তার উত্তর দেওয়া সহজ হয়ে পড়ে। উত্তর হল, তাঁর মানসিক গঠন উপনিষদের ঋষির মানসিক গঠন থেকে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। উপনিষদের ঋষি ছিলেন একাধারে কবি ও মনীষী। তাই উপনিষদের বচনে যেমন গভীর দার্শনিক তত্ত্ব পাই, তেমন কাব্য পাই। রবীন্দ্রনাথ কবি ও মনীষী তো ছিলেনই, অতিরিক্তভাবে ছিলেন হৃদয়বৃত্তিতে বিশেষ সমৃদ্ধ। তাই তিনি শুধু মনীষা দিয়ে সত্যকে জানতে চান নি, হৃদয় দিয়ে তাকে প্রীতির সম্বন্ধে পেতে চেয়েছিলেন। এই মতিগতির ভিন্নতা হেতুই তিনি উপনিষদের ঋষির মত কেবল 'বেদাহমেতম্' বলে সন্তুষ্ট

হতে পারেন নি, বিশ্বসত্তাকে হৃদয়বল্লভ রূপে পেতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রেমপিপাসু মন বিশ্বদেবতার মধ্যে জীবনদেবতার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিল।

একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ অলক্ষ্যে উপনিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হয়ে বসেছেন। তার কারণ দুটি। প্রথম মূলত তাঁর চিন্তা উপনিষদের চিন্তার অনুবর্তী। দ্বিতীয়ত সেই কারণে, তিনি উপনিষদের চিন্তার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাই দেখি কাব্যে সে শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। তাঁর উপাসনা শ্রেণীর ভাষণগুলির মধ্যে উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করে নিজের চিন্তার তিনি সমর্থন খুঁজেছেন। এমন কি এক অবস্থায় উপনিষদের ব্যাখ্যাকারের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'সাধনা' নামক তাঁর ইংরাজি গ্রন্থে। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলি ভাষণ দেন। তার বিষয় ছিল বুদ্ধের ও উপনিষদের বচনের ব্যাখ্যা। উপনিষদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাই তাঁকে এই ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল।

এই প্রসঙ্গে সাধনার মুখবন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তা আমাদের উপরের উক্তিকে সমর্থন করবে। মন্তব্যটির বাংলা অনুবাদ এই দাঁড়ায়:

'আমার কাছে উপনিষদের শ্লোক এবং বুদ্ধের বাণী চিরদিন আধ্যাত্মিকতাগুণে সমৃদ্ধ এবং সেই কারণে সীমাহীন বিস্তারের শক্তিধারণ করে মনে হয়েছে। আমি সেগুলিকে আমার নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছি এবং ভাষণে ব্যবহার করেছি, কারণ তাদের আমার ব্যক্তিজীবন তথা সকলের জীবনের কাছে তাৎপর্য আছে মনে হয়েছে।'

উপনিষদের চিন্তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে 'নৈবেদ্য'-এর[৩] অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতার অংশে:

৩. নৈবেদ্য, ৬৭

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

উপনিষদের বাণীর এমন একটি উদার সুর আছে যা তাঁকে বিশেষভাব মুগ্ধ করেছিল। তার বৈষয়িক সুখের প্রতি অনাসক্তি, তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, তার সন্ন্যাসবাদ পরিহার, তার এই ধূলিময় ধরণীর মধ্যে আনন্দ ও অমৃতরূপের আবিষ্কার তাঁর মনকে তার প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাবিষ্ট করেছিল। তার মধ্যে মানুষের মনকে দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা ও নীচতার উর্ধ্বে আকৃষ্ট করবাব ক্ষমতা দেখে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে তিনি বর্তমান কালের মানুষের বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করবার শক্তিও আবিষ্কার করেছিলেন। বর্তমান যুগের সংঘাত ও সংঘর্ষের অশান্তি এবং বৈষয়িক আসক্তির কদর্যতা তাঁর মনকে পীড়া দিয়েছিল। তাই 'নৈবেদ্য'-এর আর এক কবিতায়[৪] তিনি ক্ষোভ করে বলেছিলেন :

আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা-আনন্দ মন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী
সঞ্জীবনী স্বর্গে মর্তে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।
রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

৪. নৈবেদ্য, ৬৩

আমাদের পরম সৌভাগ্য, ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথ সেই ভূমিকা নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতো উপযুক্ত পাত্র আমরা আর কোথায় পাব? সেই কাব্যশক্তি, সেই মনীষা তাঁর বচনে আরও বর্ণাঢ্য রূপ পেয়ে আর একবার আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রসাহিত্য উপনিষদের বাণীরই নূতন রূপ। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের আধুনিক কবি নন, তিনি সেই প্রাচীন যুগের ঋষিকবির নবতম আবির্ভাব।

সমাপ্ত